বিষয় ঃ সত্যেন্দ্রনাথ

ও লেখক ঃ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প ঃ বিনয় মজুমদার

কৌরব

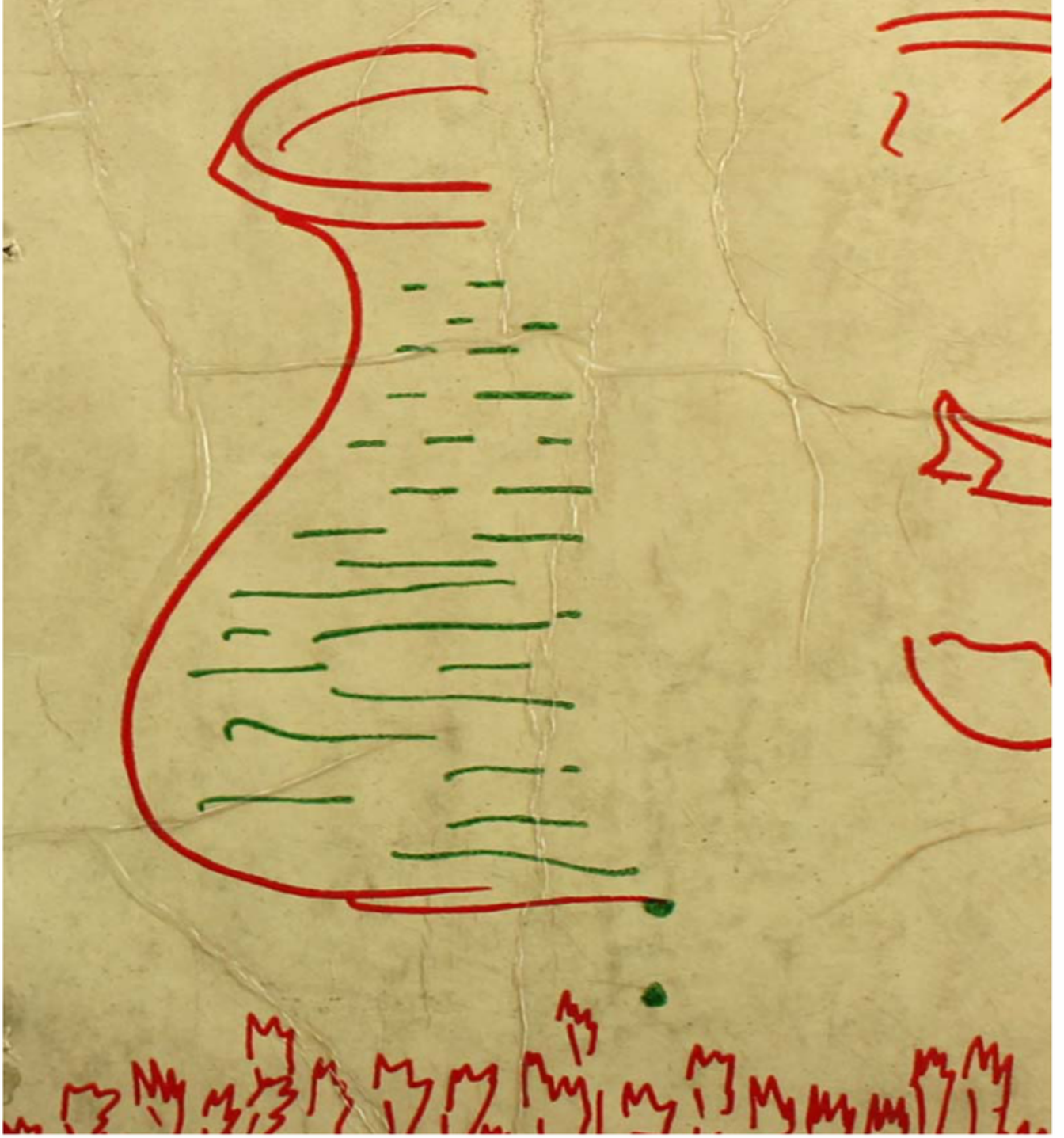

কৌরব

কৌরব প্রকাশনী জামসেদপুর

With best compliments from :

TELELINK NICCO LTD.

Gram : 'MEGOHM', Calcutta.
Phone : 28-5102 (6 Lines)
Telex : 021-2653 NICC IN

Works Office : Industrial Growth Centre,
Block 'D', Post Box No. 7, Kalyani.
Dist. Nadia (W. B.) Pin 741235.
Phone : Kalyani 553.

Manufacturers of Jellyfilled Telephone Cables.

কৌরব ৪৯
সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
KAURAB 49
September 1987

Rs.

মুদ্রণ
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

ব্লক :
প্রসেস ক্রাফ্‌ট্
৭/১, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
বুকস্ অ্যাণ্ড প্রিন্ট কনসার্ন
৬৭/১, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই :
এম. শর্মা বুক বাইণ্ডার্স
৪০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা-৭০০০১২

দেবজ্যোতি দত্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত

যোগাযোগ :
কমল চক্রবর্তী। এগ্রিকো বাগান। জামসেদপুর-৮৩১০০

মূল্য : সাড়ে সাত টাকা

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা]

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৪র্থ তল), কলিকাতা-১৩

"ডব্লু বি. এস. আই. সি. ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য করে
আর দেশের সেবা করে ক্ষুদ্রশিল্পগুলি।"

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রের শিল্পগুলির উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। যেমন (১) দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও এস. এস আই. ইউনিটগুলিকে বিতরণ, (২) আন্তঃ কাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা, (৩) এস এস আই ইউনিটগুলিকে বিপণনের সুবিধা প্রদান, (৪) আই. আর. বি. আই.-এর ঋণ প্রকল্পের অনুসরণে ক্ষুদ্রায়তন কয় শিল্প ইউনিটগুলিকে আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা, (৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রকল্প গঠন। এভাবেই রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন, আর্থিক অগ্রগতি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই করপোরেশন এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ—জনসংযোগ আধিকারিক, ২৭-০৩০৩—০৭

With Best Compliments from :

INCAB INDUSTRIES LIMITED

9 Hare Street
Calcutta-700 001

কল্পনা

With Best Compliments :

KARIM CITY COLLEGE
Jamshedpur

Long Live Kaurab

With Best Compliments :

Cosmopolitan Energisers Pvt. Ltd.
Vill : Nirbhoypur
P.O. Seharakuri
Dt : Birbhum

Manufacturers & Repairers of Power & Distribution Transformers, Motors, Generators, O. C. B. Switch Gear, and all other Electrical Equipments.

কৌরব

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

শিরোনামায় পাঠক ১১

প্রবন্ধ : অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী ৫৪ / সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১

বিনয় মজুমদার ৭৫ / সুবিমল বসাক ৭৭ / দেবাশিস মুখোপাধ্যা ৮১ / সুবল গাঙ্গুলী ৯৪ / সুরজিৎ সেন ৯৮ / জগন্নাথ ঘোষ ১০৪ / বারীন ঘোষাল ১১৩

কবিতা : সুদেশ সেন ১৭ / অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৯ / অমলেন্দু বিশ্বাস ২৪ / মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৫ / ঈশিতা ভাদুড়ী ২৬ / মেঘ মুখোপাধ্যায় ২৭ / শামশের আনোয়ার ২৮ / চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ২৯ / রথীন ভৌমিক ৩০ / বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৩১ / শান্ত রায় ৩১ / শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য ৩২ / অমরনাথ বসু ৩৩ / অজিত বাইরী ৩৩ / রমা ঘোষ ৩৪ / সুজিত সরকার ৩৫ / প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬ / নিতাই জানা ৩৬ / তাপস রায় ৩৭ / প্রভাত মিশ্র ৩৮ / মহুয়া চৌধুরী ৩৯ / সোফিওর রহমান ৪০ / স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১ / গৌতম দাশগুপ্ত ৪৩ / ভাস্বতী রায়চৌধুরী ৪৪ / তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫ / মঞ্জুভাষ মিত্র ৪৭ / দেবদাস আচার্য ৪৯ / অরুণেশ ঘোষ ৫০ / কৃষ্ণগোপাল মল্লিক ৫৩ / আলোক সরকার ১২১ / শংকর চক্রবর্তী ১২৩ / অরুণ মুখোপাধ্যায় ১২৪ / সুদর্শন চক্রবর্তী ১২৫ / সজীব প্রামাণিক ১২৬ / জয়নাল আবেদীন ১২৭ / শক্তিপদ হালদার ১২৭ / সংযম পাল ১২৮ / অশোকতরু চক্রবর্তী ১২৯ / নারায়ণ সেন ১২৯ / (পরের পাতায়)

কবিতা : কালীনাথ বসু ১৩০ / গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১ / তপনকুমার মাইতি ১৩২ / সিদ্ধার্থ বসু ১৩৩ / যাদব দত্ত ১৩৩ / প্রদীপ পাল ১৩৫ / অভী সেনগুপ্ত ১৩৬ / শ্যামলজিৎ সাহা ১৩৮ / শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৩৯ / দিবেন্দু পালিত ১৪০ / মৃণাল দত্ত ১৪১ / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৯ / কমল চক্রবর্তী ১৫১

কাব্যনাট্য : পূর্ণেন্দু পত্রী ১৪২

শহর সংস্করণ ১৫৩

ক্রোড়পত্র : বিনয় মজুমদার ১৯১

প্রচ্ছদ : বারীন ঘোষাল

SPACE DONATED BY A WELL-WISHER

With Best Compliments :

SHIVMONI & CO.

Importers, Exporters & Manufacturers
of Steel Pipes and Tubes.
On approved lists of
all Government of India Departments.
29, STRAND ROAD
CALCUTTA-700001
Post Box No. 2328
Phones : 25-0556 (3 lines), 25-1297 & 25-8149
Gram : "ESMANEE" Calcutta Telex : 21-4535 'SHMC IN'

With Best Compliments :

R. S. ENGINEERING CO.

216, Old China Bazar Street, 3rd Floor,
Calcutta-700001
Phone : 20-9662
Specialists in
Steel & Rubber Flexible Hoses and
Tools & Hardware Items

With Best Compliments :

T. G. ENTERPRISES

ERECTORS AND REPAIRERS OF POWER PLANTS

129/C, Monohor Pukur Road,
Calcutta-700026
DIAL : 46-2843

With Best Compliments :

POWER MACHINERY

Garia Gardens, Calcutta-700084

Engineers and Contractors for Erection,
Commissioning of Heavy Machine Tools

আমাদের কিছু না হতে পারার, পণ্ডশ্রমের ১৮ বছরের আরম্ভ এই পুজোয়। এক ৭০ সালের পুজোয় কৌরবের গোড়াপত্তন। ঐ গত ১৭ বছরে ৬৮ সংখ্যা, যেহেতু কাগজটি ত্রৈমাসিক, প্রকাশিত হবার কথা ছিল, হয়েছে ৬৮। ২০ কম। এই ভাবেও ব্যর্থ। সত্যি কথা বলতে, কি করেছি? গত ১৭ বছরে সময়, অর্থ, শ্রম, ছাপাখানা, বহুমূল্য কাগজ নষ্ট ছাড়া, কি হয়েছে?

এসব কথা পুজোর প্র্যামারে যখন কিনা বাংলা দেশে লেখা ন্যূনপক্ষে ৫০০ উপন্যাস, ২০০০ ছোট গল্প এবং ১০,০০০ কবিতা, মানে একটা সাহিত্য ফেস্টিভ, সাহিত্য ফেট্ মানে গ্যালা ফেট্, রোশন চৌকি, তখনই আমাদের মত নিভু নিভু ক্লান্ত, হতে না পারা কাগজের ব্যর্থতার কথা ধামাচাপা পড়ে যাবে।

সত্যিই বিশ্বে আর কোথাও একসঙ্গে এত স্মরণীয়, কালজয়ী, ভূজয়ী, শ্রেষ্ঠ, মননশীল, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। এবং এই নতুন, অসাধারণ সাহিত্য প্রতি বছর আরও বেশী পাঠককে আকর্ষণ করে। ফলে গত বছরের থেকে এ বছরের পাঠক সংখ্যা বেড়ে যায়। বেড়ে যায় সাহিত্যের হিম্মৎ। এ এক অনন্যসাধারণ ঘটনা।

এতকথা বলতুম না, আসলে আগামী সংখ্যাই ৫০। কেন এই ৫০ করা হোল? কেন একদিন ৭০ সালে টলমলে পায়ে আরম্ভ হোল? এই ১৭/১৮ বছরের নির্যাস কি? এবং মূল সাহিত্য কেন্দ্র থেকে বিস্তর দূরত্বে থেকে এই অনিয়মিত কগ্ন 'কি কাজে আসবে' ৫০।

দিন কয় আগে এক বন্ধু এসেছিলেন, দুর্গাপুর থেকে। কথা প্রসঙ্গে বারবার কৌরব ৫০ আসছিল। ঠিক সেই সময়ে অন্য

একটি কাগজেরও ৫০নং সংখ্যাটি টেবিলে। উক্ত বন্ধু বললেন, এত পঞ্চাশ পঞ্চাশ করছেন কেন, এতে কি আছে, কি এমন একটা ব্যাপার! যেন এর আগে আর কেউ করেনি, এমন ভাব করছেন! বটেই, তাকে কি উত্তর দেব? কারণ তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালই করেন। গীতবিতান না দেখে অনবরত গেয়ে যেতে পারেন। কথামৃতের গল্প সময় সুযোগে ঝেড়ে দেন, আরও দশ-বিশটা গল্পগাছা পড়া, আমাকে প্রায় ধমক দিলেন, এত মূল্যবান মনে করছেন কেন? আপনাদের সাহিত্য ক'জন পড়েন? ক'জন কেনেন? এই যে ৫০ বার করছেন কি ফয়দাটা হোল? কোন্ মালটা বইলেন?

চুপ করে থাকি। সত্যি ৫০ যে-কোনও কাগজই করতে পারে, এর জন্য এতটা বাতাস ঠিক নয়। সত্যি কথা বলতে, আমরা কি করতে পেরেছি, আজ ভেবে দেখবার সময় হয়েছে? কারণ বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক কবি বলেছেন বন্ধ করে দাও, আর কেন? অনেক হয়েছে! অথচ তরুণ, বিদগ্ধ চাইছেন, চলুক। আমাদের চিরদিনের আনন্দ, অনেক নতুন তরুণ কবি সাহিত্যিক দিয়ে পাতাভরা। নাম না জানা, অচেনা তরুণের ঘাম, যৌবন, যন্ত্রণা, রাতজাগা কৌরবের চিরদিনের গর্ব। আশ্রয়।

যে তরুণকে দেখিনি যার সঙ্গে কোন দিনও দেখা হবে না, হয়ত একদিন তিনি মস্ত বড় একজন সাহিত্যিক হয়ে যাবেন, কিম্বা দৌড় থামিয়ে ভিড়ে যাবেন আলু পটল মিহিদানার সঙ্গে, তিনি যাই হোন, তার আজকের ভালবাসা, জীবনবোধ, অক্ষরপ্রেম, নিজস্ব পৃথিবী, আমাদের ভাল লেগেছে। তাকে অনুভব করি। তার দিব্য দর্শন। এত সৃষ্টিশীল মানুষ!

আঃ সেই তরুণের জন্য, যিনি ছাপা কবিতার পৃষ্ঠায় রাত ভোর করে দিচ্ছেন, আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধা, শ্রম।

এক অন্ত পৃথিবী যেখানে ছন্দের কাছে, শব্দের কাছে মনুষ্য অঞ্জলি নিয়ে বসে। ক্রমশ তথাকথিত মানুষজন সমাজের সঙ্গে

ব্যবধান গড়ে ওঠে। তবু এই মানুষেরা সমাজের সব থেকে নিবিড়। সব থেকে সাহসী, অত্যাচারিত, সন্ন্যাসী, আত্মত্যাগী, হৃদয়বান। এইসব মানুষের সঙ্গে আমাদের ১৭ বছরের ওঠাবসা। প্রাকপঞ্চাশ সংখ্যায় এসব কথা মনে পড়ছে। জানি এও কিছু নয়। ইতিহাস সংস্কৃতি বড় নিষ্ঠুর, লম্বা হাতে হাজার পৃষ্ঠার মোহন সিরিজ, কিরীটি বক্সা অবহেলায় মুছে দেয়। সামান্য দু'চার পৃষ্ঠার কারবারী চিরবিস্মৃত হয়ে জেগে থাকে। সত্যি, শামুকেরও গঙ্গাসাগরে যেতে লোভ হয়। সবাই ইতিহাস হতে চায়। একজন নির্মম ভাঁড়ও চেয়ে থাকে।

এইভাবে নানা অর্জনের মধ্যে দিয়ে আমাদের ১৮ বছরের আরম্ভ। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, এবার কৌরবের চুম্বক কি, বিশেষত্ব কি? কিছুই বলতে পারিনি। সত্যি, বলার মত কিছু কি থাকে! মানুষ অভ্যাসবশে জিজ্ঞাসা করেন। অন্য গুরুত্ব-পূর্ণ পত্রিকার বিশিষ্টগুলি আমাদের মত মেঠো কাগজে আশা করেন। আশ্চর্য! এ প্রশ্নটিও বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে করলে পারতেন। তাছাড়া একথাও জানি আমাদের পছন্দের বিশিষ্টগুলি মূল্যহীন হয়ে যাবে।

যেমন ধরুন, এবার বিনয় মজুমদারের দুটি গল্প, ৮টি কবিতা, নাটকটি নিয়ে ক্রোড়পত্র আমাদের মতই এক বৈশিষ্ট্য; এতে কি যথেষ্ট হোল, জানি না। এই সামান্য পুঁজি নিয়েই গত ১৭ বছর চলেছে।

অনেক চকচকে, অভিজাত পুজো সংখ্যার ভিড়ে যদি কৌরব হারিয়ে না যায়, ভাল লাগবে। মাত্র কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হবে ৫০। আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রইল। যা খুশি পাঠান। জল, ঝড়, তামাশা থেকে এক নতুন বাংলা ভাষা জন্ম নিক।

নমস্কার

With Best Compliments :

Electrical Sales Corporation

Suppliers of Industrial Electrical Equipments .
Dealers : GEC ; Agents : Siemens India Ltd.

SAKCHI
JAMSHEDPUR

WITH BEST COMPLIMENTS :

RAJIV MOHTA

Best Wishes From

QUAZI FAZLUR RAHMAN
ADVOCATE

Office : 7 Old Post Office Street, Ground Floor
Calcutta-700001
Residence : 13J, Bright Street, Calcutta-17
Phone : 28-1412 Chamber ; 44-7598 Residence

With Best Compliments :

Kamala Transport Company
Ganganagar
24-Parganas

অনিবার্য গ্রন্থসম্ভার

স্বদেশ সেন

রাখা হয়েছে কমলালেবু

বারীন ঘোষাল

সুখের কালক্রম ও সমুজ্জ্বল দুঃখ

মায়াবী সামুম

কমল চক্রবর্তী

চার নম্বর ফার্নেস চার্জড

জল

মিথ্যে কথা

আমার পাপ (উপন্যাস)

কৌরব প্রকাশনী

যে কোনও তিনটি বই একসংগে সংগ্রহ করলে রেজিঃ ডাক খরচ আমাদের। আপনার পাঠানো ঠিকানায় স্বদেশে বা বিদেশে আমরা বই পাঠিয়ে থাকি।

সিদ্ধার্থ বসুর নতুন কবিতার বই

সান্ধ্যভাষা

খুব তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে

স্বদেশ সেন

আমি আবার ঘুমিয়ে থাকি

আমি আবার ঘুমিয়ে থাকি
তুমি আমাকে তোলনা
ভোরের দুধ দোয়ে এখন
মুটেরা ফের ভার বয়
পাড়ামাতানো সর্বনাশ
তুমি আমাকে তোল।

শব্দ গন্ধ জড়িয়ে যায়
হাতের বশে থাকেনা
ভিজে-পত্র ঝ'রে পড়ে
বাতাসও আর তোলেনা।
চোখের কোণে সর্বনাশ
কি দেখা ফিরে দেখো!

আমি কাঠ কাটি

আমি কাঠ কাটি, আমি জল তুলি
আমি সবেতন ছুটি পাই

কি আশ্চর্য্য

যদি জল পড়ে, পাতা ন'ড়ে ওঠে
ন'ড়ে উঠতেই নাড়া পাই

কি আশ্চর্য্য

আমি কাঠ কাটি, আমি জল তুলি
আমি সাড়া পেতে কাছে কাছে যাই।

একদা এক

আসল সুখ দুঃখ ছিল
সাদা রঙের বাড়িতে
জানলা ছেড়ে সুখের মুখ
বাইরে যেত বেড়িয়ে
বিমল কাকু হারিয়ে যেত
টানা দেয়াল এড়িয়ে
এক পা পাগল বিমল কাকু।

রঙ ছিল চাল গড়ানো
ভাঙা ফুলদানী ছড়ানো
আশা হারানো দেখেছি।
আবার ছিল ধরা আদর
নানা রঙের চাদরে
সময় ছিল ভালো।

আলগা তাপে উনুন ছিল
হলুদ তেলে শব্জী ছিল
জল ছিলনা কাড়িতে।
এ সব ছিল একদা এক
সব সময়ের বাড়িতে।

১৮/কৌরব

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বাহাদুরি

এ-পাড়াটা ভালো নয়। রাতে
চুপচাপ বেড়ে যায় লোক,
হাড়-মাস বেচাকেনা চলে—
এই পাড়া নয়কো অশোক।

করোটির শাদা ফসফেটে
এখানে ফুটেছে খুব ফুল,
আমিষের লাল গন্ধ-মাখা
পাপড়িতে লেঁকো বিষ হাকে।

পাড়ায় একটি মেয়ে আছে
তাকে ডাকে সবাই—কোয়ারা,
সে যখন গলা খুলে গায়
সবার পাঁজরে বেঁধে কাঁটা,
সকলেই টের পেতে থাকে
কাকে বলে লোহিতসাগর!

এ-পাড়ায় পারমিট ছাড়াই
রাতভর পাওয়া যায় ছুরি
অলীক রক্তের খাপে মোড়া—
পাড়াটার এই বাহাদুরি।

ছুয়ো

ম্যাণ্ডেটারি ওভারের মারো-ছোটো খেলা চলছে।
শেষ পাঁচটা বল।
এখনও পঁচিশটা রান দরকার।
মিয়াঁদাদ পারতেন। আমি? অসম্ভব।
চোখ বুজে
তেড়ে ঘুঁড়ে ড্রাইভ করলেও
একস্ট্রা কভারে এসে হাসি মুখে দাঁড়ায় শয়তান,
মনে হয়, বল নয়,
ফুল এসে তার হাতে অনুতপ্ত হয়েছে।

আমি সেই প্রসাদী ফুলের
বলি হয়ে প্রতিবার ফিরে যাই মুখ-কালো ঘরে।
সেখানে একরাশ ফেনা থেকে
বিদ্বারেরা তেতো গলা তুলে বলে ওঠে—
ছুয়ো! ছুয়ো হেয়ো!

এ-দেশ তোমাকে নেবে না

উন্মূল কাতরতায়
নদীতে ঠুকছে বট গোড়াছেঁড়া মাথা।
কালচে-খয়েরি জলের নিহিতে সিঁদুরকাঠের বৈঠা
সে-কান্না শোনে, শোনে শীতবোট, হাঁস,
ঢেউয়ে দোল খায়
দড়ি কাঠ খড় দুর্গার মান্দাস।

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে

সূর্য উঠেছে হাই কিকে লাল বলের মতন লাফিয়ে।
বাইসেপ তুলে ছুটে আসে মেঘ
সদ্যোজাতকে শাসাতে,
এসবেরই ছায়া আঙ্‌রাতাসা-র জলে
ভেসে ভেসে চলে মাছমারাদের সাল্‌তির দঙ্গলে

এরই তীরে তীরে মানুষ গড়েছে
গায়ে-গা লাগিয়ে বাড়ি।
এরই এক ধারে
বৈষ্ণু চাঁড়াল শববাহকের নাড়ি-ছেঁড়া হরিনাম
মিলে মিশে একাকার—
এখানে মানুষ স্বভাবে পেয়েছে জলের স্বৈরাচার।

কে তুমি এসেছো অস্থি ভাসাতে,
কাদামাটি-চাপা সরায় স্মৃতির অস্থি?
ঘুমে ঢুলু ঢুলু বাঘের মতন ঝুলির ছিটেল মুখে
কে তুমি বটে হে হানাদার,
নেবে না তোমাকে নেবে না—
দিগন্তজোড়া সজল তোমার স্মৃতির অস্থি ছোঁবে না।

শরীরে তোমার ভিজেল গন্ধ, নগ্ন-গঞ্জ মাড়িয়ে
শরীরে তোমার মিৎসুবিশি-র ট্রাক সারি সারি দাঁড়িয়ে,
খাকি তেরপলে চাপা ছায়া ছুঁড়ে
বাতাস নাচাতে নাচাতে
কে তুমি এসেছো ছেড়ে যাওয়া গাঁয়ে
স্মৃতির অস্থি ভাসাতে?

বাজকুড়োনির ঝাঁ ঝাঁ চিৎকারে
দিগন্ত কালা কালা।
দগ্ধ দুচোখে কনীনিকা-পোড়া জ্বালা,

বগলে রোমাঞ্চকর গ্রন্থ
তুমি এসে ধীরে দাঁড়ালে ঘাটের পৈঠায়।
চোখ মুদে আসে,
পিকাশ-ছোটানো ক্লান্ত বাহুর
আস্তিনে লাগে বাতাসের চোরা টান,
লাগে কপালের নুনে,
ঢুকে পড়ে মেদ-মজ্জার শুঁড়িপথে
একটি কিশোর পাঁচ-বাই-দশ শরীরের দড়ি ছিঁড়ে
লাফ দিয়ে নিচে নামতেই
গভীর সোহাগে নুনের পুতুল বুকে নিয়ে ছুটে
কোথায় পালায় নদী,
বালিয়াড়ি জাগে, বুকে বন্যার জ্বালা—
বাজকুড়োলির ঝাঁ ঝাঁ চিৎকারে দিগন্ত ফালা ফালা।

কে চায় তোমার করুণা?
খোলা জীপ থেকে কাকে ছুঁড়ে দাও মুটকরো নাঙা হাড়?
ঐ-হাড়ে ঘষি বজ্র বানায় রোগা, ভুখে ভোগা
আদুল গায়ের মানুষ,
ডাইনে ও বাঁয়ে সামনে-পেছনে
পালানোর পথ পাবে না—
কে চায় তোমাকে? কে চায় তোমার চোরা চেঁকুরের করুণা?

ভাশনাল প্যানালোনিক জ্বালানো রুগ্ন লায়লা-কে ছেড়ে,
খাম্বাল বেড়ালির
চেয়েও নরম, মেদবতী নারী-ঠাসা রাজগৃহ ছেড়ে
এতদিন পর এখানে কিসের খোঁজে?
মাংস-ব্রাণ্ডাভোজে
আয়েসী মানুষ—এ-মাটি তোমার নয়।
যেখানে দাঁড়াবে, সরে যাবে ছায়া, বাতাসে আর্সেনিক,
চারপাশ থেকে ঘনিয়ে আসবে ভান্সিনানের বন—

তুমি মানে, প্রতি গেরস্ত ঘরে নিপাট অরন্ধন !

ঐ ভাখো, মুখ ফিরিয়ে নিলেন মা।
তুমি কার ছেলে ? কার কোলপোঁছা ছেলে ?
অথচ কানীন ছিলে না তো তুমি,
জন্মে তোমাকে আঁতুরে ফেলেনি শুন,
নাভিতে নুনের পুঁটুলি-গরম সেঁক
তুমিও পেয়েছো বুড়ি দাই মা-র হাতে
গিনি দিয়ে মুখ দেখেছেন পিতামহী,
জন্মে তোমার বাতাসা লুটের মোচ্ছব
হয়েছিল যথাযথ—
তবে আজ কেন, কোন পাপে, অভিশাপে
পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন মা ?

চুর্ণ রোদের ফসফেটে শাদা মাঠ-ঘাট,
তুমি যাও
সামনে-পেছনে খরিশ সাপের চেরা জিভে শিস্,
যাও।
মথুরায় যাও,
এ-দেশ তোমাকে নেবে না,
দিগন্তজোড়া সজল
তোমার স্মৃতির অস্থি ছোঁবে না।

সতেরো বছরে ৪৯টি সংখ্যা। কতটা মূল্যবান! তবে গত সতেরো বছর ধ'রে একটা ছোট, অপুষ্ট কাগজের টিঁকে থাকার লড়াই। জামসেদপুর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে সুইডেন, আমেরিকা, লণ্ডন, ফ্রান্স। অথবা সুদূর অরুণাচলের অখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশনের ছোট একটা ঘর। অথবা গয়ার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজ লিখছেন। আজ এতদিন পরে, শেকল দেখছিলুম, খাঁচা দেখছিলুম।

অমলেন্দু বিশ্বাস

প্রক্ষালন

করো, সেরে এসো প্রক্ষালন ভালো করে পুষ্করিণী জলে,
বৃথা কিছু লাভ আছে আস্ফালন ঝেড়ে ? এইসব স্থলে
ভূমির ওপরে ভালো ভাবে হয় না কক্ষনো। সেরে এসো
ঝটপট ঝেড়ে এসো পুকুরের জলে ; প্রক্ষালনে প্রক্ষালনে
গাত্র ধুয়ে উঠে এসো নিরাপদ কূলে ; কৌপীন রেখেছে কে যে ?
বিশ্বামিত্র মুনি পাঠিয়ে দিয়েছে নারদের কাছে !
নারদ কোথায় গ্যালো ? প্রতিবেশী জন কেউ দেখেছিলো ?
আশে পাশে যেতে যেতে 'নারায়ণ নারায়ণ' মন্ত্র পড়ে
ধেয়ে যেতে যেতে আকাশের পথে। ভাখো, চিহ্ন কিছু আছে পড়ে !
যদি পাও জানিও না কাউকে। এই ফাঁকে তুলে নেবো শরীরে শরীরে
নির্মায়ায় জড়াবো কৌপীন। ঘৃণাক্ষরে বিষ্ণুপ্রিয়া
জানতে যেন না পারে। জেনে গেলে কেঁদে কেটে লতাপাতার বন্ধনে
ফের বেঁধে রেখে দেবে তার মায়াবী আঁচলে। সর্বনাশ হয়ে যাবে !
দেবে মুনি অভিশাপ ক্রোধে। পঙ্গু হয়ে চাই না কাটাতে এই জীর্ণ—
চালাঘরে।

ব্যাডমিন্টন

নেটের দু'ধারে দু'জন যুবক
দাঁড়িয়ে থেকেছে ; তৈরি হাতে হাতে ;
পীতাভ শীতের পাতা দেহ থেকে
ঝেড়ে ফেলে দিতে ব্যাডমিন্টনের
খেলা শুরু করে ওরা রাতে রাতে।

২৪/কৌরব

ফিরে আসে রক্তে রক্তে যৌবনের
রীতিবাণ, অভিষেক জলে ওঠে।

নেটের দু'দিকে দু'জন মানুষ
পৌষী আক্রমণ ঠেকায় দু'হাতে
খেলা শুরু করে ব্যাডমিন্টনের
হাতে হাতে বাজে, লাল তাপ নাচে।

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

নদী

ঘুঘু ডাকা মাঠের উপর শরীর নাচিয়ে যাচ্ছে সে···

শাড়ির শব্দে কোন্ ভূয়াং নাচের মাদল বাজছে
পায়ে পায়ে বৈষ্ণবী পদাবলীর ঝুমুর ছড়িয়ে দিয়ে গেলো অহঙ্কার
ওর জংলী যৌবন মহুয়ার নেশায় মাতাল
অযোধ্যা পাহাড় ভাঙছে।

চোখ যেন আর চোখ নয় ধারালো কাঁড় বাঁশ
জ্যা মুক্ত তীর লক্ষ্য ভেদের উল্লাসে মুখর
হাত যেন ক্ষুধার্ত সরীসৃপ প্রখর পৌরুষকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
গিলে হজম করতে চায় এক লহমায়।
নিতম্বে জড়ায় সাপের হিস্ হিস্ শব্দে ফুটছে গোলাপ
আর সেই উরু উপত্যকার ফুল আগুনকেও বরফ করে।

ওর সর্বাঙ্গে এখন নতুন মানচিত্র কয়েক হাজার চোখ নাচায়।
গায়ে লাগে বাঘনখের আঁচড় বিষদাঁতের ছুরি

চলার ছন্দে হাজার মনের বন্যা ছিঁড়ে দৌড়ুতে থাকে আরবি ঘোড়া
হাসির ঠমকে লক্ষ জলপ্রপাত রামধনু ছলকায়
খোলা চুলের মসৃণতায় ভালবাসার ভাল লাগা দুপুর
কবিতার কলম থামিয়ে দেয়।

ওর নাম ধরে ডাক দিতে গেলে বর্ষার টইটম্বুর এক নদী
আমার মধ্যে লাফ মারে।

ঈশিতা ভাদুড়ী

ভালবাসা-ই নির্ভুল গন্তব্যস্থল

কোনো মহার্ঘ মুহূর্তে
হৃদয়, চিবুক বিপন্ন করে
মুখ ফিরিও না।
তোমার আমার কারুরই তো নেই
ভুল স্পর্শকাতরতা।
আমি জানি, বৃন্তের নীচে
কুসুমের অতীন্দ্রিয় ভালবাসা গোপন আছে ;
তুমি জানো, নগ্ন শরীরের গভীরে
রয়ে যায় সমস্ত পরিচয়,
হৃদয় রহিত সমস্ত শব্দ।

তোমার শুভ্রসুন্দর শরীর খুঁড়ে
আমি তো অমরত্বের মতো ভালবাসাই দেখি ;

তবে যদি বৃষ্টি নামে,
যদি ঢেউ ওঠে জেগে,

২৬/কৌরব

কেন পরস্পরের শরীরে প্রবাসী হয়ে থেকো ?

তোমার আমার দুজনেরই তো
নির্ভুল গন্তব্যস্থল—
সেই অমরত্বের মতো ভালবাসা,

তবে, মেঘ-সাদা সেই মুখ
একটি ফুলের বুক ছুঁয়ে
যদি নিষ্পাপ কেঁপে ওঠে—
কাঁপুক না !

মেঘ মুখোপাধ্যায়

মরা ফড়িং

মরা ফড়িং মুখে
যে টুনটুনিটিকে একদিন দেখেছিলাম
আমার স্বপ্নের মধ্যে সে তার আহার ফেলে গ্যাছে
আশ্বিন সকালে স্মৃতির সুড়ঙ্গ বেয়ে
অসংখ্য পি পড়ে নেমে আসছে সীমাহীন কাতারে কাতারে
তাদের বিষণ্ণ ঠোঁটে আশ্চর্য লোকসঙ্গীত
পায়ে ম্রিয়মাণ নম্রতা
তারা ফড়িংটিকে তুলে নিয়ে যেতে আসে
তাদের অপরূপ সংগোপন গুহায়
সে গুহায় কখনো কি গ্যাছো ?
সেখানে এমন কতো প্রজাপতি ফড়িঙের ধড়
হাজার বছর ধরে নিরিবিলি ওড়ে
স্বপ্নের গুহাগুলি আমাকে ঘুমের মধ্যে
গ্রাস করে হিংসায় প্রেমে—এরকম গ্রাস করে আছে

শামশের আনোয়ার

দাহ্যতা-১

আমার মাথায় লাল রিবন ঘোরে
আর একটা চাকা, মানুষের রক্ত মাখা—
ঘরে ঘরে যত লোক মারা যায়, তাদের মরণ-নিঃশ্বাস
এসে আমার চাকার গায়ে লাগে
লাল রক্তের অক্ষ কষি যত অপার্থিব লাল পাখির সঙ্গে
খড়ের চাল জ্বালিয়ে দেয় আমার দাহ্যতা
জ্বালিয়ে দেয় টিন
লাল চাকার ঘষটানিতে ক্রমাগত জানলার পাশের নিমগাছ পোড়ে…
অবিরল পোড়ে আর ছাই হয়ে যায়।

দাহ্যতা-২

আমার মায়ের চোখে খই ছড়িয়ে দিতে পারলে
নিশ্চয় আমার মায়ের চোখ দুটো শান্ত হত—
আর যদি তার মেরুদণ্ডে একটা ঠাণ্ডা প্রবাহ
ছড়িয়ে দিতে পারতাম—
তাহলে নিশ্চয় দাহ্যতা কমে যেত তার।
আমাকে একটা নদী দাও
সেখানে আমি তাকে চোপাব
আমার মায়ের দাহ্যতা কমে যাবে
আমি চাই স্নিগ্ধ, শীতল, অদাহ্য এক
গভীর স্নেহের মা।

২৮/কৌরব

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপনের মেয়ে

টেবিল থেকে নিচে উপুড় হয়ে পড়িয়ে পড়ল রূপোর সিঁদুরকৌটো। সিঁদুরের টুকটুকে লাল কণাগুলি গেরিলা যোদ্ধার মত অতর্কিতে লাফিয়ে নামল মেঝেয়। ঢেকে ফেলল ওর শিরা ওঠা পায়ের পাতা। এখনও সারা হয়নি প্রসাধন। সিঁদুরের রঙ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠছে এক অব্যক্ত বাষ্প, ভরে ফেলছে ঘর, জ্বালা পাকাচ্ছে গলায়। অস্বচ্ছ আয়নায় ওর মুখ এখন দেখাচ্ছে ঠিক দানোর মত। ঝুলে পড়েছে লোলজিভ, ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে লোক। তার ব্যাগভর্তি নতুন টাকার গন্ধ আর ঘরের মধ্যে বিকেলের কনে দেখা আলোয় সেই দানোয় পাওয়া মেয়ে চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠল।

কলার মান্দাসে ভেসে যায় বেহুলা। এ নদীর নাম গঙ্গা। জল এখানে ঘোলা, পুতিগন্ধময়। বারবার ব্যাহত হয় গতি বারবার ভাঙে বেহুলার তন্নিষ্ঠ ধ্যান। দক্ষিণমুখো তার স্বামীর শব ক্রমশঃ পাষাণের মত ভারি হয়ে ওঠে। তীরভূমি বড় লাস্যময়। হাওড়া ব্রীজ থেকে নদীবক্ষে ঝুঁকে পড়া একসার আলো ওকে অপরূপ হাতছানি দেয়, ডাকে। কতকাল ঘরে পা দেয়নি বেহুলা। কতকাল ধরে ভাসছে সে, আর তার ভেলার পাশ বরাবর ভেসে যাচ্ছে কুমীর ও কামটের দল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্যপট তাকে পাগল করে তোলে, টলমল করে ওঠে বিশ্বাসের মূল। জলে স্থলে কিম্বা অন্তরীক্ষে তার স্বামীটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য আজ আর বসে নেই কেউ। লৌকিক এই বেষ্টনী, যা তাকে দেবী মহিমায় বন্দিত করে এসেছে এতকাল, দুহাতে সেই ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ায় বেহুলা। পরম সন্তর্পণে স্বামীর শবদেহটি নামিয়ে দেয় জলে।

রথীন ভৌমিক

পালিয়ে এলাম

ঘরের মধ্যে যেই ফেলেছি পা
দেখেছি একলা আমি
পালিয়ে এলাম
বনের মধ্যে একলা আমি
বিছিয়ে এলাম
সাত সকালে পান্না হীরে চুনী
পালিয়ে এলাম
নদীর বুক বেঁধে এলাম
পাথর ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিলাম
একলা আমি

ঘরের মধ্যে একলা আমি
বনের মধ্যে একলা আমি
নদীর মধ্যে একলা আমি
পালিয়ে এলাম

আমিই পৃথিবী

লাল মাটি, ছড়ানো কাঁকড় মিশে যাচ্ছে
দিগন্ত রেখায়
হেঁটে যাচ্ছে নগ্ন বালক সন্তের মতো

হাতের মধ্যে ধরে আছে লাল পলাশ
দিগন্তের ভিতরে আগুন
জেগে ওঠে মন্ত্র : আমিই পৃথিবী

৩০/কৌরব

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

রূপতন্ত্র

কি করে যে ভেঙে যাও ? ছিঃ তুমি বনকুসুম নও, কঙ্কালমালিনী ?
অমন রঙ্গিণী কেন হলে প্রিয়া, ছুঁড়ে দিলে ফুলশর হলো সর্প, বিদ্যুৎবরণ
এ পর্যন্ত ছিল ভালো, কঙ্কালমালিনী তুমি নিষ্ঠাবতী দেবী

এই জানা ময় হলো, তন্ত্র হলো, বীজ হলো, সরল ও স্বাভাবিক হলো
অমনি ধুস্তুরপান, আবার হেঁয়ালী, জাদু, ছলনায় ঐ সর্প ফের ফুলময়
ছিঃ তুমি কঙ্কালমালিনী নও, বনকুসুম ? তবে আমি
তোমার প্রেমিক হয়ে কতবার বেশ পাল্টাবো ?

শান্ত রায়

তোমাদের নৃত্যগীত

তোমাদের নৃত্যগীতে, তোমার সে নৃত্যগীতে পাঁচশত বছর আগে কারা সব
ছুঁড়েছিলো ছুঁচোবাজি, চিল
চন্দনের গন্ধ আর মৃদঙ্গের শব্দ আজ পাঁচশো বছর পার হয়ে
ভেসে এলো

পূর্ণিমার চাঁদ এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরছে সবাইকে যারা আসছে
মাঠে ও প্রান্তরে
চটকল-মজুরগুলি বসেছে গঙ্গার ঘাটে, বোল উঠেছে করতালে-খোলে
গানের ভেতর থেকে জন্ম নিচ্ছে শিশু

জ্যোৎস্নার হাটুতে মাথা রেখে কারা বসে ঘুরে প্রান্তরের ধারে

ওর পাশ দিয়ে তোমরা হাত তুলে হেঁটে আসবে, এইমাত্র মুচড়ে উঠলো
জলস্থল নাভি

তোমরা এসো, তুমি এসো, তুমি জানো সূর্যের ভেতরে, আরো
অনেক ভেতরে এক শাঁস আছে—আমরা কি জানি ?

শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য

বৈভবময়

জলের লোভে ভালোবাসা জন্মায়···
জন্ম থেকেই অনাঘ্রাত কম্পন—
অহিত কণার আদর—
বৈভবময়···
সহানুভূতির ভোর হয়—
আমার আর জাগা হোয়ে ওঠে না—

না হয়

বেশ—বিষের ভাগ
না দিয়ে
না হয় আমিই নীলকণ্ঠ—
অমৃতটুকু নিও
অমৃততম···
অহঙ্কারের উৎস
দৃঢ়তায় ধরিত—
শ্বাসকণা বায়ুপ্রবাহ
ম্যানগ্রোভা গর্ভিণীর
ভারাক্রান্ত কার্তুজ—।

অমরনাথ বসু

রাত বাড়ছে

রাত বাড়ছে অফিস ফেরৎ মানুষের ভীড়ে
আত্মগোপন করে
একদল নারী
নির্জনতা ভেঙ্গে জেগে ওঠে
চীৎকার চেঁচামেচি
যুবতী শরীরের তরতাজা গন্ধ
স্তব্ধতায় সবকিছু অন্ধকার
মানুষের বেঁচে থাকা এ জীবনে রাত বাড়ছে
গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে মনোরম অভিজ্ঞতা
রাত বাড়ছে অফিস ফেরৎ মানুষের ভীড়ে
অসংলগ্ন দৃশ্যের মতই ভাসছে
চারপাশের ছায়ামূর্তিরা
কে কখন ফিরবে ঠিক নেই
জীবনের সুন্দর স্বপ্ন দেখতে দেখতে
রাত বাড়ছে···দুঃখ আছে গভীর

অজিত বাইরী

মিথ্যুক

'মিথ্যুক, তুমি মিথ্যুক।'
কথা ক'টা আগ্নেয় লাভার মতো ধাঁ-ধাঁ
ছুটে গে'ল কানের পাশ দিয়ে।
কেউ যেন উত্তপ্ত পারদ ঢেলে দিলো কানের বিবরে।

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গে'ল পৃথিবীর ঘূর্ণন—
গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট—সব
একে অন্যের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।
কে উচ্চারণ করলো তীব্র কথা ক'টি—
'মিথ্যুক, তুমি মিথ্যুক।'
কার সেই তীক্ষ্ণ শাণিত কণ্ঠ?
কার প্রতি তার উগ্র অগ্নিবর্ষণ?
চকিতে পলক ফিরিয়ে দেখি,
গলির ভিতর চৌকাঠে দাঁড়ানো পাথরের মতো অনড়
ক্ষোভে ধিক্কারে ফুঁসছে এক রমণী,
আর পুরুষটি পরাজিত ভঙ্গিতে
তাবৎ বিশ্বের অপমান মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রমা ঘোষ

জুয়াড়ি

ফি-বার ঠোকর খাই, তবু আমি বেহেড জুয়াড়ি,
থু থু ফেলে ফের দিই দান,
একে একে কানপাশা কঙ্কণ হাঁসুলি যায়,
ভিটে মাটি যায়,
নিজের দুচোখ তাও পণ রেখে জুয়ো খেলে হারি,
জেদ চাপে, একে একে খুলে দিই শরীরের সব কটি হাড়।
ভূত হয়ে আঁশফল গাছে বসে নষ্ট-চন্দ্র সাঙাতের
সঙ্গে ধরি বাজি,
হারি আর হেসে মরি, কালকাসুন্দিরা
বোঝে না কিছুই, ওরা কাঁপে,
জানে না তো প্রথমেই খুইয়েছি কৃষ্ণবর্ণ রাজপুত্রটিকে,
তারপর থেকে আর ভয় নেই ভিখারি হওয়ার।

সুজিত সরকার

সুখ-দুঃখ মিলে যায়

কী আমার সুখ, কী আমার দুঃখ
এখন আলাদাভাবে বুঝতে পারি না আর—
চেতনায়
সব মিলেমিশে একাকার।

কখনো ডিঙিয়ে, কখনো মাড়িয়ে
এসেছি এখানে
বড়ো পৃথিবীতে,
ভুলে গেছি সব কালো স্মৃতি
কাদার, পাঁকের, নর্দমার—
শুধু দেখি
ছড়ানো আকাশ, সবুজ প্রান্তর।
ছোট সুখ, ছোট দুঃখ
চেতনায়
সব আজ মিলেমিশে যায়।

যেতে যেতে দেখি
অনাত্মীয় কখন আত্মীয় হয়ে যায়
অপরিচিত কখন পরিচিত হয়ে যায়
শত্রুও কখন বন্ধু হয়ে যায়।
চলেছি আদিম ঐক্যে,
পূর্ণতায়—
ছোট সুখ, ছোট দুঃখ
চেতনায়
সব আজ মিলেমিশে যায়।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

সমূহ শোকগাথা

ঝরো, ঝরে যাও, চিন্তার সমূহ মেঘ, ঝরে যাও
আমার নিহিত নিদ্রা, শয্যার তিমিরে আমাকে নিক্ষেপ করো
ঝরো, অবিরত ঝরে যাও শরীরের উপক্রুত অঞ্চলে

বালিশে মাথা রেখে কাঠ হয়ে পড়ে আছি সারারাত
সাম্প্রতিক জ্বালা খান-খান ভেঙেছে তার আদ্য কুঠারে
ভেঙেচুরে পড়ে আছি রক্তের ভিতর, এককোণে পড়ে আছি, একা

হানো, আমার চিন্তার জালে, জ্বালায়, হানো কিছু অভ্রের গুঁড়ো
নক্ষত্র-প্রতিম মনে হয় যেন, বিছানা-বালিকা যেন বোঝে, রাত আছে
যে নিদ্রা, গ্রন্থির গ্রন্থনায় যেন সুখপাঠ্য হয় সমূহ শোকগাথা

নিতাই জানা

কোজাগর

নিকণ তোমারি ঝরনা পাহাড়ী কুটের তল, কোজাগর দেশে
নীলাভ শব্দের সাথে হাওয়া বয় ; শ্যাম হাওয়া, নক্ষত্র চরণ ;
ঘোরে এক চক্রযান, ফেটে পড়া রেণুমালা মুহূর্ত আবেশে ;
বাহুলতা মেলো, কোনো জাতিস্মর ; যে উঠেছে ছত্রাকে অলেপ ;
সঙ্কুচিত হলদে জল, ক্রমে ক্রমে শ্মশ্রুময়, শ্রাবণী নিস্বন
ঘুম থেকে ডেকে তোলে : অজস্র রূপোলী রেখা, আনন্দ হীরক
এক কোণ থেকে তার অন্যকোণে, কি আঘাতে বঙ্কিম আক্ষেপ
পদ্মের পাতায় ঝরো, উর্ণাজাল ছিঁড়ে ফেলে মাংসের তুরগ।

তাপস রায়

ক্যাসিনোতে ঝড়

ক্যাসিনোতে ঝড়, জুয়ার টেবিলগুলি
উড়ে যায়
নিভে যায় আলো, মাংস ও মদের প্রবল নাচে
বুঁদ হয়ে ছিল যে সব নারী ও পুরুষ
তারা এবার খোঁজে কে বা কার পাশে লুকিয়ে আছে
বিভোর আততায়ী

টেবিলের নৈঃশব্দ

টেবিলের নৈঃশব্দ, টেবিল জানেনা
দু'দিকের চেয়ারও কি জানে ? শুধু
টেবিলের বিস্তীর্ণ মাঠ চুপ ক'রে পড়ে থাকে
তার মধ্যে
হাত ও আঙুলের খেলাগুলি হারিয়ে যায়

গুপ্ত

সবটুকু দেখাওনি, ঢেকে রেখেছিলে
অর্ধেক, তাতেই

মুহুর্মুহু হাততালি উঠল
ছুঁড়ে দেওয়া হোল টাকা

তারপর মুখ থেকে লালা মুছে
তোমাকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে
চলে গেলাম যে যার শিবিরে

। একা দেখে নিলাম তোমার গুপ্ত যা কিছু

প্রভাত মিশ্র

মজার দিকে

বলতে চাই না শুধু হাত-পা র'য়েছে বাঁধা,
চোয়ালের ঘা-খানি লুকিয়ে রেখেছি।
দেখতে এসেছি যাকে তার মুখোমুখি এই সমুদ্রের হাওয়া
আমাকে সংযত করে, নির্লোভও করে কিছু কিছু।
কার কবিতায় যেন লেখা হ'লো সমুদ্র গর্জন না, গান।
গান মানে না বলা চিৎকার, আর
থাকা-না-থাকার শিৎকারের স্বর :
এইমাত্র মনে এলো, ছড়িয়ে দিলাম আমি শরীরের শব—
দিগন্ত রয়েছে ফাঁকা, যেতে পারি
খুব যেতে পারি।
আমার দাঁতের ফাঁকে কুটকুটে কৃষ্টিপোকা
দেখতে পাচ্ছি।
দেখতে পাচ্ছি ভোর, দুই চার পাঁচ ক'রে লোকজন
নেমে এলো পথে—কাল রাতে কার সাথে
কী কথা হ'য়েছে কেউ বলতে বলতে থেমে গেল।
পুরো কলগেট দিয়ে ঘুরে ফেলবো দাঁত-মুখ
ভাবছি এখন ; হিন্দু না ভারতীয়, পাহাড়ী না
গাঙ্গেয়—এই প্রশ্নে খচখচ ক'রে ওঠে চোখ।

বৃষ্টি এলো। মনে হ'লো স্বপ্ন যে বাস্তবের, সে বড়ো
মজার দিকে যেতে ব'লেছিল।
ভিজে ভিজে যেতে হয় ওই বনঝাউ আর
ভালুকের কাছাকাছি নিজেকে ঢাকতে।
হাতে কোন ছাতা নেই, আর মাথাব্যথা নেই—
চোয়ালে থাপ্পড় খাবো বলবো না কিছু।
উথাল ঢেউয়ের মতো উঠবো পড়বো :
পাঠক বলুন দেখি, কল্পনা ঠিক ক'রে—
আজ আমি গর্জন, না গান ?

মহুয়া চৌধুরী

মধ্যসিঁড়ি

ছাদ : মধ্যসিঁড়ির ছাদে বসবাস।
ঘরে নয়।
মাঝসিঁড়ির ছাদে—ফাঁকা ছাদ
এখানেই স্বচ্ছতার বসত ঠিকানা ?
তবু, মন পড়েছে ঘরে আমার সে মরা ঘরেই।
রক্তের সিঁড়ি জুড়ে শুয়ে আছে
মায়ের শরীর
দরজাহীন অপরিচয়ে এদিকে উপ্‌চে যাচ্ছে ঘর ক্রমাগত—
বসবাস মধ্যসিঁড়ির এই ছাদ।

স্মরণ : ...দিনগুলি এতো দূরে চলে গেছে
দেখাই যায় না
দিনগুলি, দিনগুলি আমাদের,
আমাদের দিনগুলি, আমাদের...

জলপাত্র : জলপাত্র পড়ে আছে।
জলপাত্র, বন্ধ্যা তালপাত্র পড়ে আছে।
জেনেছে সে,
দিনগত অপেক্ষার পাত্রের মধ্য থেকে
একদিন উঠে আসে বলে
কণ্ঠা অব্দি উঠে এসে, টলটলে
পাত্রকে ধারণ করে রাখে।
জেনেছে সে, তবু
নিজে গলে জল হতে পারেনি।

ভিক্ষুক : তোমরা ভিক্ষা দাও
আমি নিতে ভালোবাসি
অনেক ভিতরে রাতদিন
ভুল শিকড়ের মুখে রক্ত এসে পড়ে
সব ভিক্ষা অনুদিত হয়—
এই অবিরল রক্ত ভিক্ষা নিই আমি।
একদিন, প্রবাসী বিষ্ণুর প্রার্থী রক্তাক্ত পায়ের ছাপ
মাটিতে গভীর হবে
ফিরে নেবে আবিশ্ব ঋত।

সোফিওর রহমান

জাত কৃষকের পদাবলী

দুরন্ত ঝরনার জীবন্ত তাগিদে কোন কোন অন্ধ মানুষ
বুকের চর্বারাগে পেয়োর পথ, দু'পাশে যখন উপচে পড়া
চক্ষুমান মানুষের বেনিয়া খাদ।

সে বছর খরায় বুকভরা খোড়সুদ্ধ, মাঠময় ধান শুকিয়ে মরলে

হতাশায় ক্লান্ত যে কৃষক লাঙল চষেনি, আজ সেও উঠে দাঁড়ায়
রুগ্না গাভী যখন সন্তানের জন্য বাঁটে ঝরায় শেষ রক্ত।

স্নেহের পাট্টায় আকাশে গর্ভিণী মেঘ, শিশিরে কতোটুকু ভিজে উঠলো
ঘাসের কেশর—না দেখে থাকতে পারে না জাতকৃষকের চোখ,
এমনি করে বুকের ঝরনায় শোকের তলানি সার হতে হতে
জননীর শুকনো স্তনে কখন যে বসন্ত এল!

যে সকাল কুয়াশায় পুড়ে অগ্নিদগ্ধ দুপুর পেরিয়ে নরম রাত্রিতে
আর একটা সকাল এনে দিল, যোগফলে সেও শিশুর পিতা
কিংবা কারুও প্রেমিক, যেমন বিরহের বাঁকা চাঁদ
অনিবার্যভাবে এনে দেয় মিলনের পূর্ণিমা তিথি।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত কথোপকথন

সম্পর্কহীনতায় আছি
কার্যনির্বাহে আছি—শুধুমাত্র অফিস বিষয়ে
নিয়ম নীতির বাইরেও কিছুটা রয়েছি
কোন ক্ষেত্রেই আধিপত্য প্রায় নেই
বিপজ্জনক পানীয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি
সংযোগ ছিন্ন হচ্ছে সংসারের কাছে
নিন্দনীয় কাজগুলি সম্পন্ন হতে খুব দেরি নেই
এরকম অবর্ণনীয় কথা লিখতে বাধা কই?
ফাঁকা ডায়েরী পড়ে রয়েছে ঘরে
সামনে ভটপেন
টানাপোড়েনে থেকে কি লাভ আমার!

তার চেয়ে সত্য কথা ভালো
যা আমি বলে এসেছি এ যাবৎ প্রতিটি লেখায়
ঔদাসীন্যের দিকে কখনো বাড়াইনি পা
বরং আড্ডায় থেকেছি
মানুষের পাশে থেকে মানুষের খোঁজ নিয়েছি
মান-হুঁশের মতো
ঈশ্বর-টিশ্বর হয়ে উচ্চ আসনে কখনো বসিনি
ক্রমবর্ধমান বেড়েছে বাজার দর
আমি কি এসব কমাতে পেরেছি ?
দাবি-ও কি করেছি কখনো সরকারের কাছে !
এসব দুষ্কর কাজে আমি নেই
বিধিনিষেধের বেড়া ওখানে অনেক

ভালো-মন্দের তলানিটুকু নিয়ে আমি ক্ষান্ত
বেশি জনপ্রিয়তায় গেলে সমূহ বিপদ
তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যতটা-প্রয়োজন-ততটাই চাই
এর বেশি কাম্য নয় আমার কখনো
অল্পে সন্তুষ্ট আছি
অল্প নিয়েই থাকি
আনন্দে-উত্তাপে মাতি এরই ভেতর

আনন্দ ও বিষাদের গল্প

সকলে তো আনন্দকে চায়
কে আর বিষাদ আশা করে !
তবু তারই সংখ্যাধিক্য বেশি
কেন যে এমন ?
এই প্রশ্ন জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক

উত্তর খোঁজা কিন্তু স্পষ্টত সহজ :
আনন্দ নিজের কাছে বন্দী হয়ে থাকে
চাহিদার পিছনে ছোটে বিষাদ শব্দটি
এটা চাই, ওটা চাই
ফ্রিজ আছে, টিভি নাই
তখনই বিষাদ নেমে আসে
একটি পূরণ হলে অন্যটির চাহিদা এসে পড়ে
এভাবেই বিষাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে
নিজেরই ভেতরে আনন্দের বন্দীদশা হয়।

গৌতম দাশগুপ্ত

নতুন ভূগোল

একজন আরব মোল্লার এস্-ও-এস্
সেন্ট জনস্ এয়ারফোর্স বেস্ কাঁপিয়ে
ষোলটি এফ সিকস্টিন্ উড়িয়ে আনলো
খাঁড়ির আকাশে।
তখন সায়ংকাল—
রেড এলার্টের আগেই
আবুধাবির বাতিস্তম্ভের লাল আলোয়
রক্তিম হল পাইলট।
হেডফোনে ম্যাকস্ম্যুলার
তখন তর্জমা করছেন
ওম্ জবাকুসুম সঙ্কাশ—
খাঁড়ির অতলে প্রাক্তন ডুবুরী
শেষবার খুঁজে নিচ্ছে
হরিয়ানার বাঁশী,

জাফ্‌রান তালপাতার ভোঙা,
মরক্কো লেদার আর
লালরুর ধানচারা—
ডিয়েগো গারশিয়ার রাডারে
ঘনিয়ে উঠল
রেড এলার্ট···
অমোঘ টি-এন-টি
নামানোর আগে
ফ্লাস্ক থেকে পাইলটের গলায়
গড়িয়ে পড়ল
তরল তীব্র দহন।
ঘুমোতে ঘুমোতে
সে দেখলো—
নীল মাস্তুলের নীচে
অন্য কোনো কলম্বাস
নতুন ভূগোল।

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

নদীর কাছে কখনো যাব না?

জল সরে গেছে
মনে পড়ে এখানেও এককালে জল ছিল বেশ
পড়ে আছে বালি, ভিজে নয়, শুকনো নিস্পৃহ
স্মৃতির মত স্পর্শকাতর জলের চিহ্ন
হয়তো রয়েছে গভীরে
বালি তার খবর দেবে না
না হয় নাই বা দিল
তাই বলে নদীর কাছে কখনো যাব না?

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পটভূমিকায় লীন হয়ে আছি

তাহা সেগুনের ঝারি নেমে গেছে ঢালু বেয়ে
মাঝে চোরা গোপ্তার পথ এঁকে বেঁকে হয়তো বা
জাহান্নমে নিয়ে যেতে পারে,
একবার সেঁদুলে আর লক্ষ মাইল কোন সভ্যতা নেই,
কেবল ডাকবে তালুক
অসময়ে একলা কোকিল কুহুতান শোনাবে প্রহরে
দু-একটা ময়ূর পেখম দেখাতে পারে হঠাৎ খামোখা
ঝাঁকালো বাতাস এসে ইলিবিলি কেটে যাবে
উড়ুচুলে, অচেনা শরীরে—
এই পটভূমিকায় নিজেকে ন্যস্ত করে লীন হয়ে আছি একলা
জঙ্গলে এলে আচমকা হারিয়ে যাওয়া যায় সহজেই
জঙ্গলে টইটই করে ঘুরিয়ে ফেলতে পারি দিনমান
জঙ্গলে জ্যোৎস্নায় স্নান করে ফেলা যায় সারারাত
জঙ্গলে এলে আচমকা খুঁজে পাওয়া যায় নিজেদের—
এরকম জঙ্গলে কতদিন তোমাকে চেয়েছি চুপিচুপি
তুমি রুণা আসবে-আসবে বলে কখনো আসোনি—

কে বাংলো, কে-ই বা নদী

ট্রেনের জানালা থেকে বহুবার দেখেছি পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণা,
সুন্দর সুন্দর নদী,
নদীর উপরে গোল মুড়ি পাথরের দুরন্ত কজওয়ে—
এমন দৃশ্যের কাছে গিয়ে প্রকৃতিকে
হাতের তেলোয় তুলে নেব

এরকমই ইচ্ছে ছিল আমাদের,—
হঠাৎ সেদিন ঘুলিয়ে উঠল এক এলোঝড়,
এমনই একটা সুন্দর নদীর দেখা পেয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ি
আমি আর কৃণা,
এপারে বাংলো বাড়ি, নদী বরাবর তার ঘর ও বারান্দা, পাশেই জঙ্গল,
ওপারে নিরিবিলি ডোমজুর গাঁও,
মাঝখানে পাথুরে নদীটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে বহুদূরে, কোথায় কে জানে,
বিহার-সীমান্তে এই টাঁড়ভূমি ছবির মতই সুন্দর

এমন দৃশ্যের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে পুরো জায়গাটাই
আমাদের হয়ে উঠল ক্রমশ
নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঠিক করলাম
পুরো দৃশ্যটাই তুলে নিয়ে যাব আমাদের পুরোনো শহরে,
ওকে বলি, ভাখো কৃণা, আমি তো নদীর মতই
উদাসীন, আলাভোলা, এমনই দিকচিহ্নহীন,
তাই নদীটা আমারই থাক,
আর তুমি, বাংলোর মতই ছিমছাম, সাজানো, সুন্দর,
ওটাই তোমার,—
শুনে কৃণা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কক্ষনো না, নদী তো আমিই নেব—
তারপর কে বাংলো নেবে, কে-ই বা নদী, এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক,
তারপর সমস্ত রাত এভাবেই জ্যোৎস্নায় প্রবাহিত হয়,
ক্রমে চাঁদ ডুবে গিয়ে ফর্সা হয়েছে পৃথিবী, তবু মীমাংসা হয় না,
শেষে নদী আর সুন্দর বাংলো প্রকৃতির হাতেই সঁপে দিয়ে
আমরা ফিরে চললাম আমাদের পুরোনো শহরে—

আপনাদের কি কৌরব বিষয়ক কোন কবিতা, গদ্য, গল্প, চিঠি, ক্যাম্প, আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লিখতে ইচ্ছে করছে? এমনকি কোন নাটক বা প্রহসন, লেখা হলেই পাঠিয়ে দিন। প্রত্যেকটি লেখা যত্ন করে ছাপা হবে।

মঞ্জুভাষ মিত্র

কৃকলাস ও পদ্ম

পৃথিবীর শেষবৃষ্টি হয়ে গেছে কবে
পৃথিবীতে আজ আর কোনো পদ্ম নেই
তবুও অদৃশ্য সূর্য শুষে নেয় গোলাপী
ফোয়ারা থেকে সব জল
ছুঁড়ে দেয় উদ্গীর্ণ বদনে
অতএব খয়েরী মেঘ, কালো ঘাস আর
বাদামী পতঙ্গে
পৃথিবী আবার ভরে উঠল
এবং কৃকলাস উত্তেজিত সাতরঙ বিচ্ছুরণ করে
সমব্যথী শুভ্রতার অনুগামী ফুল
কারণ সে প্রযুক্ত সময়ে
অবলীলাপদ্মের খুব কাছে গিয়ে
একথা বলতে পেরেছে
আমি পদ্মভুক, বহুদিন উপবাসী
তোমার মৃণাল-ডাঁটা এবং মূল পাপড়ি
আমাকে খেতে দাও

পদ্ম পুষ্পিত সুগন্ধের প্রথম সমাধি নিরুত্তর
অন্তম উৎসাহী সরীসৃপ
অতঃপর তাকে সাত রকমের স্ফীতি দেখাল
শিরা কোষ এবং গ্রীবার চাতুর্য
এবং আকৃষ্ট পদ্ম (বস্তুত বিষম মায়াবতী সে)
ধীরে ধীরে পাপড়ি ব্যাদান করে গিলে ফেলল
পদ্মভুককে ;

মাতাল নেশার জীব এইসব দুর্ঘটনা
কিছুতেই টের পায় না ব'লে
শুভ্র পাহাড়
হাড়
চারদিকে জমে ওঠে নিখুঁত নিয়মে
মাংসাশী পদ্মের কাছে পদ্মভুক কৃকলাস
বারবার পরাজিত হয় তবু
আক্রান্ত নূতন কৃকলাস আসে
শাশ্বত পদ্মের কাছে একরাশ বাদামী বাতাসে
সেই পদ্ম সূর্য-রক্ষিতা
ব্যাধি আর বৃত্তির শেষোক্ত আশ্রয়

নিজস্ব হরিণী

দেখ আজ আমি সারাদিন এক ব্যর্থ কবিতায়
দিন কাটিয়েছি
তবুও সময়মত জলাভূমি রম্য ইতিহাসে
নতজানু হয়ে লেহন করতে ভুলিনি।
আর তখনি সময় নিজস্ব ধর্মে
আমাকে নিহত করেছে।
তবু পড়ে যাওয়ার আগে
আমি আমার নিজস্ব হরিণীকে
পরিশ্রমে
আক্ষরিক করে যেতে পেরেছি।

দেবদাস আচার্য

উপনিবেশিক আত্মা—১

তাকেও সহসা স্তব্ধ মনে হয় আজ
খড়্গের অল্প নিচে ঝুলে আছে তার আত্মা, উন্মুখ
আহত পাখির মতো
সহসা তাকেও মনে হয় কাঁদছে, জ্যোৎস্নায়, একা

সব ভুল ছিল ? হে জীবন
যে যেমন মেতে আছে, তুমি তারই ভিতরে তেমন ?

সামনে অরণ্য, উপজাতিদের উৎসবের শব্দ ভেসে আসে
পিছনে গ্রামের শ্রম-জীবীদের রোল বয়ে যায়
আকাশে চাঁদের তন্ত্র শিশু-শ্রোতাদের গল্প বোনে

যাদু বিশ্বাসের দেশ, পরমার্থবাদীদের দেশে
আজ সে একাকী কাঁদে, ভ্রষ্টাচারী, রিপু বিতাড়িত এক
স্বপ্নের ভিখারী
এই অন্ধ মন, এই অন্ধ চোখ নাও, কাপালিক, কিন্তু জেনো
স্বপ্ন-হীন পৃথিবীতে মানুষের বসবাস কখনো ছিল না

উপনিবেশিক আত্মা—২

হায় আত্মা, দংশনের পরে কেন তুমি
নীল হয়ে ওঠো ?
আমি পাঠ নিই

অসীম রুক্ষতা থেকে, সন্ত্রাস থেকে তোমাকে রক্ষা করব বলে।
যে প্রেমের গল্প লোকে বলে, যে শপথ নিয়েছে মানুষ, আমি তার
সারাৎসার দিয়ে তোমাকে গড়েছি, এই দেখ
রোদে পোড়া মুখ, আমি সর্বত্র খুঁজেছি
তোমার আরাম,
তুমি কি তা বিশ্বাস করোনা ?

ধৈর্য ধরো, আর একটু ধৈর্য ধরো, জেনো
তোমার কষ্টের কথা আজ বহু মানুষই বুঝেছে

অরুণেশ ঘোষ

বর্জন

তোদের বর্জন আমি করেছি জন্মের পর এক রাত্রিবেলা
কামিনীর সাদাফুল, মাটি, তারা আর জোনাকির খেলা
একা একা, হেসে হেসে, অবশ্য নিঃশব্দে হাত নেড়ে
ওই যে ফুল-বিকৃসার ওরা, আমাদের শিশু নয় কেউ
কারুরই সন্তান নয় ওরা, কী বীভৎস
প্রত্যেকেই ফিরেছে কোথাও—
বারবার বর্জন করতে গিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়াই
দেখি, ওরা আমাকেই ছেড়ে চলে গেছে
শিক্ষা দিয়ে গেছে···

পোকা আর মঞ্চের বক্তা

কুরে খাওয়া পোকা, শিশুর মুখের লালাক্ত ক্ষতে তুই
এতটা যত্নের অযত্নে বেড়ে উঠবে, মিশে যাবে ভীড়ে
ঘুন্ত চোখ অসুস্থ পল্‌কা হাড় নিয়ে সেও এক অদ্ভুত মিছিল
করে দাঁড়াবে ময়দানে এসে, কুরে খাওয়া পোকা, তোকে আমি
কোন্ দুরদেশ থেকে নিয়ে আসি, ভুল করে নয়
—নির্ভুলের রক্তস্রোতে
চোখে ছানি, কানে সে তত্তটা শোনে না, তাহলেও
সঙ্গীকে জিগ্যেস করবে, মঞ্চের ওপর থেকে যে
বলে যাচ্ছে, তার মুখ···তার কথা···

যুবক

এরা কেউ এনেছিল পাগল বোনকে
রেললাইনের ধার থেকে তুলে এনে ঘরে রেখে

এরা কেউ এনেছিল বিশ্বায় বিবাহ উৎসব থেকে
পোড়া মবিলের মাঠে, রাজনীতি আরও কিছু মুখ তুলে ধরে

এরও পর, এখানে, রাস্তায় এসে খোঁজে চোখ টিপে হেসে
আরও সহজ স্ত্রীলোক কারা, বোনেদের মত নয় ঠিক

আমার সামনে এসে, আমাকে আরেক ধূর্ত ভাবে।
আরও এক চালবাজ, সিগারেট দিতে গিয়ে
হাত থেমে থাকে···

নীচু হই

আর আমি নীচু হই, যে দিন শুনছে শেষ হওয়ার
তার চোখের দিকে চোখ রেখে ভয়ও নয়, নয়
কোন তীব্র টান ভালবাসার, কি সে প্রার্থনা করে ?
বার বার, আমাকে এভাবেই খুলে রেখো পরাজয়

আমাকে এভাবেই খুলে রেখো আমার গান
হাস্নুহেনার ঝোপকে ধ্বংস করেছে সামান্য বিকার
কিন্তু সেও জয়ী, যে আগুন-ঝরা শরীরে করে স্নান
আমাকে এভাবেই খুলে রেখো প্রথম ও শেষবার····

আজগুবি

আজগুবি এক টিলার উপর দাঁড়িয়ে
এই কি আমার শেষ ও নিঃশব্দ নমস্কার !

নীচে ঝরে পড়ছে টুকরো টুকরো শহর
নীচে ঝরে পড়ছে ছিন্নভিন্ন গ্রাম

যাকে আমি প্রণাম করতে গেছি, তোমরা
চিৎকার করে উঠলে, গলিত কুষ্ঠ পা

আজ দেখি এই ফসলের খেতে সূর্য ওঠার লাল
আজগুবি এক স্বপ্ন আমি, এই শৈশবও আমার না···

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক

বয়স্থ

আমি জেনেছি
মানে, কথাপ্রসংগে জানা গেছে
স্যান্স্কৃট স্কুলের হেডমাষ্টার সুজিত দাশ
ভিন্তিপাড়ার হোমিও ডাক্তার এন. সি দে
কবি উৎপলকুমার বসু
ছাপা-কারবারী আমার মতোই ১৯৩৬-এ জন্মেছেন
অর্থাৎ, ১৯৩৬-এ আমরা সকলেই মায়ের দুধ খেয়েছি
সুজিত দাশ একটু আগেভাগে, আর. এন. সি. দে একটু দেরি করে
তবে, ১৯৩৭-এ চারজনেই হামা টেনেছে
যথাক্রমে ফরিদপুর, ঘাটশীলা, রাণাঘাট আর কলকাতায়
এবং '৪৬-এর রায়টে চারজনেই খুব ভয় পেয়েছিল।
নার্ভাস ফিভারও—জ্বর উঠতো ১০০ কি ১০১।.....
১৯৫৫ নাগাদ যে যার আই.এ./আই.এস্‌সি. সেরে ফেলে
হাঁটা দিলে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমে— আর
বছর কয়েকের মধ্যেই নেমে পড়লো দু'পয়সা কামাতে.....
কালক্রমে, কেউ কারো প্রীতিভোজে নেমন্তন্ন না খেয়েও
সকলেই বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার শুরু করে দিলে.....
তারপর সবই যার যার তার তার মতো।
শুধু, ওবছর, স্যাট মীনস্, '৮৬তে সকলেরই বাড়ির লোক
এক একটা দিন বললে
'আজ তোমায় একটু পায়েস খেতে হবে, আজ তোমার ৫০ ভর্তি হলো'
লাজুক লাজুক মুখে আমরা পায়েস খেলুম।

কোথায় যেন পড়েছিলুম—রূপাঞ্জলি না রূপমঞ্চে—
আমাদের উঠতি-বয়েসের দিল-কি-রাণী বোম্বের মধুবালা
সে-ও নাকি জন্মেছিল ঐ ১৯৩৬-এই.....
মধুবালা, কিছুদিন হলো, মারা গেছে।

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

"যেদিন আবার ফুটবে মুকুল"

সবদেশে সবকালেই কীর্তিমান মানুষেরা, দেখা যায়—দু'ভাবে বাঁচেন বা বাঁচতে চান। একটু অন্যরকমভাবে বলতে গেলে কোনো গুণীজনের স্বীকৃতির দু'টি চেহারা আছে—একটি তাঁর স্বকালের স্বীকৃতি ও সমাদরে. অন্যটি ভাবীকালের মূল্যায়নের মাধ্যমে বাঁচা, যাকে বলা হয় অমরতা। প্রথমটি বহু জনের ঈপ্সিত হলেও ততটা দুর্লভ মনে হয় না এই অর্থে যে, এটা সম্পূর্ণতঃ না হলেও কিছুটা আয়াসসাধ্য। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অমরত্ব লাভ করার ব্যাপারে কোনো গুণীরই নিজস্ব কোনো হাত নেই—মহাকাল নামক সম্মার্জনীই সেখানে নিয়ামক।

অনাগত যুগের মানুষের রুচির দিকে লক্ষ্য করে শিল্পকর্ম বা সাহিত্যসঙ্গীত রচনার চেষ্টা করার খুব একটা অর্থ হয়না এজন্য যে, সেটা অনেকটা যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। ভাবীযুগের রুচি তো আজই আঁচ করা সম্ভব নয়, তাই সমকালের সমাদর যদি পাওয়া যায়, সেই নগদবিদায়েই সন্তুষ্ট থাকেন অধিকাংশ গুণীজন। অবশ্য তাঁরা জানেন যে, এই পাওয়াটা আধাআধি পাওয়া, সমকাল ও ভাবীকালের দুই মূল্যায়ন মিলেই যে কোনো প্রতিভা বা মনীষার জাগতিক অস্তিত্বের যথার্থ নিশানা।

এই দুই মূল্যায়ন যে প্রায়শঃই একরকম হয় না—তার নজীর তো নিতান্তই কম নয়! অন্ততঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে, যাঁর জন্মের পর শতাধিক বছর পেরিয়ে গেছে, এই দু'টি মূল্যায়ন যে সম ওজনের হয়েছে এরকমটা বলা যাবে না। অথচ এমন একটা সময় ছিল, যখন সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ছিল অবিসংবাদিত, তখন রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে, সমকালের মতো দূরকালেও নন্দিত হবে সত্যেন্দ্রনাথের কবিযশ : "...অনাগত যুগের সাথেও/ ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর, / গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর, / সত্যের পূজারি!..." সত্যেন্দ্রনাথের অকালপ্রয়াণের পর রচিত বহুশ্রুত সেই শোকগাথার আর এক অংশেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

…আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে / দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে / দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান / দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাওয়া গান / মূর্তিহীন !…"

দেখা যাচ্ছে, ভাবীকালের দরবারে সত্যেন্দ্রনাথের আসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ কোনো সংশয় ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও কিছুটা আশাভরে বলে গেছেন :—"যেদিন আবার ফুটবে মুকুল সেদিন আমায় দেখতে পাবে !" সত্যিই যে-কোনো সাচ্চা কবির রচনায় কিছু না কিছু চিরকালীন আবেদন থাকেই, যতদিন মুকুল ফোটে, বাকুল ফাগুন হাওয়া বয়, ততদিন তাঁর অনুভূতির সমাদর থাকেই। সেই নিয়ম মেনেই আমরা দেখতে পাই কিনা কবি সত্যেন্দ্রনাথকে—সেটাই আমাদের আপাতত অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কথা মানতে গেলে অবশ্য তিনি দেখার অতীত এক মূর্তিহীন অস্তিত্ব—কিন্তু সেটি নিত্য গাওয়া গানের মতোই স্পষ্ট ও পরিচিত।

আবার রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়নের মাত্র সিকি শতক পরেই মোহিতলাল মজুমদারকে লিখতে হয়েছিল :—"কবি সত্যেন্দ্রনাথের যশোভাগ্য ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। জীবিতকালে তাঁহার যে কারণে প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহা এখনও অটুট থাকিত, অবশ্য যদি তিনি প্রতিমাসে একগুচ্ছ কবিতা (সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইলে আরও ভাল) প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া নাই ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।…"

মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধির যে কারণ দেখিয়েছেন সে বিচার দূরে সরিয়ে রেখে আপাততঃ শুধু এটুকু লক্ষ্য করতে পারি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করেও মোহিতলালকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, ভাবীকালের বাজারে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোকুসুমগুলোর সেই চটক অনেকটা কমে গেছে। আজ মোহিতলালের মূল্যায়নের আরও প্রায় চারদশক পরে এসেও আমাদের মনে না হয়ে পারে না যে, সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ততটা পূরণ হয়নি। আজ যখন সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোসৌকর্যের ও অনুবাদ কর্মের উল্লেখমাত্র করে এবং তিনি রবীন্দ্র-অনুগামী কবিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন—এ জাতীয় ছাত্রপাঠ্য মন্তব্য দিয়েই তাঁর তর্পণ সারা হয়, তখন মোহিতলালের পর্যবেক্ষণে বাঙালী পাঠক চরিত্রের যে প্রবণতাটি পরিস্ফুট হয়েছে, সেটাকেই বেশী

করে সত্যি মনে হয়।

অথচ, সমকালের অভিনন্দন যে সত্যেন্দ্রনাথ পর্যাপ্ত পরিমাণেই পেয়েছিলেন—এ নিয়ে দ্বিমতের সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এমন একজন কবিকে নিয়ে তাঁর মৃত্যুর অর্ধ শতকেরও পর ভাবতে বসলে যে কথাটা স্বভাবতঃই মনে হয়, তা হচ্ছে দূরকালের মাপকাঠিগুলোতে তাঁর ছবি যদি আজ নূতন করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়, তবে সে ছবি কেমন দাঁড়াবে! সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িকেরা যেসব রঙে তাঁর ছবি এঁকেছিলেন সেগুলোতো সময়ের আঁচে মলিন হয়েছেই। কিন্তু সেসব ছবি দেখার অভিজ্ঞতাকে আমাদের এখনকার যুগের ভাবকল্পনায় অনুরঞ্জিত করে তুললে কি মূর্তি পাওয়া যায়, তার একটা হদিশ নেবার ইচ্ছে আমাদের জাগে। সমকাল ও ভাবীকালের শিরোপায় ফারাকটা কি রকম ও কেন, এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের থেকে যে তথ্যগুলো আমাদের বেশি করে আলোড়িত করে তা হচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরূপ আধুনিক যুগাদর্শের নিরিখে কিভাবে প্রতিভাত হয়, 'ছন্দের জাদুকর' বা 'অমর অনুবাদক'—এসব বিশেষণের কুজ্ঝটিকার মেঘ সরিয়ে একজন জীবন্ত মানুষের তাজা ছবি পাওয়া যায় কিনা—কবিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কেমন ও কতটা যাতায়াত ছিল সেই কবিব্যক্তিত্বের, কেমন ছিল তাঁর পরিমণ্ডল-পরিজন, তাঁর ব্যক্তিরুচি, দিনচর্যার সঙ্গেই বা কতটা যোগাযোগ ছিল তাঁর সৃজনকর্মের। এইসব তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আমাদের জোড়া দিতে হবে অনেক টুকরো ছবিকে—আত্মীয় বান্ধবদের ছোটখাটো বহু স্মৃতিকথায় যে সত্যেন্দ্রনাথ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। এ যেন প্রাচীন পুঁথির বিবর্ণ খণ্ডিত পাতা জুড়ে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা।

সত্যেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র ছিলেন, একথার উল্লেখ তাঁর প্রায় সব জীবনীতেই আছে। পৌত্রের ব্যক্তিজীবন এবং ভাবজীবনের পুঁজি সবই একরকম সঞ্চিত করে রেখে গিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। প্রধানতঃ অক্ষয়কুমারের সঞ্চিত সম্পত্তির আয়েই সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো, আবার অক্ষয়কুমারের বাড়ির লাইব্রেরি থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানসঞ্চয় করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। পিতামহের জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁর মধ্যেও যে বর্তেছিল এটা সত্যসত্যই বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভপ্রদ হয়েছিল। পরে সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের উদ্দেশে লিখেছিলেন, "হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায় / উদ্বোধিত

চিত্ত মোর ; —গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।" প্রবন্ধকার পিতামহের বিজ্ঞান-চেতনা পৌত্রের কবিস্বভাবের মধ্যেও অনেক সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। সুকুমার সেনের মনে হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ ছিল প্রবল, আবার মোহিতলালও বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহস ও সত্যবাদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

পিতা রজনীনাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী হলেও পুত্রকেও হোমিওপ্যাথির পেশায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। নিমতা গ্রামে মামা বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি) পর অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা প্রধানতঃ কাটে কলকাতাতেই। জন্মের ক'দিন পরে বিরাট ঝড় হয়েছিল—সেই স্মৃতিতে ডাকা হতো 'ঝড়ু' নামে। বাবার সঙ্গে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে কবিতা লেখার শুরু। তাঁর নিজের ভাষায়—"ছন্দ সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন" তেরোয় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই। বালাবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারের মতে অবশ্য এগারো বছর বয়সেই (১৮৯৩) সত্যেন্দ্রনাথ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতাটি রচনা করেন। সে সময় সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। অনুবাদের প্রবণতাও স্কুলে থাকতেই দেখা গিয়েছিল। প্রথমে মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশনের বালাখানা শাখা, পরে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর পড়াশোনা। এই শেষোক্ত বিদ্যালয়ে যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখনই ও. ভব্লু. হোমসের রচনা থেকে কিছু কিছু অনুবাদ করেছিলেন বলে শোনা যায়। শেলির বিখ্যাত 'স্কাইলার্ক'ও তিনি এসময় তর্জমা করেন।

যাকে কৃতী ছাত্র বলে, তা অবশ্য তিনি হতে পারেন নি। দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (১৮৯৯) জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিট্যুশন থেকে এফ.এ. পাশ করেন তৃতীয় বিভাগে (১৯০১)। গণিত নাকি তাঁর ভালো লাগতো না, অথচ পদার্থবিদ্যায় ছিল আকর্ষণ। বি.এ. পরীক্ষায় কিন্তু তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। একথা আজ ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, কারণ তাঁর কবিতায় বহুপঠন ও মননের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

তাঁর স্কুলের সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার জানিয়েছেন, স্কুলের ইংরিজি রচনা প্রতিযোগিতায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম স্থান পাওয়ার কথা, স্মৃতিচারণ করেছেন স্কুলে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভায় তাঁর বাংলায় লিখিত ভাষণ পাঠের। ইতিহাসের নিষ্ঠাবান ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথের ছবিও সৌরীন্দ্রমোহনের স্মৃতিচারণ থেকে মেলে।

তিনি লিখেছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের 'ইতিহাস' তাঁদের পাঠ্য ছিল। কিন্তু তখনই সত্যেন্দ্রনাথ এ বইটি ছাড়াও রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস বই, এলফিনস্টোনের ইংরিজি বই ও বাংলায় টডের রাজস্থান প্রভৃতি বইয়ের সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলতেন, দেশের ইতিহাস ও ভূগোলটা সকলেরই ভালো করে জানা দরকার।

এইসময় ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে বন্ধুদের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা করছেন, আবার সনাতনী হিন্দু পূজাপদ্ধতির সমালোচনা করে পূজোতে পশুবলিকে 'কোলাভিলদের প্রথা' বলে বর্ণনা করছেন ও এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' থেকে শুরু করে বেদ পুরাণ—প্রাগার্য ও আর্য সভ্যতা, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় পর্যন্ত নানা তত্ত্ব আলোচনা করছেন, কখনও বা হেদোর ধারে বসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও চরিত্র বিষয়ে যুক্তিশাস্ত্রানুগ বিচারবিতর্ক জুড়ে দিচ্ছেন। এসবের কোনোটাই কিন্তু অমনোযোগী ছাত্রের চরিত্রচিহ্ন নয়, বরঞ্চ তাঁকে রীতিমতো 'সিরিয়াস' ছাত্র হিসাবেই প্রতিভাত করে।

এসব কারণেই স্নাতকত্ব অর্জনে তাঁর অসাফল্যকে কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়।

যাই হোক, ততদিনে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে আরও দু'টি ঘটনা ঘটে গেছে—পিতৃবিয়োগ এবং বিবাহ। বি.এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে তিনি কিছুদিন মামা কালীচরণ মিত্রের আমদানী-রপ্তানির ব্যবসাতে লেগে থাকলেও আর পাঁচজন জাতকবির যা হয় তাঁর ক্ষেত্রেও অন্যরকম হয়নি—সরস্বতীর সাধনায় তাঁকে বাণিজ্যলক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে হয় পাকাপাকিভাবে।

সাহিত্য জীবনের শুরুতে যাঁদের প্রেরণা তাঁর জীবনে কাজ করেছিল, তার মধ্যে স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম উল্লেখযোগ্য। আজ এ ঘটনাকে দূর থেকে দেখে ইতিহাসবিধাতার রসিকতা ছাড়া আর কি মনে হতে পারে যে, এই সুরেশচন্দ্র যাঁর সাহিত্যিক ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের অধ্যবসায়ের যথেষ্ট অংশ ব্যয় করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্তমণ্ডলীর একজন মহারথীরূপে সোৎসাহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এবং তখন রাগ করে তিনি সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লেখাও বন্ধ করে দেন। অথচ কলেজ জীবনের প্রথমদিকেই সত্যেন্দ্রনাথ গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন সুরেশচন্দ্রের কাছ থেকেই। এছাড়া মামা কালীচরণের রচিত গল্প সংকলনের বইগুলোও তাঁকে উৎসাহিত করে থাকবে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা' প্রকাশিত হবার পর

নাকি সুরেশচন্দ্র সে বই 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকাকে উপহার পাঠান সমালোচনা করবার অনুরোধসহ।

কলেজে থাকতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যসেবীরা। এছাড়া অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সতীশচন্দ্র রায়। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার ও সতীশচন্দ্র—এই ত্রয়ী ছিলেন অত্যাগসহন বন্ধু। তরুণ বয়সের একটি ছবিতে এই তিন বন্ধুকে একসাথে দেখা যায়। এই তিনজন ভাবুক বন্ধুর জন্মমৃত্যু যেন একই মৈত্রীসূত্রে বাঁধা, তিনজনই অকালে লোকান্তরিত হন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচির সঙ্গেও ১৯০৩ সাল নাগাদ তাঁর ভালোরকম বন্ধুত্ব হয়ে গেছে—দু'জনকে একসাথে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মাঘোৎসবে যেতে দেখা যাচ্ছে।

কলেজে থাকতেই তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'বেণু ও বীণা' সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন তাঁর নামোল্লেখ না করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ গ্রন্থ পড়ে সত্যেন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়ে লেখেন, "তুমি যে কাব্যসাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে, তোমার এই প্রথম গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'বেণু ও বীণা'র প্রশংসা করেন। তাঁর 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের (১৯০৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত প্রশংসার খবর তিনি সানন্দে বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন দেখা যায়। [মাঘ, ১৩১৪]

ছেলেবেলায় সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা হতো প্রধানতঃ বাড়ির অভিভাবকদের লুকিয়ে। তাঁর পড়ার টেবিল গুছোবার জন্য তাঁর মায়ের প্রায়ই সেখানে হাত পড়তো। ফলে সত্যেন্দ্রনাথকে সামনে একটা ইংরিজি বই খুলে রেখে খাতার পাতায় কাব্যচর্চা করতে হতো। এমনকি বাংলা কবিতা তাঁকে লিখতে হতো ইংরিজি হরফে। পরে স্কুলের সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারকে বলতেন সেগুলো বাংলা হরফে পুনর্লিখন করে দিতে।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত কাব্যপ্রয়াস 'সবিতা' ছাপা হবার পেছনেও ছিল এই সৌরীন্দ্রমোহনেরই উৎসাহ। তাঁরই জমানো তেরো টাকার বিনিময়ে একটি প্রেসকে অনুরোধ করে তিনি এটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। তখনকার বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে অনেক বলে রাজী করানো হয় প্রকাশক হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে দিতে। গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, "এ ছাপিয়ে কি

হবে বাপু? কে পড়বে? বৃথা পয়সা নষ্ট।" শেষে অনুরোধে পড়ে বলেন, ছাপাখানার বিল মেটানোর রসিদ দেখিয়ে দশখানা বই তাঁকে দিয়ে যেতে—তার বেশি নয়, কারণ 'বাজে বই' রাখবার জায়গা তাঁর দোকানে নেই।

এইভাবে প্রকাশিত হলো (১৯০০) নবীন কবির প্রথম গ্রন্থ 'সবিতা' :—"তিমিররূপিণী নিশা—সবিতা সুন্দর! / সে তিমিরে তোমার স্বজন / বিমল উজল আলো সৌন্দর্য আধার! / ফুল্ল উষা—অপূর্ব মিলন।" ইত্যাদি। তিনশো কপি ছাপানো হলো—২৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার দাম রাখা হলো দু'আনা। গুরুদাসবাবুর দোকানে দশ কপি দিয়ে আসা হলো। পাছে তিনি এই 'বাজে বই' তাঁর আলমারি থেকে সরিয়ে দেন, তাই সত্যেন্দ্রনাথ দু'জন বন্ধুকে দু'বার পয়সা দিয়ে গুরুদাসবাবুর দোকান থেকে দু'কপি 'সবিতা' কিনিয়ে আনেন। এছাড়া আর সবই বন্ধু, সহপাঠী ও নানাজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, শুধু একজন দু'কপি পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন ও তেরো টাকার মধ্যে চার আনা ফিরে এসেছিল। গুরুদাসবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ক্যাটালগে প্রথানুযায়ী 'সবিতা'র নাম লিপিবদ্ধ করবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু অভিভাবকদের ভয়ে লেখক হিসেবে নিজের নাম না দিয়ে বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহনের নাম দেন। পরে তিনি বন্ধুকে বই ছাপানোর খরচ তেরো টাকা শোধ করেও দেন।

'সবিতা' বস্তুতঃ একটি দীর্ঘ কবিতা। প্রথম ছাপা হবার পর জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লির রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, পরবর্তীকালের খ্যাতকীর্তি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'সবিতা' পড়ে নাকি প্রশংসা করে বলেছিলেন, "অভ্যাস কর, ভবিষ্যতে সুকবি হবে।" এছাড়া যেসব পত্রপত্রিকায় 'সবিতা' পাঠানো হয়েছিল, তারা কেউ সমালোচনাও করেনি। সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসেবে পরবর্তীকালে 'সবিতা' অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস 'সন্ধিক্ষণ' কবিতাটিও পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়। এরপর অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর পুরোদস্তুর কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা'—যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসোক্তি আমরা আগেই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালেও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে বহুবার সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলোকে বলেছেন 'জন্মান্তর প্রাপ্তি', বলেছেন—"ইহা শিল্পকার্য নহে, সৃষ্টিকার্য।" 'তীর্থরেণু'কে অভিহিত করেছেন 'পুষ্পরেণু' বলে। সত্যেন্দ্রনাথকে 'ছন্দের রাজা' বলে অভিহিত করে কখনও নিজের কবিতা ইংরিজি গদ্যে অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছেন, কখনও বা

পরামর্শ দিয়েছেন বাংলায় গদ্য কবিতা লিখতে, কখনও বা জোগান দিয়েছেন কবিতার আখ্যানবস্তুর। সত্যেন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভার ওপর রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম আস্থারই পরিচয় এগুলো। এরকমভাবেই একটি চিঠিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দেন রবীন্দ্রনাথ :—"তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট, নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটি বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের।…তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝেমাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাব না কেন? কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার ওপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন?" এই উৎসাহেই সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনায় কলম ধরেন, ছদ্মনাম নেন—'নবকুমার কবিরত্ন'। কিন্তু তাঁর এই ছদ্মনামের লেখাগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছু জানতে পারেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের নির্মল, তেজস্বী স্বভাবের সশ্রদ্ধ উল্লেখও রবীন্দ্রনাথ অনেকবার করেছেন তাঁর মৃত্যুর পরে। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের সাথে রবীন্দ্রনাথের গভীর আন্তরিক সখ্য আমাদের সাহিত্যজগতে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর লেখা তাঁর অনবদ্য শোকগাথাটি কে না পড়েছে! কবি ও মানুষ দুই পরিচয়েই যে সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি সম্পূর্ণ করে পেয়েছিলেন—একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে আর কারা ছিলেন সে খোঁজ নিতে গেলে দেখা যায় : সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার বা চারুচন্দ্র রায়ের মতো শিল্পী-চিত্রী, অতুলপ্রসাদ সেন, মোহিতলাল মজুমদারের মতো কবি, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক বিদ্বান, নট শিশিরকুমার ভাদুড়ি, শান্তা শান্তি পাল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী ও নানা শ্রেণীর বিদগ্ধ মানুষ। প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর 'পদচারণা' কবিতাগ্রন্থ উৎসর্গ করলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :—"পোড়ায় জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়বচনে, / ওগো ছন্দ-চক্করীক! পদচারণের কবিবর! / পায়চারি করে চিত্ত তব গুরু-গীতিকুঞ্জবনে, / তারিফে ফুটিয়ে তারা পদে পদে নিত্য নিরন্তর!" [১৯২০] সত্যেন্দ্রনাথও তাঁর 'হসন্তিকা' উৎসর্গ

করেন "সরল সাহিত্য সংরচনায় সুকৌশলী, সাহিত্যবস্তুর বিচার-বিচক্ষণায় সুকৌশলী" প্রমথনাথকে।

প্রবাসী, ভারতী, মানসী, সাহিত্য, যমুনা, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে গদ্যপদ্য বহু রচনা প্রকাশ পায় সত্যেন্দ্রনাথের। এই সূত্রে তাঁর বিরাট বন্ধু ও অনুরাগীমণ্ডলী তৈরী হয়েছিল। এসব পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর বিভিন্ন আড্ডায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন সত্যেন্দ্রনাথ। এছাড়াও রবিমণ্ডলী, মনডে ক্লাব, মেরিগোল্ড ক্লাব প্রভৃতিরও তিনি ছিলেন আড্ডাধারী, সেনট্রাল সুইমিং ক্লাবের উৎসাহী সদস্য। আমরা অনেকেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমরা' ['কুহু ও কেকা,] পড়েছি ["মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে, / আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে !"], কিন্তু জানিনা যে, ১৯১১ সালে কলকাতার মোহনবাগান দল জিতলে তাদের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে 'সঙ্গীত সমাজ' যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, তারই স্মারক পুস্তিকায় তাঁদের অনুরোধে রচিত সত্যেন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র মানস-প্রবণতা ও রুচিবৈচিত্র্যের একটা আঁচ মেলে।

অনতিপরিসর জীবনকালে বেশ কিছু অঞ্চল ভ্রমণ করলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে তার খুব বেশি একটা ছাপ পড়েনি। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। ১৯১৫ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গী হন। শ্রীনগর থেকে এক ভ্রমণবিষয়ক পুস্তিকা তিনি কিনেছিলেন। পড়বার পর তার শেষ দিকে পাতার একপাশে লিখেছিলেন :—"প্রভাত নিশৎ বাগেতে কাটাও, সন্ধ্যা নিশিৎবাগে / শালেমারে তুমি কাটাও জীবন চির-নব অনুরাগে।" ১৯১৮ সালে এবং ১৯২১ সালে তিনি দার্জিলিংএ বেড়াতে যান। দার্জিলিং-এর ছবি অবশ্য তাঁর কিছু কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :—"আমি এখন বসে আছি সাতশো তলা ঘরে / বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।"

১৯০৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মামাবাড়ির লোকজনের সাথে স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে ভ্রমণ করেন জৌনপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও ফৈজাবাদ। লাহোরেও একবার যান চোখের চিকিৎসার জন্য। জৌনপুর থেকে লখনৌ-নিবাসী কবি অতুল-প্রসাদকে সত্যেন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন :—"কলিকাতা ফেলি দূরে / এসেছি জোয়ানপুরে / গোমতীর তীরে গেছি থামি। / তবে ডেরাডাণ্ডা তুলি / লখনৌ-এ এল বুলবুলি / ডাকাত পড়িবে তব ঘরে।" কিন্তু শেষপর্যন্ত আর বন্ধুর ঘরে

ডাকাতি করতে লখনৌ যাওয়া হলো না—জৌনপুরে চামেলির ক্ষেত দেখে বিভোর হয়ে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

পুষ্পপ্রীতি সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সমভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের গোটাটাই পুষ্পের ওপর আধারিত—'ফুলের ফসল'। এতে কত বিচিত্র খ্যাত ও অখ্যাত ফুলের ছবি তিনি এঁকেছেন—ফুলগুলো যেন ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে তাঁর লেখনীতে। এর শুরুতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন মহম্মদের বাণী : "জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি, / দু'টি যদি জোটে, তবে অর্দ্ধেক, ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগী।..." তাঁর 'কুহু ও কেকা' কাব্য-গ্রন্থেরও এক উল্লেখযোগ্য অংশের বিষয়বস্তু ফুল। এই মূল বিষয়বস্তু ছাড়াও নানান ফুলের বর্ণনা ও উপমা তাঁর লেখায় বারেবারে বিচিত্র এবং অজস্রভাবে এসেছে।

হেমেন্দ্রকুমার সত্যেন্দ্রনাথের মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পাওয়া যায় : "...সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির ভিতর পদার্পণ করলেই মনে হোত —হ্যাঁ, কবির বাড়িতে এলুম বটে। উঠোন জুড়ে টবের গাছে রঙ বেরঙের ফুলের বাহার। কবির পাঠগৃহ দ্বিতলে। সেখানেও উঠবার পথে ফুলগাছের রঙিন পাহারা, পদে পদে গায়ে এসে লাগে তাদের পেলব স্পর্শ।..." মামাতো বোন মমতা ঘোষের স্মৃতিসাক্ষ্যেও জানা যায় তাঁর গাছ দিয়ে বাড়ি সাজানোর অভ্যাসের খবর। এই কবি ছাড়া আর কে লিখতে পারেন :—"মনে যেসব ইচ্ছে আছে পুরবে না সে তোমায় দিয়ে, / তাইত প্রিয়ে! মন করেছি আরেকটিবার করব বিয়ে। / ...এবার বিয়ে ফুলের কুলে, জ্যোৎস্নাধারায় অঙ্গ ধুয়ে / হ'ক সে চাঁপা কিংবা গোলাপ, আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে।..." [কুহু ও কেকা]

ফুল সম্পর্কে কবিতা লেখার জন্য তিনি বিভিন্ন ফুলের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। শুধু ফুলই নয়, যে কোনো ব্যাপারেই কবিতা রচনার জন্য তা নিয়ে জ্ঞান সঞ্চয়নের প্রাকপ্রস্তুতি সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যাসের মধ্যে ছিল। বন্ধু চারুচন্দ্রের ভাষায়, "সত্যেন্দ্র যে বিষয়ে কবিতা লিখতেন সে বিষয়ের হাটহদ্দ জেনে লিখতেন। কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখবেন বলে তিনি চেষ্টা করে ঐসব সুরের গান শুনেছিলেন, ফুলের কবিতা লিখতে বহু ফুলের নাম সংগ্রহ করেছিলেন ; মেঘ-ঘটাকে যুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্যে তিনি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে বলতাম 'এসব শব্দের মানে কেউ বুঝবে না।' সত্যেন্দ্র বলতেন—'না বোঝে খোঁজ করে বুঝবে।'..."

বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই জ্ঞানস্পৃহা ও তথ্যনিষ্ঠার অনুশীলন এখনকার ক'জন কবির অভ্যাসের অঙ্গীভূত—বলা মুশকিল। আর সেযুগের প্রেক্ষিতে সত্যেন্দ্র-স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য যে আরও বিরল তাতে আর সংশয় কি! তখনকার দিনে পড়ার সুযোগ সুবিধা তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ হলেও সত্যেন্দ্রনাথের পড়াশোনার পরিধি আমাদের সচকিত সম্ভ্রম উদ্রিক্ত না করে পারে না।

তাঁর পিতামহের গ্রন্থাগারে বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থসংগ্রহ তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবেই পেয়েছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণের সব বই ছিল আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর উপযুক্ত গ্রন্থকীট। খবরকাগজ তিনি তখনকার দিনেও নিয়মিত পড়তেন। তাঁর প্রিয় কাগজ ছিল ব্যারিস্টার এন. এন. ঘোষের 'ইনডিয়ান নেশান'। সৌরীন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন—"সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ সাহেবের ইংরিজি পড়তে ভালোবাসতেন।" রাজপুত ইতিহাস, পুরাণ-কাহিনী ইত্যাদি তিনি বন্ধুদের কাছে বলতেন। অমল হোমের সাক্ষ্য অনুযায়ী দর্শনে তাঁর খুব একটা রুচি ছিল না, তবু দার্শনিক কেতাব তাঁর পড়া ছিল। দেশের ও বহির্বিশ্বের ইতিহাসেও তাঁর কম ব্যুৎপত্তি ছিল না। কাব্যসাহিত্যের কথা বাদ দিলেও কোনো পৌরাণিক বিষয়ে কারও সন্দেহ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই অবলীলায় বলে দিতেন। তাঁর কবিতায়ও এর যথেষ্ট চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। চারুচন্দ্রের ভাষায় তাঁর এক একটি কবিতা "ইতিহাস বা পুরাণের বিশ্বকোষ হয়ে উঠতো।"

সত্যেন্দ্রনাথের বহু ভাষাচর্চার সাক্ষ্যও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই দিয়েছেন। চারুচন্দ্র লিখেছেন, নানাদেশের কবিতা আস্বাদনের জন্য তিনি নানাভাষা শিখবার চেষ্টা করতেন। চারুচন্দ্রের কাছেই ছ'মাস ফার্সি শিখেছিলেন। বন্ধু ধীরেন্দ্র-নাথকে লেখা তাঁর নিজের চিঠিতেও ফরাসী ভাষা শিক্ষার খবর পাওয়া যায়। অমল হোম তাঁকে মোলেয়ারের মূল ফরাসী নাটক এক সেট কিনে নিয়ে যেতে দেখেন কলকাতার রাস্তায়। তাঁর ভাষায়, "ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর মুঠোর ভিতর ছিল।" সুধীরচন্দ্র সরকারের স্মৃতিতে সত্যেন্দ্রনাথের যে ছবিটি ধরা আছে, তা হচ্ছে—চেয়ারের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে 'ভারতী'র আসরে সত্যেন্দ্রনাথ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' পড়ে শোনাচ্ছেন।

ভাষাশিক্ষা ছাড়াও নানাদেশের প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের খোঁজ রাখতেন তিনি। নরওয়ের সাহিত্যিক জোনাস লাইয়ের একটি উপন্যাসের ইংরিজি

সমালোচনা পড়ে তিনি সেটিকে বাংলাতে রূপান্তরিত করেন 'অন্ধ দুঃখী' নামে (ইংরিজি অনুবাদ অবলম্বনে)। তুর্গেনিফের গল্পও অনুবাদ করেছেন তিনি। তাঁর অসংখ্য কাব্যানুবাদের কথা বাদ দিলেও ইংরেজি পত্রপত্রিকা থেকেও অনেক গল্প নিয়মিত অনুবাদ করেছেন তিনি।

তাঁর বহু পঠনের অভ্যাসের কথা লিখেছেন তাঁর মামাতো বোন মমতা ঘোষ। যখনই দুপুরে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে গেছেন, দেখেছেন—তিনি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পাঠনিরত। তাঁর এই লাইব্রেরি ঘরের ও অধ্যয়ন বিলাসের আরও জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখনীতে। "বারান্দা পার হয়ে একখানা লম্বাদিকে বড়ো ঘর। চারিদিকে কোনো দেওয়ালই দেখবার জো নেই, কারণ দেওয়াল ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি, তাদের তাকগুলো চকচকে বাঁধানো কেতাবে ঠাসা। পুস্তকের স্তূপ আবৃত করে রেখেছে টেবিলের উপরিভাগ, ঘরের মাঝখানে যেখানে সেখানে মেঝের উপরেও রাশি রাশি বই।..."

সত্যেন্দ্রনাথ যে পিতামহের গ্রন্থ সংগ্রহ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন তা' নয়, তিনি আজীবন বই কিনে গেছেন, যখনই সুযোগ পেয়েছেন। আর বিশাল তাঁর বৈচিত্র্যের পরিধি। কলকাতার অ্যালবার্ট হলের নীচে এক পুরানো বইয়ের দোকানের এরকমই একটি ছবি, যা অমল হোম উপহার দিয়েছেন :—"একটি ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সাদাসিধা পোষাক, চোখে চশমা, বই দেখছেন কিংবা কিনছেন। একদিন দেখলাম তিনি মূল ফরাসী ভাষায় মোলেয়ারের এক সেট নাটক কিনে মুটের মাথায় চাপাচ্ছেন। আর একদিন দেখলাম Thiers-এর History of the French Revolution-এর ক' ভল্যুম কিনলেন। আরও একদিন দেখলাম খলিলের দোকান থেকে পুরানো কয়েকখানা Monist কাগজ ও কি একটা ফার্সী বই কিনে নিয়ে বের হচ্ছেন।"

তিনি কি জাতীয় বই পড়তেন, তার আরও কিছু খবর তাঁর নিজের লেখা চিঠিপত্রেও পাওয়া যায়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠির থেকে আমরা একটি অসম্পূর্ণ তালিকা যদি তৈরী করি তবে চেহারাটা এরকম দাঁড়ায়—'Psychology of Sex', 'Paola And Francesca' (Stephen Philips), 'Elements of Drawing' (Ruskin) ও কাওয়েল সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহের যে তালিকা রক্ষিত আছে, তা থেকেও কিছু খবর পাওয়া যায়। তাঁর চিঠি থেকেই জানা গেছে, তিনি

হ্যারিসন রোডের পুরানো বইয়ের দোকানে প্রায় প্রত্যহই যেতেন পছন্দসই বইয়ের খোঁজে। এই অভ্যাস তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল, সে সময় পিতামহের সঞ্চিত পুঁজিতেও টান পড়েছে, বেশ অনটন চলছে তাঁর, তবু নানা ভাষার কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ করে গেছেন।

এই জ্ঞানতৃষ্ণাতেই সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিদিন যেতেন তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। এই বহুপঠনের ফসল তাঁর কাব্যক্ষেত্রে কিভাবে ফলেছে তা' নিয়ে সমালোচকেরা নানা কথা বলেছেন। অনেকের মতে সত্যেন্দ্রনাথের এই মনন ও পঠন প্রবণতা তাঁর কবিতাকে অতিমাত্রায় তথ্য ভারাক্রান্ত করেছে, ফলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাঁর কাব্যের ভাবসম্পদ। কিন্তু সে বিচার আপাততঃ আমাদের নয়।

সত্যেন্দ্রনাথের এই 'মননাতিরেক' তাঁর ব্যক্তিস্বভাবে কোন্ শিল্পিত পারদর্শিতার সংযোজন করেছিল তা তাঁর বন্ধুর স্মৃতিকথায় সাগ্রহে লক্ষ্য করি আমরা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বহু শব্দ জানা ছিল ও কবিতায় মিলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন pun বা শব্দক্রীড়ায় সুদক্ষ—এই শব্দচর্চার জন্য তিনি যে শুধু মজলিশি রসিকতাতেই সিদ্ধবাক ছিলেন তাই নয়, তিনি শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের বহু নূতন মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। "আমি তাঁকে প্রায়ই সেগুলি লিখে ফেলতে অনুরোধ করতাম"—চারুচন্দ্র লিখেছেন—"বলতাম, Grimm's Law-এর মতন 'সত্য-নিয়ম' সকলের কাছে সমাদৃত হবে।" তাঁর কবিতায় বহু বিচিত্র ও নূতন শব্দের সাবলীল প্রয়োগে তাঁর শব্দভাণ্ডারের ব্যাপ্তি সম্পর্কে পাঠক মাত্রেরই সন্দেহ থাকে না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ব্যাপারটা দেখানো যে, এই শব্দচর্চা তাঁর অদম্য ও বিশাল-বিস্তার জ্ঞান স্পৃহারই অঙ্গ। সেজন্যই আমরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না যে, এমন মানুষ বি.এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন! আবার এরকম ব্যাখ্যাও মনে আসে যে, গুরু রবীন্দ্রনাথের মতোই হয়তো বা তিনিও শিক্ষায়তনের প্রথানুগ শিক্ষাধারায় কোনো রস খুঁজে পাননি।

মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের পড়াশোনা জানার পরিধি শুধু যে লাইব্রেরীতেই বদ্ধ ছিল একথা মনে করলে মানুষটিকে ঠিক চেনা যাবে না। কবির জন্মলব্ধ যে তৃতীয় নয়ন, মানুষকে, জগৎ ও জীবনকে দেখার সেই চোখ তাঁর খুলেছিল কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে। বন্ধু সৌরীন্দ্র মজুমদার যেসব জায়গায় সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে গেছেন, তার মধ্যে এস. পি. চাটার্জীর নার্সারি, চিড়িয়াখানা,

যাদুঘর, নৌকোতে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ট্রেনযোগে সোনারপুর ইত্যাদি। বন্ধু চারুচন্দ্রের সাথে ঘুরেছেন যাদুঘর-চিড়িয়াখানা ছাড়াও বোটানিক্যাল গার্ডেন, পরেশনাথ মন্দির, বায়োস্কোপ। ফেরি স্টীমারে শিবতলা থেকে রাজগঞ্জ ঘুরেছেন। ঘুরেছেন পথে, পার্কে, মেলায়, শহর ও শহরতলির মানুষের জীবনযাত্রা-হাসি-কান্নাকে প্রত্যক্ষ করতে। চষে ফেলেছেন বন্ধুদের সাথে শ্রীরামপুর, কোন্নগর, গোবরডাঙা, বালি, শিবপুর। চারুচন্দ্র জানিয়েছেন, কলকাতায় কবে কোন্ মেলা হবে সব সত্যেন্দ্রনাথের নখদর্পণে ছিল। তবে যেখানেই যান, রাত ন'টার পর বাড়ির বাইরে তিনি থাকতেন না, কারণ মা মহামায়া দেবী তা' পছন্দ করতেন না।

এই পড়াশোনা ও লোকযাত্রা সম্পর্কে সাগ্রহ পর্যবেক্ষণের দৌলতে অনেক বিশিষ্ট লোকাচার ও প্রথা, গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে এসেছিল, তাঁর কবিতাতে যথেষ্ট পরিমাণে এবং তাঁর 'বারোয়ারি' উপন্যাসের একাংশে তার চিহ্ন রয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভ্যাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন মমতা ঘোষ, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন ; কোঁচানো ধুতি, উড়ুনি, নানারকম দামী শাল,—এইসব ব্যবহার করতেন। শেষদিকে জাপানী কিমোনোর ধরনের পোষাক করিয়েছিলেন—সেই পোষাকে রেলিং-এর পাশে দাঁড়ানো তাঁর ছবি অনেকে দেখে থাকবেন। ঘনিষ্ঠজনেরা দেখেছেন, তিনি বাড়ি সাজাতেন গাছ, ছবি, বই ও সামুদ্রিক দ্রব্যে। যে নান্দনিক পারিপাট্য তাঁর কাব্যধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, সেই রুচিশীল সৌন্দর্যবোধ তাঁর ব্যক্তিস্বভাবেরই একান্ত অঙ্গীভূত ছিল।

তাঁর মামাতো বোন জানিয়েছেন, পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকার অভ্যাস সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। তাঁর হার্মোনিয়াম-শিক্ষার সংবাদ তাঁর নিজের চিঠি থেকে জানা যায়। [ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা ২৭শে পৌষ ১৩১৪ তারিখের চিঠি] স্কুলের সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদারের সাক্ষ্য অনুযায়ী, সত্যেন্দ্রনাথের গানের গলা মিষ্টি ছিল, কিন্তু তা' ভরাট ছিল না ততটা। বাড়িতে গলা ছেড়ে গাইতে পারতেন না বলে বন্ধুর বাড়ি এসে গাইতেন। প্রিয় গান ছিল 'বন্দেমাতরম্', আনন্দচন্দ্র মিত্র রচিত "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা" প্রভৃতি। একবার 'জনা' নাটক দেখতে গিয়ে "ঘরে কি নাই নবনী" গানটি তুলে নিয়ে আসেন ও স্মৃতি থেকে বন্ধুদের শোনান। সঙ্গীত সংগ্রহের উৎসাহে একবার বন্ধুর

বাড়িতে রাস্তায় প্রায়শঃই কয়েকটি হিজড়াকে ডেকে বসালেন তাদের থেকে গান লিখে নেবার জন্য। তারা তো না নেচে গেয়ে গানটি আবৃত্তি করতে পারবে না! তাই সই। ফলে বন্ধুর বারান্দায় এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। দু'আনা মূল্যের বিনিময়ে নৃত্যগীত চললো হিজড়াদের—সত্যেন্দ্রনাথ গান লিখে নিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর এই সঙ্গীতপ্রীতি স্ফূর্তি পেতো কখনও কলকাতার রাস্তায় প্লেগ নিবারণী নগর সংকীর্তনের দলে যোগ দিয়ে, কখনও বা স্কুলের বিচিত্রানুষ্ঠানে স্তোত্রগীতি পরিবেশন করে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, যখন একদিন নিজের বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধুদের তাঁর 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটকটি পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন, তখন তিনি মৃদুস্বরে তার গানগুলো গেয়ে শুনিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন। প্রায় গোটা তিরিশেক গানে তিনি নিজেই চিত্তাকর্ষক সুর বসিয়েছিলেন। "নিবিড় সখ্য স্থাপন করেও আমরা জানতে পারিনি যে, সুরসৃষ্টিতে তিনি অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী।"

সামাজিক জীবনেও সত্যেন্দ্রনাথ কর্তব্যপরায়ণ ও জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন, বহু বিচিত্র পথে ধাবিত ছিল তাঁর জাগ্রত চিত্তের আগ্রহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্কুলজীবন থেকেই তাঁকে নানা ধরনের সভাসমিতিতে যেতে দেখা যায়। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে বা ক্লাসিক থিয়েটারে ধর্ম বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা শুনতে, কিংবা টাউন হলে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের বক্তব্য শুনতে তাঁর সমান আগ্রহ। কখনও স্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন, কখনও যাচ্ছেন শিশিরকুমারের নাটকের মহড়া দেখতে। কখনও কার্জন পার্কে বন্ধুদের সাথে সাহিত্যালোচনা চলছে, কখনও বা যাচ্ছেন হেদুয়াতে সাঁতার কাটতে। সাঁতারে তাঁর নেশা ও উৎসাহের ছাপ পড়েছে 'জলচর ক্লাবের জলসা রঙ্গ' কবিতায়।

আবার জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়েও সত্যেন্দ্রনাথ বিস্তর পড়াশোনা করেছিলেন, এমনকি, বহু রাশিচক্র সংগ্রহ করে কোষ্ঠীবিচারও করেছিলেন—এমন সংবাদও মেলে। এই পড়াশোনার ফলে জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ তিনি অবলীলায় কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি কবিতায় তিনি লেখেন: "কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা / পূর্ণা তিথি মিলালে আনি রিক্তা মাঝে নন্দা।" রিক্তা বলতে জ্যোতিষশাস্ত্রে বোঝায় চতুর্থী, নবমী ও

চতুর্দশী এই তিথিগুলোকে, আর নন্দা হচ্ছে প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী। 'রিক্তা মাঝে নন্দা' বলতে বোঝাচ্ছেন চতুর্দশী ও প্রতিপদকে যোগ করছে যে পূর্ণিমা, তাকে। এটা সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় উপমা ছিল। 'কুহু ও কেকা'রই 'লক্ষ দুর্লভ' কবিতায় আছে :—"জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তা তিথি শেষে!" কিংবা—"রিক্তা তুমি সন্ধ্যা মেঘের রক্তনদীর কূলে / পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়!" ['কে']। 'কুহু ও কেকা'র 'জ্যোতির্মণ্ডল' নামে একটি কবিতাও অনেকের মনে পড়বে, যেখানে কবি বিভিন্ন মনীষিকে তুলনা করেছেন বিশিষ্ট নক্ষত্ররাজির সঙ্গে।

যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মের দায়িত্ব সত্যেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কবি-সংবর্ধনা (২৮ জানুয়ারি, ১৯১২)। এরজন্য চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে কবিতায় অভিনন্দন পত্র রচনা—সব ব্যাপারেই সত্যেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা! এ উদ্যোগে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান স্মরণ করে চারুচন্দ্র লিখেছিলেন, "...সত্যেন্দ্র কবি সংবর্ধনা ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের, বিশেষ করে সাহিত্য পরিষদের মুখরক্ষা করেছিলেন। তা না হলে য়ুরোপ নোবেল প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে অপমান করত, তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো থাকত না।" কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-সভায় গজদন্তের পুঁথিতে সত্যেন্দ্রনাথের রচিত কবিপ্রশস্তি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয় :—জগৎ-কবিসভায় মোরা তোমায় করি গর্ব / বাঙালি আজ গানের রাজা বাঙালি নহে খর্ব।..."

মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিটি কেমন ছিল? যাঁরা তাঁকে দেখেছেন সবাই স্বীকার করেছেন অত্যন্ত শান্ত সংযত ঠাণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। "যে বিনম্র স্নিগ্ধহাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, তাঁর কথা প্রমথ চৌধুরীও লিখেছেন :—"তাঁর মতো মিতভাষী লোক আমাদের এই বাচাল জাতির মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। আমি নিজে তাঁকে কখনো তর্কে যোগ দিতে দেখিনি, যদিচ তাঁর সমুখে কখনো কখনো আমরা মহা উত্তেজিত ভাবে তর্ক করেছি। তাঁর মুখাকৃতি ও সংযত ব্যবহারের ভিতর থেকে তাঁর চরিত্রের সরলতা ও উদারতা স্বতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়তো।" ['স্মৃতি সত্যেন্দ্রনাথ' / সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ১৩২৯]

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের এই শান্তস্বভাবও যে সময়ে সময়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতো তারও কিছু কিছু বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীরা দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের

তীব্র জাতীয়তাবাদী প্রবণতা একদম ছাত্র জীবনের শুরুতেই বিকশিত হয়েছিল। তাঁর স্কুলের বন্ধু সৌরীন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে, একবার রাগ করে এলফিনস্টোনের ইতিহাস বইখানা সত্যেন্দ্রনাথের ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল। রাগের কারণ তাতে বাংলাদেশের কায়স্থদের সম্পর্কে কোনো অজ্ঞতাপ্রসূত হীন মন্তব্য ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর গৃহশিক্ষক তাঁকে নিরস্ত করেন।

সজনীকান্ত দাশ 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধের ঘটনায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কথা :— "সেনট্রাল সুইমিং ক্লাবের বেঞ্চে বসিয়া কালো চশমা আঁটা চোখে আমাদের মুখে সে কাহিনী শুনিয়া সত্যেন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, পরের মাসের প্রবাসীতে তাঁহার কটূক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা 'কোনও ধর্মধ্বজীর প্রতি' (ফাল্গুন ১৩২৭) বাহির হইয়া নির্দোষ ওয়াটকে সারা বাংলাদেশে নিন্দিত ধিক্কৃত করিয়া দিল।..."

জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা বিষয়েও তাঁর এ জাতীয় আবেগের মানসিকতার ছবি উপহার দিয়েছেন অমল হোম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'সত্যেন্দ্রস্মৃতি' রচনায়। হত্যাকারী জেনারেল ডায়ার হান্টার কমিটির কাছে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তার বিবরণ পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, "...আমার তো পড়ে রক্ত গরম হয়ে উঠছে। আমি যদি উপস্থিত থাকতুম, তাহলে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড করে বসতুম।..." এই জ্বলন্ত ক্রোধ আবার শান্ত অথচ সুদৃঢ় ঘৃণায় অভিব্যক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর 'ফরিয়াদ' কবিতায় :—"বর্বরতার গর্ব করে কাঠগড়াতে কীর্তিমন্ত কত ; / গোয়ার্তুমির সমর্থনে মানবতার করলে মাথা নত ! / জবাব-দিহির ওর ছিল না, ডায়ার পেল খোলসা রাত কয়ে— / স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত, কাণ্ড কি যে, বুঝল রয়ে রয়ে।..."

এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। এখানে যে তাঁর তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্গার দেখা যায় তার প্রসূতি নিঃসন্দেহে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। একথা মনে রাখলে সুবিধা হবে যে, তাঁর দ্বিতীয় কবিতা পুস্তিকা 'সন্ধিক্ষণ' স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বহু সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। তাঁর চিঠিপত্রে সমসাময়িক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর তীব্র সচেতনতা ও উৎসাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট। তাঁর মৃত্যুর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"He was a fiery nationalist, almost a revolutionary !" অথচ সত্যেন্দ্রনাথ

তাঁর উত্তরসূরী নজরুলের মতো সমকালীন রাজনীতির চরমপন্থী, বা বিপ্লববাদীদের নিয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নি। কিন্তু আবার সামাজিক সাম্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর আদর্শবাদের স্বপক্ষে সোচ্চার ছিল তাঁর কণ্ঠ। মেথর ও শূদ্রকে যেমন অনায়াসে বন্দনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, তেমনই ধর্মঘট বিষয়ে সম্ভবতঃ তিনিই বাংলার প্রথম কবিতাটি লিখেছেন। ['ধর্মঘট', বেণু ও বীণা] গরীবের জীবন নিয়ে লেখা বিদেশী উপন্যাস নির্দ্বিধায় বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি ['জন্মদুঃখী']। তাঁর প্রতিবাদী চেতনার এক বিশিষ্ট নিদর্শন 'সহমরণ' কবিতাটি।

'কয়াধু', 'গিরিরাণী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় রূপকের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, আবার 'গান্ধীজী', 'চরকার গান' প্রভৃতি কবিতা প্রশ্ন জাগায়, রাজনৈতিক চরমপন্থা সম্পর্কে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন কি ছিল! সাধারণভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্যলোলুপতা বা য়োরোপের রণোন্মত্ততাকে বহুস্থানে ধিক্কার দিলেও 'আখের' জাতীয় কবিতা পড়ে মনে হয়, তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ইংরেজের মধ্যে 'বড়ো' ও 'ছোটো' বা সেরকম কোনো শ্রেণীভেদ করেছিলেন—ইংরেজ বা য়োরোপীয় মাত্রকেই এক দৃষ্টিতে দেখবার মতো নির্বোধ বা সঙ্কীর্ণচেতা কোনোটাই তিনি ছিলেন না। যাই হোক, সত্যেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রাদর্শের বৈচিত্র্য নিয়ে পৃথক প্রবন্ধ লেখার সুযোগ আছে।

সমকালীন রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য ও সমাজের বহুঘটনাতেই তিনি প্রভাবিত আলোড়িত হয়েছেন এমন সাক্ষ্য তাঁর কবিতায় প্রচুর। সমকালীন ইতিহাসের একটি বিস্তৃত ও বিশাল চিত্রশালা বলা চলে তাঁর রচনাবলীকে। কিন্তু নিজের জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনাবলী কতটা ছাপ ফেলেছে তাঁর কাব্যে—এরকম কৌতূহলও আমাদের চিত্ত চঞ্চল না করে পারেনা, যেহেতু আমরা ব্যক্তি সত্যেন্দ্রনাথকে মিলিয়ে দেখতে চাইছি কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

আমরা দেখেছি, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কয়েকটি কবিতায় ছাপ ফেললেও এ ব্যাপারে খুব বেশি সার্থক কবিতার তিনি জন্ম দিয়েছেন এমন কথা বলা যায় না। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা বলেছেন যে, তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল, কিন্তু দাম্পত্য প্রণয়কেই বা তাঁর কাব্যের উপজীব্য হতে কোথায় দেখি আমরা! বাইরের ঘটনাই যেন তাঁকে নাড়া দিয়েছে বেশী করে।

ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির ছায়া যে পরোক্ষভাবে সত্যেন্দ্রকাব্যে পড়েনি, তা নয় এবং সেটা সম্ভবও নয়। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল, চিকিৎসকেরা আশঙ্কা প্রকাশ

করেছিলেন তাঁর চোখ চিরতরে হারাতে পারে তার আলো—এই ভীতির ছাপ সংযতভাবে কখনও কখনও ফুটে উঠেছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। 'বৈকালী' কবিতায় 'নিষ্প্রভ আঁখি'র বেদনা ঘুরে ফিরেই এসেছে দেখা যায় :—"দিনে দু'পহরে সৃষ্টি যেতেছে মুছি, / দৃষ্টির সাথে অশ্রু কি যায় ঘুচি ? / হায়গো কাহারে পুছি !" কি অপরিসীম হাহাকার শুরুতেই ধ্বনিত হয়েছে—"অকূল আকাশে অগাধ আলোক হাসে / আমারই নয়নে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে। / পরাণ ভরিছে ত্রাসে !" কিন্তু ত্রাসের মধ্যেও আশার আলো খোঁজেন দার্শনিক কবি। যে তৃতীয় নয়নের আলোয় কবিরা ক্রান্তদর্শী, তারই আশায় থাকেন তিনি :—"আঁখি নিয়ে যদি ফুটাও মনের আঁখি / তাই হোক ওগো কিছুই রেখোনা বাকী / উদ্বেলচিতে ডাকি।" যা অনিবার্য, তাকে মেনে নিতে গিয়েও কবির মনে এসেছে পৌরাণিক রূপকল্পের কথা—রামচন্দ্রের পদ্ম পলাশলোচনের উপমা মনে করেই যেন বলেছেন :—"পদ্মের মতো নয় গো এ আঁখি নয় / তবু যদি নাও, নিতে যদি সাধ হয় / দিতে করিব না ভয়।" এই হারানোর মধ্যেও ঈশ্বর নির্ভরতায় পরম সান্ত্বনা খোঁজেন কবি :—"আজ আমি জানি দিয়েও যে হব ধনী—/ চোখের বদলে পাব চক্ষের মণি / দৃষ্টি চিরন্তনী।" ['বৈকালী']

সত্যেন্দ্রনাথের এই ঈশ্বরনির্ভরতা দৃষ্টিহীনতায় মিলটনের কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। দৃষ্টিক্ষীণতা প্রসঙ্গে এ জাতীয় চিন্তা তাঁর নানা কবিতায়ই এসেছে। 'কুহু ও কেকা'র 'আকিঞ্চন' কবিতায় মনের ও দেহের অন্ধতা একাকার হয়ে গেছে :—"...সামনে বিপদ চক্ষে নাহি দেখি, / দারুণ আঁধার নাই গো আমার সাথী ; / বাঁচাও তুমি বাঁচাও মোরে প্রভু ! / জাগাও প্রাণে তোমার অমল ভাতি।..." আবার 'ভিক্ষা' কবিতায় যখন বলেন—"জাগিয়ে রেখো একটি তারার আলো, / একটু দয়া রেখো আমার পরে—/ চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো / দু' চোখ যখন চোখের জলে ভরে..." তখন আমাদের মনে না হয়ে পারে না—এ শুধু তাঁর মনশ্চক্ষুর কথা নয়, চর্মচক্ষুরও বেদনা !

পারিবারিক জীবনের একটি মৃত্যু অন্ততঃ তাঁকে কয়েকটি কবিতা লিখতে যে প্রেরণা দিয়েছিল, একথা তাঁর আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের এক মামার ছোট মেয়ে পুষ্পমালার মৃত্যুতে তিনি তিনটি মর্মস্পর্শী কবিতা লেখেন। 'সংকারান্তে' কবিতায় তাঁর শোকনম্র আত্মসমর্পণ দেখা যায় ঈশ্বর নামক অস্তিত্বের কাছেই :—"রেখে এলাম একলা যাবার পথের মোড়ে ; / সেই কথাটি জানাই প্রভু ! কর জোড়ে ! / নেহাৎ শিশু, নয় সেয়ানা ! / অচেনা

তার বোলো আনা / তব যদি পায় নিয়ো তুলে অতল ক্রোড়ে, / প্রভু আমার ! একলা চলা পথের মোড়ে।" 'ছিন্ন মুকুল' কবিতায় আবার শুধুই শূন্যগৃহের হাহাকার :—"চলে গেছে একলা চুপে চুপে, / দিনের আলো গেছে আঁধার করে ; / যাবার বেলা টের পেলে না কেহ / পারলে না কেউ রাখতে তারে ধরে।" আবার 'ছায়াচ্ছন্না' কবিতায় "ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল ঘুমে নয়ন আলা / ঘুমাক আহা ঘুমাক তবে বালা" পড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠতম উত্তরসূরী নজরুলের "ঘুমিয়ে গেছে ক্লান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি" অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়।

এই মৃত্যু সত্যেন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও হানা দিয়েছিল খুবই অতর্কিত ভাবে। চারুচন্দ্রের বাড়ি জিরেট-বলাগড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এলে জ্বর হলো। কলকাতার বাড়িতে পৃষ্ঠ-ব্রণ রোগে তাঁর মৃত্যু হয় [১৯২২ সালের ২৫ জুন]—এর বেশি বিশেষ কিছুই তাঁর কোনো জীবনবৃত্তান্তে পাওয়া যায় না। আমাদের জানবার কোনো উপায় নেই জীবনরসিক এই কবি পার্থিব নয়নের নিভন্ত দ্যুতিতে কিরকম দেখেছিলেন মৃত্যু-স্বয়ংবরাকে ! আমরা জানতে পারি না, তিনি চোখ বুজবার আগে সন্তানহীনা তরুণী বধূ, সন্তান বিয়োগের শঙ্কাকুলা জননী—এঁদের কি বলেছিলেন। তিনি কি বলতে পেরেছিলেন, "আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে চলে যাই, ভাই, / জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ, দেখিবে সে নাই !" কল্পনা করতে সাধ হয়, তিনি হয়তো তাঁর অসংখ্য প্রিয়জন অনুরাগীদের উদ্দেশে বলেছিলেন :—"যেদিন আবার ফুটবে মুকুল, সেদিন আমায় দেখতে পাবে ; / ফাগুন হাওয়া বইবে ব্যাকুল, থাকব দূরে কোন হিসাবে !" কিংবা, হয়তো তাঁর চিরশরণ চির আরাধ্য পরম কোনো অস্তিত্বকে স্মরণ করে মুদিত নেত্রে বলেছিলেন :—"একটি তারার একটু শুভ্র আলো / জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে, / ফিরবে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো / ফিরতে যেদিন হবে নীরব রথে, / যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা ; / দয়া রেখ পিতা ! আমার পিতা !"

আকর সূত্র :—

আধুনিক বাংলা সাহিত্য / মোহিতলাল মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) / সুকুমার সেন
আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড) / সজনীকান্ত দাশ
যাঁদের দেখেছি (দ্বিতীয় পর্ব) / হেমেন্দ্রকুমার রায়
আমার কাল, আমার দেশ / সুধীরচন্দ্র সরকার
সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ / হরপ্রসাদ মিত্র (২য় সংস্করণ, ১৩৬৬)

সত্যেন্দ্র পরিচয় / চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯
সত্যেন্দ্রনাথের কথা / কালীচরণ মিত্র—ঐ
সত্যেন্দ্র স্মৃতি / অমল চন্দ্র হোম—ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৯
সত্যেন্দ্র কথা / মমতা ঘোষ—দেশ ৮ জুলাই ১৯৪৪
ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

ছাত্রজীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ / সৌরীন্দ্রমোহন মজুমদার, শারদীয় দেশ, ১৩৮৯

পূরবী মুখোপাধ্যায়, যোগব্রত চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, তুষার রায়, সুকোমল রায়চৌধুরী, সুব্রত চক্রবর্তী, কমলকুমার মজুমদার, আজ যাঁদের সঙ্গ খুব জরুরী ছিল। যাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলে কি কৌরব ৫০ ভাবা যেত। মরণশীল এই ছোট কাগজটির অমর বন্ধুদের শুভেচ্ছা পাব বলে বসে আছি।

বিনয় মজুমদার

সত্য কথোপকথন

আমি বললাম উর্মিলা, আমি মর্ত্যলোকে গেছলাম। গিয়ে দেখি এক মর্ত্যলোকবাসীর হাতে একখানা সাহিত্য পত্রিকা তাতে ছাপা 'অসুস্থ দেবদূত বিনয় মজুমদার'। দেখেই আমি আঁতকে উঠেছি—আরে আমাকে কেউ দূত করে মর্ত্যে পাঠাবার আগে মর্ত্যে যাবার কথা বলেছি। আমি ভেবেছিলাম যে আমি নিজের ইচ্ছায় গেছি। যা ছোট এতদিন পরে জানালো। তবে মর্ত্যলোকে গিয়ে খুব লেখাপড়া শিখিয়েছি তাদের। বীজগণিতের ল. সা. গু. শিখিয়েছি। বীজগণিতের ল সা. গু. এই চারটি আলাদা সংখ্যা নিই

$$a \quad ma+\Delta a \quad nb+\Delta b \quad b$$

a যে কোনো সংখ্যা কিম্বা ৮ কিম্বা ১৬ আর Δa যে কোনো সংখ্যা ২ কিম্বা ৭ যা খুশি। bও তাই যা খুশি সংখ্যা এবং Δbও যা খুশি সংখ্যা। mও যে কোনো সংখ্যা। যে কোনো মানেই যা খুশি। n যা খুশি সংখ্যা। তা হলে উপরের চারটি আলাদা সংখ্যার ল. সা. গু. হচ্ছে

$$a \times \Delta a \times \Delta b \times b$$

এটা হচ্ছে বীজগণিতের ল. সা. গু. মানে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কবিনয়। আরো শিখিয়েছি। বাঁ দিকে ডান দিকে যোগ, বাঁ দিক থেকে ডান দিক যোগ বিয়োগ, গুণ, ভাগ। মনে মনে মাঝারি আকারের দুটি সংখ্যাকে গুণ করার কায়দা, হাতে কাগজ কলম না দিয়ে। জ্যামিতি দিয়ে ল. সা. গু. বার করার কায়দা।

যে কোন $\dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-p \lfloor n-q}$ n তো যা খুশি

খুশি সংখ্যা $\dfrac{n}{p}$ এবং $\dfrac{o}{q}$

$o \qquad n$

উপরের $\dfrac{\lfloor n}{\lfloor n-p \lfloor n-q}$ সংখ্যাটি যে কোনো সীমিত 'চস'-এ দ্বিপার্শ্বিক

সমাকরণ সহগ। উদাহরণ স্যার আইজাক নিউটন কর্তৃক প্রবর্তিত বাইনোমিয়াল থিওরেম $(a+b)^n$। এই দ্বিপার্শ্বিক সমাকরণ আমি একমাত্র হালদার বিকাশকে বলেছি মর্ত্যলোকে যে আছে আমারি 'রাষ্ট্রপতি হইবার সহজ উপায়' গল্পে।

মর্ত্যলোকে আশ্চর্য সব নাম। গোপাল আসলে অতি ধনী ব্যক্তি দালান আছে গোটা চারেক। আমি বললাম ''গোপাল বাড়িতে তুমি গরু পোষো?' গোপাল বলল 'হ্যাঁ দাদা'। আমি বললাম 'গো পালয়তি য স'। উপরে যে বিকাশের কথা লিখেছি সে এখন থাকে 'চিকণপাড়া' গ্রামে—শুনে আমি বললাম 'তা হলে তো বিকাশ, চিকণপাড়ায় বেতগাছ আছে, ঝাউগাছ আছে, বাঁশগাছ আছে। বিকাশ বলল 'হ্যাঁ আছে।' আমি বললাম চিকণপাড়ায় চিকণ সব।

ও, আমার এই হাসির গল্প আরেকটু বাড়াই। আশুতোষ সেনকে বললাম 'এখন আপনার মনে আশুবাবু পরমেশ, আল্লা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবের কথা কি মনে আসে?' 'না তো' বললেন আশুবাবু। আমি বললাম 'আশুবাবু, কারণ আপনি গুণ করার পদ্ধতি ভাবেন নিজের চিন্তার অংশ। এমন কি আপনার বৌএর কথাও মনে কম পড়ে।'

কারণ আপনি নূতন পদ্ধতি গুণের আবিষ্কার করেছেন! আশুতোষবাবু বললেন 'ঠিক'। আমি বললাম 'দেখেছেন মজা মশায়'।

আমি গুণ করার কায়দা সাতটি নতুন বঙ্গে এসেছি মর্ত্যলোকে

গুণ—৫১৭-কে সাতটি আলাদা পথে করার পদ্ধতি শিখিয়েছি।

বললাম 'জীবন, গুণ্ডা শব্দের মানে জানো?' জীবন বলল 'কী রকম?' আমি বললাম ফরিদপুরে বলে গায়ছাড়া তেমনি গুণডা। অর্থাৎ গুণডা হওয়া ভালো বুঝতে হচ্ছে। বহু গুণ আছে আমার সুতরাং আমি গুণ্ডা।

———

ভাং—১০/১২/৮৬, সময় সন্ধ্যা—৫/৩০টা। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে (এজরা) চিকিৎসাধীন সময়ে রচিত।

সুবিমল বসাক

ক্যাজুয়াল লিভ

ঘুম ভেঙেছে সেই কোন সকালে। আমার খোলা বুকে মাথা রেখে শম্পা শুয়ে, বেশ তার খাটমর ছড়ানো, শরীর আড়াআড়ি, ডান হাতের আঙুলের নখে আলগোছে আমার বুকের রোমশ মাছিতে বিলি কাটে। ওর মাখন বুকের তিরতির কাঁপুনি আমায় সতর্ক করে। আমার ডান হাতের পাঞ্জা ওর মসৃণ নিতম্বে, মূলাধারের কাছে ক্রমশঃ ওঠানামা। বিশাল ইংলিশ খাটের দু-পাশ দিয়ে বিচ্ছুরিত নীল আলো, একটু ফিকে, ছড়িয়ে পড়েছে পা থেকে মাথায়। শম্পা চোখ বুজে আছে আবেশে, যতই ডাকি উঁ—আঁ—আরও দু-হাতে জড়ায়। খাটের ডান পাশে ড্রেসিং টেবিলে লাগোয়া বড় আয়নায় চোখ পড়ে। ত্রি-ফোল্ড ডায়রীর মত, তিনটে আয়না—একই ভঙ্গির তিনটি আলাদা দৃশ্য রূপ। শম্পার জেদে ও আগ্রহে এই আয়না প্রাপ্তি। ও যে কত দূরদর্শিনী, বিয়ের যৌতুকে পাওয়া জিনিষ দেখলে বোঝা যায়। ঐ লম্বা আয়না, খাটের পাশে দাঁড়ানো—বিছানার ভাঁজটুকুও নিখুঁত। আর এই ইংলিশ কট—ডাবল বেড, দু-ধারে পেগ টেবিল, গর্ভে প্রশস্ত জায়গা, বালিশ চাদর মশারী সহজে রাখা চলে। সবচেয়ে বিস্ময়কর—দু ধারে পায়ের কাছে নীলাভ আলো, রাত যত গভীর আলোর বিচ্ছুরণ ততই প্রখর। সত্যি, তারিফ না করে যায় না, বছর পাঁচেকের ছোট শম্পা, অথচ কত দূরদৃষ্টি। জামাইবাবু, খুড়তুতো-মাসতুতো দাদা, বান্ধবী, বান্ধবীর বর—কত উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক,—টাক্ খাবার মেয়ে নয় সে।

আয়নার ওপারে শম্পার ছড়ানো শরীর ভঙ্গি সামান্য পাল্টানো, ম্যাক্সী থেকে বেরিয়ে এসেছে উরু-যুগল। সাদা চামড়ায় নীল আলোর পালিশ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আরেকটু লম্বা হলে মানানসই হতো সব ব্যাপারে।

ছোট মামা ক্যাজুয়ালি বলেছিল, শর্ট ফিগার। আরো ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হলে মানানসই হতো। তা, শম্পার জ্যাঠা বেশ মেজাজী গলায় বলেছিল, বেশ তো, দু-ইঞ্চির জন্য আরো দু' ভরি।

ছোটমামাও মেজাজী ভঙ্গিতে রাজী হয়েছিল, বরং ব্ল্যাক হোয়াইট থেকে কালার। সঙ্গে রিমোট কনট্রোল।

ড্রেসিং টেবিল আর বুক-কেসের মাঝখানে রাখা হয়েছে টিভি। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই দেখা যায়, হাতের কাছে থাকে রিমোট। কাল ছবি শেষ হয়েছে রাত দেড়টায়, শুতে শুতে আরও পনরো মিনিট। গত রাতের ছবির দৃশ্য মনে করতে করতে এক সময় আমি শম্পাকে আকর্ষণ করি, শম্পা হামাগুড়ি বেয়ে উঠে আসছিল, এমন সময় পাশের বাড়ির রেডিয়ো তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

একি? পৌনে আটটা বাজে। কুমুর-মা আসেনি? সরো-সরো। শম্পা তড়াক করে বিজনের বুক থেকে নেমে পড়ে, চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা। চোখের আবেশ খান্ খান্ করে ভেঙ্গে সরে পড়ে দূরে। আমি দ্রুত উঠে বসি, ম্যাক্সী পরিহিতা শম্পাকে অস্থির ও বিচলিত মনে হয়, পেছন ফিরে দাঁড়ালে তাকে কমবয়সী স্কুল গার্ল বলে ভ্রম হয়।

রোজ ঠিক সকাল সাতটায় কুমুর-মা অবধারিত এসে পড়ে, এসে দরজায় কড়া নাড়ে, শম্পা তখন খোয়ারি ভেঙ্গে উঠে পড়ে। কোনদিন ব্যতিক্রম হয়নি। বস্তুতঃ কুমুর-মা'র এই নিয়মানুবর্তিতা আমাকে মাঝে মাঝে বিস্মিত ও শ্রদ্ধালু করে তোলে। আমি নিজেও কোনদিন দপ্তরে সময়মত হাজির হতে পারিনি। অথচ কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা—কুমুর-মা'র একেবারে ঘড়ির কাঁটা। ছ'টায় ট্রেনে চেপে সাতটায় এখানে এসে নামে। সাত বাড়ির দু-বেলা বাসন কোসন মেজে, ঘর মুছে, উনুন সাজিয়ে সাড়ে চারটের ট্রেনে ফিরে যায়। তাহলে কি আজ আসবে না?

শম্পা ঘর-বার করে। বার-ঘর করে। আপন মনে বক্ বক্ করে—আগে থেকে বলে গেলেই হয়, রাতে অত থালা-বাসন বার করতুম না। অপরিপূর্ণ ঘুমের অতৃপ্তিতে মেজাজ আরও খিঁচড়ে।

হয়তো শরীর-টরীর খারাপ হয়েছে।

থামো ত। শম্পা ধমকে দেয়, আমাকেও সহ্য করতে পারে না। ওদের শরীর অত সহজে খারাপ হয় না।

বুঝতে পারি ভয়ানক চটে গেছে, আমি আর কথা বাড়াই না। সত্যি ওদের শরীর বুঝি সহজে কাৎ হয় না। নইলে, সেই পায়রাডাঙ্গা না কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নেমে আরও মাইল দুই হাঁটা পথ। শীতকালে রাস্তায় কুকুরের আনন্দোৎসব, হাতে একটা বেত নিয়ে সকাল পাঁচটায় বেরোতে হয়।

শম্পার তিরিক্ষের কারণ, এখন নিজে হাতে বাসন মাজা, ঝাঁট দেয়া, ঘর মোছা, জল তোলা। বিজন বড়জোর গামছা পরে, জানালা বন্ধ করে ঝাঁট দিয়ে

ঘর মুছতে পারে। বাসন মাজা? কুয়োতলা যে একেবারে হাট।

পুজোর আগে তো এমন কামাই করে না। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু হয়েছে। তুমি অমন করছো কেন? একদিনের ক্যাজুয়াল লিভও নিতে পারে।

বাজে বকো না তো, ঐ ভেবে বসে থাকলে তো চলবে না। আজ আমার অফিসে তাড়াতাড়ি যাবার কথা। জরুরী রিপোর্ট দিতে হবে, আর আজই কিনা—

ম্যাক্সীর ওপর কোন রকম শাড়ি জড়িয়ে নেয়, আঁচল টেনে নেয় বুক ওব্দি, অন্তর্বাস নেই, হাওয়াই গলিয়ে বেরিয়ে পড়ে—একটু আসছি।

আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবি। অভ্যেস—অভ্যেস গড়ে উঠেছে। বাসন মাজা, ঝাঁট দেয়া, ঘর মোছা—টুকিটাকি। চর্চর করছে ফোঁটা। ন'টায় কিচেনে ঢোকে শম্পা, রান্না, স্নান, ড্রেস, মেকআপ—একেবারে যুদ্ধ।

একটু পরে ফিরে আসে, হাসি মুখে। বড়ুয়াদের বাড়ি গোসলুম, ওদের ঝি বললো—এসেছে কুমুর-মা। চোখ-মুখ আবার সতেজ হয়ে ওঠে। গ্যাসে চা করে এনে তাড়া দেয়, বাজারে যাও।

বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি কুমুর-মা'র বাসন মাজা-ধোয়া শেষ, মেজে মুছে তকতকে, শম্পা নিজে দাঁড়িয়ে করে নিয়েছে। প্যাসেজের ছোট্ট জায়গায় বসে গেলাসের চা-য়ে পাউরুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে। ওর জন্য আলাদা কোয়ালিটির চা আনে শম্পা, কম দামের, চিনি দুধ হলেই হলো। কুমুর মা'র গলা শোনা যায়—মাসী, একটা ভালো পরিবার দেখে দিও—খাওয়া দাওয়া। বেশী লোকজন যেন না হয়, ছোট মেয়ে পেয়ে খুব খাটায়। জলটুকুও গড়িয়ে খেতে চায় না। একটু ভালো যেন হয়। যে বাড়িতে দিয়েছিলাম—স্বামী-স্ত্রী—তেমন ঝামেলা নেই, তবে যা কাণ্ড—রাতে মেজের ওপর শুতো, একই ঘরে খাটের ওপর স্বামী-স্ত্রী, যা কাণ্ড—মেয়ের মুখ থেকে শুনে আমার গতরে কাঁটা দেয়—আট বছরের কুমু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আঠারো হয়ে যাবে যে—এক সঙ্গে দুজনে দরজা বন্ধ করে চান করে—কি করো মাসী—

কুমুর-মা চলে যেতে শম্পা জিজ্ঞেস করে, তোমাদের নিখিল বাবু লোকটা কেমন গো?

কেন কি হলো?

বৌ-কে কাল বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ সকালে কাজে আসতে বারণ করে দিয়েছে। গত মাসে বর্ষায় আসতে পারেনি বলে তিনদিনের মাইনে

কেটে রেখেছিল। কুমুর মা বললো, আর ন' দিন বাদে পুজো। টানা ন' মাস কাজ করেছে, পৌষ মাস থেকে। পুজোয় কাপড় আর দেবে না।

চেয়েছিল ?

চায়নি আবার ! মনে মনে হিসেব করে রেখেছিল, ছাপা শাড়ি পেলে বড় মেয়েকে দেবে। বিয়ের পর আর দেয়নি। তা নিখিলবাবুর বৌ তো নেই বাপের বাড়ি গিয়েছে, বললে—আমি তো সে সব জানি না—কেমন সব মানুষ—

নিখিল রায় অফিস অ্যাসোসিয়েশনের লোক, এক্সিকিউটিব বডি'তে আছে। পোষ্টিং সবসময় ঘুষের জায়গাটিতে। অফিসাররাও কিছু বলতে সাহস করে না, করলে, পেছনে লেগে তাকে সরে যেতে হয়। এমনিতে খিসতি বলতে ওস্তাদ, কিন্তু মেটমিটিং-এ ওর গলার স্বর ভারি ও গমগম করে ওঠে। ওকে 'যন্তর বিশেষ'ও বলে অনেকে, কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ। লেটে এলেও দাগ পড়ে না।

আধঘণ্টায় রান্না শেষ করে, ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, মাখন সব টেবিলে সাজিয়ে রেখে শম্পা বাথরুমে ঢোকে। মগের জলের শব্দ, সাবানের গন্ধ, সেই সঙ্গে শম্পার গলায় গুণগুণ কলি। একটু বাদে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢোকে, পিঠ খোলা, সায়ার দড়ি দাঁতে চাপা—আমার মাথা ভোঁ ভোঁ। দু হাতে কোমর ধরে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় ওকে বিছানায় এনে ফেলি। হতচকিত শম্পা, আরে আরে কি হচ্ছে এই ছাড়ো ছাড়ো বলছি। বুকের তলায় ওকে চেপে হাতবাড়িয়ে জানালার পর্দা টেনে দিই।

শম্পা শুয়ে থাকে সুখ-ক্লান্তিতে, শরীরে পরিপূর্ণ তৃপ্ততার তাপ। তার পিঠময় হাত বুলোতে-বুলোতে স্বেদ ও জল শুষে নিই। বুকের মাঝে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলি—এই, অফিস যাবে না !

উঃ, নাহ্। আবেশে গলার স্বর সিক্ত, দুহাতে জড়িয়ে ধরে।

তোমার না জরুরী রিপোর্ট দেয়ার কথা ?

কাল দিলেই চলবে।

কিছু ক্ষতি হবে না তো।

সি.এল. এর অ্যাপলিকেশন দিলেই হলো। দুপুরে আণ্ডার সার্টিফিকেট অফ পোষ্টিং করে দিও—

শম্পা আরও কাছে টেনে ধরে। আমরা বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ি।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

জবানমুক্তি : দারিদ্র্যরেখার নিচে

(নিচে একটি উপন্যাসের খসড়া, উপন্যাস একটি জীবনের খসড়া)

□ ওভারল্যাপ

হারাধনের এখন ঠিক ক' ছেলে আমি জানিনা। হারাধন যে এতোদিনে বিবাহিত বোনেছে তা নিশ্চয় কোরে বলা যায় এমন তো নয় বরং আধা গ্যালো হয়তো সে বিবাহউত্তরে নিরিবিলি বছর পার কোরতে ভালবাসে কিংবা এখনো বিয়ে চেনেনি তবুও ভবিষ্যতে যদির কথা বিবেচিত হোলে সে 'আমার—ছেলে', এভাবে কাউকে পরিচয় দেবে কিনা আর দিলে এই শূন্যস্থানে কোন্ সংখ্যাটা সম্ভাব্য হবে এসব আদৌ আমি জানিনা, বাস্তবিক জানার কথাও নয়। কেননা বোঝাপড়া ছিলো তার সাথে আমার সেই স্কুল সময়কার। ক্লাস ঝাপটে বেরিয়ে পড়ে মাঠেই বোঝাপড়াটা আমাদের গতিময় হোয়ে উঠতো প্রখর জ্যামিতিবোধে, ব্যাক থেকে ওপ্রান্তে উঠে গিয়ে দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড হারাধনের সাথে বল দেওয়া-নেওয়ায় লাট খেয়ে যেতো বিপক্ষ দুর্গ, মাঝে মাঝেই বোঝাপড়ার ফসল উঠে আসতো শানানো স্কোরে। হারাধন এখন আমার যোগাযোগে নেই। বলে পা ছোঁয়ানোর বয়স সোয়ার্ডে পার হোয়ে গ্যাছে। অথচ এখনো বাকী রয়ে গ্যাছে হারাধনের সাথে আমাদের নিখুঁত বোঝাপড়া, পেনাল্টিবক্সের ভিড়ে মাঝে মাঝেই আমি হারাধনের মাপা থ্রু পেয়ে আর সেই পুরোনো দিনের ধরনে কোমর মোচড়ে ঠিক অব্যর্থ অনিবার্য লাথিতে "লেনিন আমিই"-বুকে স্পন্দিত লেনিন হোয়ে উঠি।

এসব, সেদিনকার যৌথ বোঝাপড়ার হারাধনের অর্ধেক আর আমার অর্ধেক, আমি নিজে, নিজের পাছা ও শিরদাঁড়ায় স্থির থেকে টের পাই, এখনো সম্পূর্ণ। হারাধন একদা ছিলো। নেই এখন। 'রইল বাকী' তবে একের দুই যুক্ত একের দুই।

আসলে হারাধন কোনো না-ব্যাপার, যা নিয়ে সাম্প্রতিক যোগেন যে বিব্রতবোধ করে, তা অই 'রইল বাকী' নিয়েই তো !

□ দারিদ্র্যরেখার নিচে যোগেন : a bone symphony

সে দরিদ্র নয়
বরং এতোদূর জেনে সে কখনো কোনোভাবে বোঝেনি
আপনার মাথাপিছু দারিদ্রে কতোদূর ছন্নভন্ন হোয়ে
থাকে শুক্রবারের দীপ অথচ
এক দরিদ্র এই চাহিদায় সে
শান্ত হয়তোবা স্থিতিস্থাপক ।

যোগেন স্থাণু। আবাদযোগ্য যাবতীয় পতিত তার সামনে। টাঁড়, চারণযোগ্য যা কিছু, নীচ সেচের জমি, খারিফ মরশুম—নিবিড় চাষ প্রকল্পের সামনে সে। যে হাওয়া তাতে রবার বাগিচার ক্ষত ঝরে আসছে, রবি মরশুম তার পারিশ্রমিক পেয়ে গ্যাছে—মেস্তা, শন, কার্পাস, ওট, আলফালফা। এখন কোথাকার বুনো আকর্ষ তাকে জড়িয়ে, পিষে ওপরে উঠতে চায়, মাথা নীচু কোরে যোগেন ভাখে। ইক্ষুকণার ক্ষয় গলে পড়ে ঠোঁটে। ঘ্রাণের অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা এলাচ। সে অনুসরণ করে।

॥ ফার্স্ট সিম্ফনী ॥

ভিশানে ডিটেলস্ না এনে এভাবে বাক্য নির্মাণ, যোগেনের ব্যাপারে একেবারে আকস্মিক বলা চলে না। বরাবরই টেলিগ্রামের ধরনে যোগেন লিখে থাকে। ছোটো ছোটো বাক্যে—কর্তা : কর্ম : ক্রিয়া (sov) প্যাটার্ন একবারো ঠিক রেখেছে এতোদূর বাহুল্য অবধি খুঁজে পাওয়া যাবে না, নানা কোণে লেখা (কেবল) পোষ্টকার্ড আর ডায়েরীর চালু না থাকা পাতায় ? যেনো সত্যিই শব্দ বেড়ে গ্যালে টেলিমাশুলের সাড়ে তিনটাকা থেকে লম্বা লাফ কিংবা সে তার মিনিট তারিখ নিয়ে মহা মজে আছে। অথচ ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে তার মজে ওঠা সময় নিয়ে যোগেন ব্যস্ত না হোলেও মজেই তো থাকতো। কতোবার তাকে

বলা হোয়েছে : যোগেন তোকে দেখলেই মনে পড়ে, 'আমের ক্ষেতে স্থান-কাল অর্থহীন'। প্রথম দিকে সে হেসে উঠেছে—কেনো, আমি চিকো কালো কাক্কী/ সোনারোদে আম কাটি মুঠি মুঠি। বস্তুতঃ এসব যখোন সে হাসির পরিপূরকে রাখতো, সেসব সৈনিক অবস্থান তখোন সদ্য জীয়ানো অতীত, মাঝে মধ্যেই কথার ফাঁকে ন'ড়ে উঠতো, ন'ড়ে উঠতো গামলার জলে খলবল কোরে আধপোষা জীয়ল মাছের ধরন। বনবাদারে-গাঁ-গেরামে 'কমিউনিস্ট রেভ্যালিউশনারি' (সত্তর দশক গ্যালে, 'নকশাল' বিশেষণ তাঁদের পছন্দ নয়, বরং বিশেষণের বিশেষণে কি বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া আসে ?) হোয়ে দাপিয়ে ওঠার কালে সে আঁ-আঁ-আড় কোরে উঠেছিলো কিনা কিংবা পরে বছর কয়েক কেন্দ্রীকতা বনাম গণতন্ত্র নাকি সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু ব্যাপারে মগজ ঘুলিয়ে উঠে সে বুকে রেলিং চেপে পার্টিকার্ড (নং ৯৭২৫) ব্রীজের তলায় জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলো কিনা, তেমন কোনো প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি, আজো। তখোন যোগেনের সময়কে প্রসঙ্গ কোরে ওঠা যায়নি, বরং সেসময় স্যাভেজ ব্লেড, ব্লেডের ধার, তাতে ঘোড়ার প্রতিচ্ছায়া আবার নামটা স্যাভেজ এবং এযাবৎ ছিপাটান যোগেনকে আমরা একই সঙ্গে মিলিয়ে উঠতে পারতাম না। সহজাত জব্দ জাপটে ধরতো প্রশ্নে। পরে বুঝেছি, হ্যাঁ স্যাভেজই তো।

বলা চলে যখোন থেকে সে আর ৯৭২৫ নয়, ঠিক সে সময়, যোগেনের মাথার ভেতরে সময় পাখা ঝাপটাচ্ছে, যে পরে আলসেতে ঝুপ কোরে ব'সে পড়ে।

দিন আসবে। যোগেন অপেক্ষা পোহায়। তার দলিলের জবাবী উচ্চতর কমিটির বৌদ্ধিক প্রস্তাব, আহ্ কবে যে ? সময় তখনি তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে বোলেছিলো 'রে নিষাদ', শোনেনি কি ? শুধু তাই কেনো, সেই ক্ষিপ্র না-স্থির যোগেনের মগজে গুঁজে দিয়েছিলো একটা গোটা বছর তারে মেলে দেওয়া ফকফকে হাওয়ায় সাদা ফতুয়া যেমন। রাস্তাঘাটে যোগেনের সাথে উচ্চতরদের আখা হয় বটে তবে তা ম্যানডেট শ্রবণের জন্যও বৈকী, হাসির শ্রবণের অন্ধ ঘুঁজিতে মুখ গুঁজে রাখা ঐ গোটা বছর, বেপথু যোগেন ও পথিকদের আড়াআড়ি ক্রমে পর্যটনময় হোয়ে উঠলে যোগেনের মনে পড়ে নকশালবাড়ী নিয়ে দ্বিতীয়-ধারার গল্প, তাতে ততো প্রথমধারার মতো আতস অদৃশ্য। (১ম ধারায় নকশাল সন্দেহে পুলিসের গুলি) আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে ফিরে এলে তখনো যোগেনের দিন-গোনার পালা। বাঘ আসবে কাগজের। তারো সাথে কিছু বোঝাপড়া থাকে

হাজতে-ইনটারোগেশানে। প্রথমে দিন গ্যালে কিছু রহস্য গ'ড়ে ওঠে, রাস্তাঘাটে আই.বি. তাকে স্নেহদৃষ্টিতে রাখলেও কাগজের বাঘ আর আসে না। অথচ ঘটনাটা, মানে ধারণাটা, মানে ধারণাটা ঠাকুমার মিথের মতোই রক্তে গেঁথে আছে, তবু বন থেকে না হোক্ থানা থেকেও বাঘ আসে না, ক্রমে ব্যাপারটা বিরক্তির পর্যায়ে পৌছালে সে অচেনা ও.সি.র উদ্দেশে, সকালে দরজার খিল খুলে, চিৎকার কোরে ওঠে প্রায়: ওহ্, আপনারা এতো দেরী করেন, কেনো বোলুনতো? কে জানতো জবাবটা ঐ কাগুজে বাঘ নয়, পরে, বছরখানেকে ঘুরে আসবে তারই সংঘকোণ থেকে, একইভাবে।

তা আমি যে কথা বোলছিলাম, এই সময়েই যোগেন শ্যাখে তার অপেক্ষাগুলি অনেক কপালের তলায় প্রাচীন শীতে শুষ্ক গন্ধকের মতো র'য়ে গ্যাছে। অপেক্ষাগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে এরপরেই যোগেনের সময় মজে ওঠে, বছর কাটতে থাকলে আমাদের সাথে শ্যাখা হোলে এখন কেউ যদি বলে: যোগেন, আমের ক্ষেতে স্থান-কাল অর্থহীন। যোগেন আর হাসেনা, আবহমান হোয়ে বোলে ওঠে: কেনো, বেশ আছি। এর আগেবধি যোগেনের সময়কে প্রসঙ্গ কোরে ওঠা যেতো না, তবে আজ যাচ্ছে। অবশ্য মিনিট-তারিখ নিয়ে হামলে পড়া আমাদের—সকাল: সুপারস্রেশ+আবহবার্তা, সাড়ে সাতটার খবর+পেচ্ছাপপায়খানা, আটটায় সেভিং+মালহোত্রা এনড্ পামোলিভকা জবাব নেহি, অরণ্যদেব+খেলারপাতার সাহিত্যপনা, রবীন্দ্রগীত+টাটাসোপ+স্নান, ভাতথাওয়া+পরবর্তী রিজেন্ট কিং; দুপুর: হাজিরা+ক্যামুয়াল গিভ, কাইল+নিক কার্টার If I am wrong I apologize……ক্রমশ: ফলোআন: যেভাবে স্থান-কাল-অর্থময় সময় পিত্তলের দাঁড়ে বোসে পাখা ঝাপটে ওঠে, তাতে যোগেনের সময় নিয়ে প্যাথলজি চলে নাকি। বরং আমাদের নাগাল থাক, যোগেনের সময় ঝুপ কোরে আলসেতে বসবার কালে যে ধুলো ন'ড়ে ওঠে—সেটুকু। কেননা সিম্ফনী সেই শুরু হোলো। প্রথমে বোলেইছি তো—'মাথা নীচু কোরে যোগেন শ্যাখে'।

॥ সেকেণ্ড সিম্ফনী ॥

যোগেন কি নিজে ঐ ন'ড়ে ওঠাটুকু দেখেছিলো?

প্রতিটি প্রশ্নই এক ধরনের অনুরোধ। কেননা যে অনুমান বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই যুগল অভিজ্ঞতার অংশ, সেবিষয়ে জানার জন্যই বক্তা প্রশ্ন কোরে থাকে,

অর্থাৎ সেই অনুমানকে নিজেরা অভিজ্ঞতায় তুলে নিতে চায়। তবে অনুরোধটা ছিলো আমার নিজেরই দিকে, যোগেনকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

তখোনো 'ওল্ড ম্যান এনড্ দ্য সী' পড়েনি যোগেন (তবে কারো মুখে গল্পটা শুনে থাকবে)। একবার হাওয়াই চটি কিনে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঝুপসি শোকেসে আট টাকায় হেলে র'য়েছে, বাংলায়, দেখেছিলো সে এই ভেবে, তবে কোনো একদিন এসে নিয়ে গেলেই হবে। কোনো একদিন এসে তার নিয়ে যাওয়ার আগে অগাস্টের এক বিরোধহীন পাঁচ তারিখ এসে পড়ে। সেরকম ধারাবাহিকতা যোগেনের দিনগুলির মধ্যে তখোন আর ছিলো না। মিনিট তারিখ নিয়ে তখোন পক্ষপাতহীন যোগেনের দিনকাল ধারাবাহিক না হোয়েও অনন্ত কিংবা অনন্ত হোতে গিয়ে ঐ ক্রমশঃ। এরকম পাঁচই আগস্টে সেও ক্রমশঃ হয়, হোতো থাকে।

খানিকটা বৃষ্টি হোয়ে যাওয়ায় রাস্তায় জল এখানে ওখানে। জলছাপ রেখে গ্যাছে ম্যাজিক ধারাবাহিকতায় লোডেড ট্রাক আর টায়ারটেরাকোটায় চোখ যতোদূরে। কতো দূরেই বা আর? যেতে যেতে মাঝে মাঝে আয়েশে চোখ চ'লে যায় বাড়ীর পথে মেয়েদের হষ্টেলের গেটে, হয়তো চেনা কেউ, তাহ'লে 'হাই বেবি।' কেন না 'সুভগে' কিংবা 'কি রকম' দুইই অশ্লীল শোনায়, নয়তো কেউ না থাকলে সে একাই প্রায়—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি/···ওমা হাসি হাসি পরবো ফাঁসি/দেখবে ভারতবাসী—সন্ত্রাসবাদের স্বপক্ষে একমাত্র গান গাইতে গাইতে বাড়ীর দরজায় পৌঁছে যেতে পারে। 'আরেক পয়সা পেলে চলে যাবো' দৃষ্টি মেলে সেদিনও চাইলে বাস্তবিক পেয়ে যায়—আমাকে এক লাইন অ্যাজ। যোগেন লক্ষ্য করে, উঠোন নয় কাঁচা খড় রঙ ঘাসের লন ভিজে র'য়েছে কিছু আগের ঝাপটায়। যেখানে ঘাস নেই তাই জিইয়ে র'য়েছে নিবারণহীন জল, তাতে পা মাজছে যে, মাথা ও বোধের সবটুকু আচ্ছন্ন কোরে, তাতে যোগেন নিজে, তার শিরদাঁড়া ও পাছার স্থির হোয়ে পড়ে, কিছুটা কাঁপনও—উপলক্ষে কেঁপে ওঠা ফিলামেণ্ট। নাহ্ পা মাজেনিতো ও, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ভেজা মাটি (মাটি নয় বালিই বলা যায়) ঘষটাচ্ছে। মাথা নীচু, নবমতম নাকি দশম জন্মদিনের ফ্রক পরে, খালি পা, দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা পোহাতে ভালোবাসে বোলে। এভাবে জলে উঠবার আগে নিভৃত গীটারের তারের মতো

র'য়ে যাওয়ায়, পিছনের বৃষ্টিভেজা হস্টেলের ঘোতলার লেবু হলুদ, পিছনে হুহু করা ফ্যাকাশেতে কাতরে ওঠা স্কাইলাইন, সবই ম্লান হোতে থাকে। তাহ'লে নিজেকে নিয়ে অনার্য ত্বকের ঐ অম্লান মেয়েটি যে দাঁড়িয়ে, যে মুদ্রায়, তাতে ও কি জানে না নোখের টোকায় যে কোনো মুহূর্তেই । যে আসবে, তাকে চেনে যোগেন। কতোবার দিখিদিকে দেখেছে দু'জনকে একত্রে হলগোডমর, রিক্সায়-রাস্তায় মেলায়-সিনেমা হলে আর তাতে স্পষ্ট হোয়ে আসে এই নগ্নতা ; ভগবান বুদ্ধের গুমফায় প্রস্তর ভিক্ষুণী। অল্প বেশে, অল্প হোয়ে, অল্প নয় এমনই অপেক্ষা যে, সে এসে পাঠ কোরবে তবে—'প্রথম কদমফুল ফুটেছে আ-যোনি।' রিলিফের পোশাকে সে আসবে দেখবে জল বিপদসীমার গেজ অতিক্রমপ্রয়াসী ছোবলে কেঁপে উঠছে, তখোন দাঁতে দাঁতে ঘ্রাণ চিৎকার (কি কোরে ছাড়াবি মোর মুষ্টি, যতোক্ষণ চিনি নাই তোরে) ঘুংবে ফিরবে। বনের বাঘ জানে না অথচ বাঘেরই জন্য উৎসর্গীকৃত আড়াল ছুঁড়ে ফ্যালা গৃহপালিত জানে সে কেনো মাথা দোলাচ্ছে, অন্তঃস্থলের লনে, ইউনিয়ন ব্যানার নয় পুরুষ্টু পায়ের পাতা উঁচু বাতাসে পতপত কোরে ওঠে, আ অই যে পোষ্য নিজেকে মেলে রাখে অবিনশ্বর। আবহমান। পিছনে সূর্য ঘুরায়ে চ'লেছে।

ফাঁকা হাঁদা রাস্তায় টায়ারের জলছাপ সিঁধি···স্মৃতিতে ফিরে আসে সে গীর্জা থেকে, ফিরে আসে আরো কোনকিছু নষ্ট বর্গে যা···হাঁটতে থাকলে ভেতরে, অন্ধকারের ধুলো ঘরে, ধুলোর সিক্ত, সাদা রিবন কাঁপতে থাকে···লুকোনো হোঁচটে রাস্তায় পড়ে যাই, পড়ে চুরমার হই না আর যখোন উঠি, হাঁটু ও কনুইতে কয়েকটা পাঁশাশ ক্ষত জেগে আছে···তারা পুরোনো হয় আবার···। খাঁচার একধারে চ'লে এলে পায়চারি করা চিতা দিকপরিবর্তন কোরে থাকে। এই রাতের ঘুমে টলে উঠে যোগেন অন্তপাশ ঘোরে।

কখনো কার্ফুর্ডা আকাশ, হয়তো কখনো তা উথলিয়ে প্রমত্ত সমুদ্র ঢেউ-সংখ্যক। একা নৌকায় বৃদ্ধ জেলের উচ্ছিত জীবন। অন্নের নামে ঐ মাছটিকে ভেকে চলে সানতিয়াগো। ক্রমে দিন যায়, দিন আসেও। অনেক নীরক্ত পাড়ির এযাবৎ উত্তরাধিকার এসে মাছটিকে থামিয়ে রাখে। পিছনে টানে আকাংখায় র'য়ে যাওয়া আমিষাশী বড়শির প্রাণ। বিস্ময়ে ভাখে ঐ তো শিকারী, পিছনে অন্তঃস্রোতীর সূর্য, পরে ভয়ে পেয়ে ভাখে—শিকার। ক্রমে আনন্দে বোঝে সে নিজেকে মেলে দিয়েছে রক্তের প্রভাবে। ঢেউসংখ্যক সমুদ্র হয়তো কখনো

মেলে গিয়ে কাচুঁরড়া আকাশ। তার তলায় ঐ আবহমান অপেক্ষাবতী। তার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথা নীচু কোরে মাটি খুঁটতে থাকা ঐ সোনা যুবতীর প্রাক্‌সামরিকী।

এরপর কোনো একদিন এসে 'গুড ম্যান এনড্‌ গু সী' আর নিয়ে গিয়ে পড়া হোয়ে ওঠেনি যোগেনের।

সপ্তাহে যোগেনের সাকুল্যে একম্‌-অদ্বিতীয়ম রোববার আর বাকীগুলি না রোববার ছিলো এমন নয় কিন্তু স্থাথা গেছিলো রোববার বরং হোয়ে উঠছিলো না রোববার আর অন্য ছয় না-রোববারগুলির মধ্যে ধরা যাক যেমন বেস্পতি কখনো মঙ্গলে ঢুকে পড়ছিলো হিস্পানী, ফলে সংকুলান না হওয়া ফেরৎবারগুলি ফিন্‌কি দিয়ে খিড়কি পথে নেমে গ্যাছে। এইভাবে অপ্রতিবিধেয় দারিদ্র্যর মধ্যে তার শুক্রবারের দ্বীপ ছন্নভন্ন হয়, হোতে থাকে। তো আগে আমি যে কথা বোলছিলাম তাতে সময়কে আর্ক কোরে এগিয়ে গিয়েছিলাম আবার মাসখানেক পিছিয়ে জুলাই-এ নেমে আসা যেতে পারে। ধরা যাক যেকোনো একটা দিনে যে কেউ যেমন যোগেন, অ-যোগেন কিংবা না-যোগেন যদি পৌছে যেতে পারে বা বলা ভালো পৌছালো তাহলে পদার্থবিদ্যার খাতিরেও বলা যায় না সে অর্থাৎ ঐ যোগেন, অ-যোগেন কিংবা না-যোগেন কোনো a বিন্দু থেকে শুরু কোরে b বিন্দুতে পৌছালো। ঠিক জেনো (zeno)-র সরলরেখা মানে গোলকধাঁধাঁর ধারণাও নয় বরং শুরু করার কাল্পনিক বিন্দুটি যদি না ধ'রে মনে করা গেলো সে অমুক দিনে এখানে অর্থাৎ তমুক b বিন্দুতে পৌছালো বা পৌছাবে তাহ'লে আমি যেদিকেই আলো ফেলি দেখি যোগেন/অ-যোগেন/না-যোগেন চ'লেছে বা চ'লে গ্যাছে ঐ তো নফর দাস লেন কিংবা রাখালদাস আঢ্য লেন কিংবা বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট বিকল্পে বৌবাজার ক্রশিং দিয়ে, এভাবে না লাগা আলোয় আলো ফেলে ফেলে খুঁজে স্থাথা যাবে গণনাহীন গলি-রাস্তায় যে কেউ তার যে কোনো দিনে পৌছায়, পৌছাতে পারে। এরকম হোলে স্থাথা যায়, স্থাথা গ্যাছে, একজন যেমন যোগেন কোনো এক দিনে বা b বিন্দুতে পৌছাতে ধরা যাক পূর্ব/উত্তর দিক থেকে পশ্চিম/দক্ষিণ দিকে যাত্রা কোরতে পারে অসংখ্য রাস্তায়—একথা আংশিক সত্য বরং b যদি একই অবস্থানে থাকে তাহ'লেও স্থাথা যায়, স্থাথা যাবে, যোগেন চ'লেছে পশ্চিম/দক্ষিণ থেকে পূর্ব/উত্তরের দিকে আবার পূর্ব/উত্তর থেকে পশ্চিম/

দক্ষিণের দিকে তো বটেই।

তো জুলাই-এ নেমে আসার আগে বছর কয়েক আর্ক কোরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র ঐ জুলাই-এ নেমে আসার জন্যও।

গোঙানোটা ততো স্থূল নয়, অবশ্য তা একটানা বুননের ফলে বাসযাত্রী হিসাবে আর প্রশ্ন তোলা যায় না কল্পনাকে নিয়ে, তবে ছোটার গতিতে বোঝা যাচ্ছে সিওলে (সি.টি.) উষা হার্ডলসে সোনা পেয়ে যাবে। জানলার ধারে যোগেনের গায়ে রোদ জাপ্‌টে বসার ফুরসৎ পাচ্ছে না, বাতাসের ঝাপটে পিছল হোয়ে পড়ে। যেতে হাইওয়ের দুধারে সার সার কচি বাবলার ঘন সবুজ সম্মোহন, মাইলের পর মাইল কেঁপে উঠছে। ঈশ্বরের মতো তাতে সাদা সাদা কাঁটা মগ্ন। যোগেন জানলার বাইরে মাথা লটকে চোখ ছোটো করে। চোখে মুখে বাড়ি মারছে হাওয়া। হাওয়ার রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে চোলেছে জগতিতিরের ঝাঁক, আসলে এতো বোঝাই যাচ্ছে তিতির-টিতির নয় বাতিল পাতাবাহী হবে। রাস্তা যেরকম সোজা, বাস বোধহয় গন্তব্যে নয় বিষুব বরাবর প্রান্তে ঢুঁ মারবে। যোগেন, আহ্‌ যোগেনের ইচ্ছা করে নেমে দাঁড়ায় কচি বাবলার পাশে তারপর যেভাবে মলিনার ঘাড় থেকে চুল সরিয়ে মুখ রাখে, সেদিনও বাতাসে লোনা পলেশতরা খশে পড়ছিলো, সেরকম কচি বাবলার বুকে প্রাণভোরে মুখ ঘষবে।

কবে যেনো বাড়ি ফিরে পিয়নের বন্ধ দরজায় ফাঁক উত্‌রে ঢাওয়া পিকচার-পোষ্টকার্ড থেকে পৌনে চারলাইনের ঠিকানা তুলে নিয়েছিলো তারপর দূর থেকে গড়ানো মার্বেলের মতো শ্লথ হোতে হোতে আজ এইখানে এসে স্থির যোগেনকে ঢাখা গেলো। এই তার ঠিকানা, পোর্সেলিন কলোনীর ভেতর যথাতম শোকেস, এমন নিস্পৃহে ঝলমল কোরে ওঠে। অকারণ কিংবা সকারণ যাহোক, বড়ো একটানা কিছু পারে না, কিছু না এবং পারেনি বরাবর এগিয়ে দরজায় টোকা দিতে যেমন এখন। বক্তব্যে, বাক্যে যেমন অনিবার্য না হোলেও এসে পড়ে এক শব্দ-'প্রসঙ্গক্রমে' তেমনি প্রসঙ্গক্রমে যোগেনের সামনে এসে পড়ে পুরোনো। তখনো শকাব্দ পরখ করার যা অচেনা যা অবিশ্বাসপ্রবণ, তাদের পুরোনো চতুরালিতে তার জং ঝ'রছে। অবশেষে যেরকম হয়, যোগেন একার ধরনে হলুদ চিকুর দিয়ে করিডোর পার হয় আর নিজের তরফে দরজায় টোকা।

কে ?

—ভেসে আসে, রোদভাঙা হাসি গলায়, তা এখনো। কেননা স্বয়ংক্রিয় 'black and white incident is put to rest'-এ চকবন্দী হোয়ে পড়ায় সে উত্তর কোরেছিলো—'আমি' ; যেহেতু 'আমি কে ?'—প্রতিপ্রশ্নে যোজন আঙুল হারায় আর সাদা ও কালোর সংঘটন বিশ্রাম খুলে ফ্যালে ফের, তখোন আলো পড়ে না লাগা আলোয় :

এইখানে আমি পূর্বোল্লিখিত 'জুলাই'-এর বিন্দুপরিধিতে এসে দাঁড়ালাম। এখানে অক্ষরেখা বরাবর যোগেনকে পাওয়া যেতে পারে, তার দারিদ্র্যে কিংবা বলা ভালো দারিদ্র্যরেখার নিচে কিংবা ওপরে।

দিনগুলির চলনলয়ের মীমাংসা করা হোচ্ছিল ধৈর্যমন্থরতায় আর চিঠি লেখালেখির অক্ষরার্থে 'অপস্থত হ'য়ে বেঁচে আছি' বরং উপেক্ষার ডাকটিকিট ছিঁড়ে বছর-বয়স পরিগ্রহ কোরে যোগেনের যেমন চোলছিলো। তার তো মনে হয় না 'দিন যায়, সন্ধ্যা হবে, সময় রবে না' অথচ রাংতার চোখ অফুরান তুলে রেখেছিলো ঝকঝকে ক্যালেণ্ডার থেকে ঘড়ির কোয়ার্জ পর্যন্ত। আর একেকদিন, দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, কিন্তু সময় র'য়ে যেতো ছড়িয়ে পড়ে ওতোপ্রোত ফাঁকায়। এবং এরকম একবার।

ছ-ই অগাষ্টে কে একজন আমার দরজায় টোকা মারল :

কেউ-না।

এবং এই কেউ-না ভিতরে এসে বসল একটা চেয়ারে।

সময় কাটালো আমার সংগে, কেউ-না।

এই কেউ-না আমাকে কোনো কথা ছাড়াই জিজ্ঞাসাবাদ করল আর আমি উত্তর দিয়ে গেলাম, কিচ্ছু না দেখে, কিছু না ব'লে।

বস্তুতঃ ছ'ই অগাষ্টে নয়, জুলাই-এর কোনো সন্ধ্যায় এভাবে মলিনা অনেকখানি আর পরে, তারও পরে নেরুদার কবিতায় 'ঘটনা' পড়ে সে। এবং যেহেতু সে তা পড়ে তখোন বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন। তাই যোগেন হোয়ে ওঠে সে মুহূর্তে আরেক পাবলো আর অনিশ্চয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে সে বুঝে ফ্যালে মরা ঘড়িরও একটা দরজা থাকেই।

এরপর হুড়মুড় না কোরে ধীরে সুস্থে পা বাড়িয়ে জুলাই পেরিয়ে আরো কতকমাস ছাড়িয়ে চোলে গ্যালে হয়তো পরের বছরই হবে নাকি, যোগেনকে পাওয়া গেলো হীরাবন্দরের রাস্তায়, যে কোণে খানিক ফুটপাথ ঘেঁষে সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের থেকে কিঞ্চিদধিক উচ্চতায় দাঁড়িয়ে কোনো ছোটো গাছ, বিপরীতে সিনেমা হল রেখে, আর মার্চের সকাল দশটার রোদে বাসের জন্য অন্যান্যদের সাথে দাঁড়িয়ে, অন্যান্যদের সাথে দাঁড়িয়ে, অনেকখানি, অথচ অন্যদের বাস আসে চোলে যায় আর যোগেন দাঁড়িয়ে থাকে রুটের বাস না পেয়ে, একসময় একা প্রায়। হঠাৎ ঘুড়ুরের শব্দ, তো চমকে ঘাড় ঘোরালে—গাছের গায়ে গা ঘসছে ষাঁড় অথচ থেকে থেকেই ঘুড়ুরের শব্দের ওঠানামা, উৎস ধরা পড়ে না। পাশাপাশি বাড়ি নেই-যে, তাছাড়া দোকান স্টল, তবুও থেকে থেকেই চিড় খাচ্ছে খরতপ্ত রোদে। ক্রমে একসময় ধরা পড়ে ওদিকে সিনেমা হলের সামনে, মেশিনের বৃত্তাবর্তন, যোগেন বোকেও, ঘুড়ুরের সমান শব্দ ফেলে শ্বাস ভোরে ওঠে পানায়। পরে বাস ধরে প্রেসে গ্যালেও চোখে লেগে থাকে শব্দের মর্ত্যমুখ। যোগেন বনাম সারা দিন : ২,৭৭৬,৮৯ বর্গ কিলোমিটার / ১৯৭১ শুমারি / প্রধান রপ্তানি পশম-চামড়া-মাংস / রি-যো-দে-লা-প্ল্যা-তা / মো-স্তো-ভি-দে-মো / ওট্, আলকালফা, কার্পাস / আনুমানিক আয়ু / দামস্ফীতির হার / কর্মরত জনসংখ্যা / নীট বৈদেশিক ঋণ—এইসব নিখুঁত পরিসংখ্যানের ছিমছাম ঊনকথনে চোখ ডুবিয়ে প্রুফ। আর সন্ধ্যায় একদিন বিশেষ চিঠি পেয়ে মালিকদের বাড়ী গ্যালে, শেষ পর্যন্ত তো দরজায় টোকা দিতেই হয়। এবং সে জানতো : আয়না আমাদের যা দেখায় তা তাৎক্ষণিক। প্রতিদিনকার ছবি প্রতিদিনই মুছে যায়। অথচ দরজা খুললে সে যোগেন, যে তার চোখ মলিনাকে পায়না আর যবশ্যব সে তার অনুসন্ধান থামিয়ে বুঝতে চায় মলিনা কোথায়, কোথায় মলিনা? আর না পেয়ে ফিরে যায় যোগেন যদিও দরজা খুলেছিলো যে ঐ মলিনাই তো। পরে কোনোদিন চোখ ডুবিয়ে প্রুফ দেখতে দেখতে যোগেন কি শব্দের মর্ত্যমুখ নিয়ে আরো ভেবেছিলো : একটা সচল ঘড়ির কোনো দরজা থাকেনা।

পোকার অধ্যবসায়ে সিম্ফনী বর্ধিষ্ণু ভ্রমণে হেঁটে চলে। 'যোগেনের ঠোঁটে গলে পড়ে ইক্ষুকণার ক্ষয়', তার 'ঘ্রাণের অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা এলাচ।'

॥ থার্ড সিম্ফনী ॥

এতো বোঝাই যাচ্ছে যে, শুক্রবারের দ্বীপে দাঁড়ানো যোগেন বারবার শুধু নয় যেকোনো বারই অযথা নিজেকে দরিদ্র নয় কিংবা দরিদ্র আর দারিদ্র্যরেখার নিচে এই আরোহী-অবরোহী অঙ্ক ভারসাম্যে মেলে দিতে আপত্তি তুলবে।

কেউ অবশ্য মুখের ওপর তাকে বলেনি : শুক্কুরবার দিনটা আল্লাহ্‌র, ছাখ ছাখ যোগেন তোর গায়ে মুখে কচি নীল আলো সাপটে পড়ছে। বাস্তবিক কেউ বলেনি কিন্তু যোগেন জানে তার আপত্তিটা জোরালো, সে তাই পিছনে ফেলে রাখতে পারে ঈশপ-লিজেণ্ডের যে প্রজেকশান চোলেছে ঘর্ঘর শব্দে—

যোগান (supply) নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে—স্কে-এর 'লঅস অব মার্কেট'-এর ক্লাসিকাল ধারণা, এতোদিন যা অত্যন্ত বিখ্যাত চোর খুঁজেছিলো লণ্ঠন জালিয়ে অর্থাৎ ডেভিড রিকার্ডো তার দোসর হোলেন। শুধু, ম্যালথাস শুধু প্রাণীকুলে মৎসধর্ম অবলম্বন কোরেছিলেন, কিন্তু গড্ডল বিচারে তাঁর দশাও আমরা জেনে যাই কেইনস্-এর রোমহর্ষক ধারাভাষ্যে :—'রিকার্ডোর মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি হওয়া অসম্ভব, এর বিরুদ্ধে ম্যালথাস স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেননি, কিরূপে ও কেনো কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি বা বাড়তি ছাথা দেয়। ফলে তিনি বিকল্প কোনো কাঠামো দাঁড় করাতে অক্ষম হোয়েছিলেন ; এবং প্রত্যেকেই যা জানে, পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম যেমন স্পেন গিলে ফেলেছিলো, রিকার্ডোও তেমনি ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। শহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলেই তাঁর মত কেবলমাত্র গ্রহণ কোরেই ক্ষান্ত হলেন না, বিরোধের অবসান হোলো, অপর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হোলো ; কোনো আলোচনার মধ্যে এটা আর প্রবেশ কোরলো না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধা, যা নিয়ে ম্যালথাস সংগ্রামে অবতীর্ণ হোয়েছিলেন, তা অর্থশাস্ত্র থেকে লুপ্ত হোয়ে গ্যালো।

বাড়িটার চিবুকের ঐ কালি বাগানে মলিনাতো অনায়াসে শরৎবার্ষিকী পরিকল্পনা উপুর কোরে ফেলতে পারতো। কোথায় কাশ? শুধু লাগাতার লতাবাহার, পাতাবাহার, ফুলবাহার আর কাঁটাবাহারের অভ্রান্ত আঙ্গিক। যোগেনের এখোনো মনে আছে, মনে থাকে দেখছি। একদা মলিনাই পেশ কোরেছিলো তার জাতির উদ্দেশে ওরফে যোগেনের দিকে—বিয়ে কোরলে সে কি কি পুষবে তার বিশদ তালিকার সম্ভাবনা আঁচ। প্রথম পংক্তিতে নেড়ি বামুনের মতো অবশ্যোই থাকবে সোওয়ামী। দ্বিতীয় 'নহ মাতা নহ কন্যা' এই ইমেজ পুষে পালন করা ; তৃতীয় লোমভর্তি কুকুর, চতুর্থ একফালি বাগান থাকলে ভালো নচেৎ ছাদেই মাটি ফেলে প্রতি অনবলীন শরতে এক ঝাঁক কাশ রীতিমতো পোষ মানানো। বরফের মতো জ্যোৎস্না করলে বোঝা যাবে কাশবনে জিঘাংসা

কতোখানি। তো কোথায় কাশ! এখন সে কথা থাক, কিছু ক্যালেনডার পায় কোরে যোগেন যেভাবে আজ আবার দরজায়, হয়তো নোতুন কোনো ইমপ্রেশনে ছয় সন্নিধি।

দরজায় টোকা পর পর। আর জানলা থেকে ঘরের দিকে চিবুক ফেরায়। টোকা বাড়তে থাকে। মাঝের ঘর। করিডোর। বৈঠকখানা পেরিয়ে যেতে যেতে শব্দ বাড়ে। ফুলদানীর মতো গলা উঁচু কোরে ছিটকিনিতে মলিনার হাত ততোক্ষণে দরজার কাঁপুনি ও বুকের শব্দ মিলেমিশে ছয়ভয়। আ-আর শব্দের মর্ত্যমুখ আলাদা করা যায় না। দরজা খুললে, দরজার ছায়া এতোদূর যায় যে বুঝতে না পারা অতিথি। তখোন প্রকৃত ভয় করে, আর ছায়ার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা অন্ধকারের চেয়ে আরো গভীর, গাঢ় কোনো মানুষ, কোনো মানুষ না থাকে যদি?

লোকে বলে: আরোহী কোমল নিষাদ এবং অবরোহী কোমল ধৈবত প্রয়োগের মুনশিয়ানা যোগেনের জাত চিনিয়ে ছাড়ে। এই যে লোকে এসব বলে, যখোন বলে, বোলে থাকে জিভের এক পুরাতনী আধুনিক আরামে, এতে আমার একটা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু বেরিয়ে আসে, লোকে যারা বলে, রসজ্ঞ, এ স্বীকার কোরে নেওয়া যায়, তা বোলে যোগেনকেও রাঙা হোয়ে উঠতে ভাখা গ্যাছে। হোতে পারে পাকাপোক্ত বাহানায় মাথা বাঁচানো, যোগেন সবসময় চাইতো না, হোতে পারে 'সে অনেক আগেকার' তার ছোটোবেলার কার্ফু রং আকাশ গলে গলে উপছে ওঠা খোলা জলে কাগজের ভাসানো নৌকার মতো সেও স্রোতের অন্তর্গত টানে নিশ্চেষ্ট কুটোর ধরনে ব'য়ে যেতে পছন্দ করে। কোথায় পৌছাবে ঐ নৌকা, পাশের বাড়ির ঝিমলির কাছে? বড়ো রাস্তার মোড়ে? কোথায় আর পৌছাবে ঐ নৌকা। অবশ্যো যোগেন কি কোরে তা জানবে। জাহাজ একবার কালা-পানিতে গ্যালে আর ফেরে না, জাহাজের খপরও যেমন আর পাওয়া যায় না, তেমনি সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে মেলে না। ক্রমশঃ হোতে থাকা যোগেন ক্রমে বোঝে: অর্থ—×, কীর্তি—×, স্বচ্ছলতা—×, বিস্ময়—×, যশ—×, লোভ—×, এমন কি বোধ নয়, রক্তের ভেতরে তবে কি অথয় আশ্চর্য হোতে থাকে।

যোগেনের এম্পিরিক্যাল দুনিয়ায় বলা ভালো, সিম্যানটিকস্ (অর্থ) ও প্র্যাগম্যাটিকস (প্রয়োগ) ছাপিয়ে মাথা উঁচিয়ে থাকে সিনট্যাক্স (অন্বয়)!

আমি তো আগেই বোলেছি : 'সে অনুসরণ করে' ; তাথা যাবে এম্পিরিক্যাল দুনিয়াতে তাথা যেতে পারে যোগেন কোনো অর্থোদ্ধার নয়, অর্থ নির্ধারণ নয় বরং আশ্চর্য হোতে থাকা অন্বয়কে অনুসরণ করে, কোরে থাকে। যে অন্বয় মানে বোঝে না, শুধু বোঝে পরমার্থ। একটু এগিয়ে আমরা সিনট্যাক্সকে সবচেয়ে বিমূর্ত বোলে বোলতে পারি কেননা এই স্তরে যোগেনের কোনো তাৎপর্য নেই, যোগেন সম্বন্ধে এই স্তর আমাকে বা তোমাকে কিছুই বোলছে না। কিংবা, বোলছে যে গান জানিনা তার স্বরলিপি। দাবাছকে ঘোড়ার ধরণে আড়াই চালের লাফ মেরে যোগেন সিঁড়িভাঙা শুরু কোরেছিলো হয়তো প্রথম দিকে, কেন না তারপর পিছনের এক আধো তাড়নে বোড়ের ক্ষমতায় এক ধাপ কোরে উঠতে থাকে, তার বাড়ির সিঁড়িপথও তেমনি ছায়া-আলোয় ছন্ন, এক পা, দু' পা কোরে উঠতে উঠতে মাঝে চাতাল এলে যোগেন কি সিঁড়িলাগোয়া রেলিং-এ হাতে ভর দিয়ে ঘাড় ঝুকিয়ে নিচে কিছু দেখেছিলো ? দেখেছিলো যে তলায় সিঁড়িভেঙে তারই শৈলীতে প্রথমে আড়াই লাফ, পরে এক পা, দু' পা কোরে যোগেন তাকে অনুসরণ কোরছে ? গ্রাফের ঠিক কোন্ অবিকল জায়গায় সে দরিদ্র নয়, দরিদ্র কিংবা দারিদ্র্যরেখার নিচে বুঝতে পারিনি কি ? যখোন, আ অই সে যোগেন দোতলার চাতালে বাঁ হাতে রেলিং-এ ভর দিয়ে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সিঁড়ির আলোছায়ার নিচে দেখছে যে তাকে অনুসরণ কোরছে যে সে যোগেনই একইভাবে, তখোন না লাগা আলোয় আলো লাগে :

গবেষণাগারে আলোর তরঙ্গপ্রকৃতি নির্ধারণে যে ঘটনাটি আমাদের বিশেষভাবে নজরে আসে তা হোলো আলোর ব্যতিচার (interference)। ব্যতিচার এমনি একটা ঘটনা যেখানে দুটি উৎস থেকে আসা আলো পরস্পরের ওপরে পড়ে, কোথাও আলোর উজ্জ্বল উপস্থিতি অথবা কোথাও স্বল্প উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রকাশ করে। আলো অন্ধকারের এক পর্যায়ক্রমিক সমাবেশের এই যে বৈশিষ্ট্য ব্যতিচারে ঘটে থাকে, তা গবেষণাগারে দৃশ্যমান কোরতে গ্যালে একটি অতি আবশ্যক শর্তপালন কোরতে হয়—শর্তটি হোচ্ছে : উৎস দুটিকে সুসঙ্গত (coherent) হোতে হবে।

সুবল গাঙ্গুলী

সখী ভালবাসা কারে কয়

ওয়াকিং উইমেন্স হস্টেলে টেলিফোন করে জানালাম যে টিকিট কেনা হয়ে গেছে। পূর্ব নির্দ্ধারিত মতো আমার প্রথম শ্রেণীর আর ওর টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর। "চার-পাচশো বেশী টাকা সঙ্গে নিয়ে নিয়ো ; তোমার জামা-কাপড়ের যা অবস্থা। কিছু কেনাকাটা করবো" টেলিফোনে অনুরোধ এলো।

১২ মে ১৯৭৯। রাত ৮ আটটা। আমি পাটনা স্টেশনে। এইট-এইট ডাউন জামশেদপুরের জন্য সাড়ে আটটায় ছাড়ে। মিনিট কুড়ি পরে হঠাৎ আবির্ভাব। চোখ ঝলসে গেলো। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গী. মৃদু নরম সৌন্দর্য। গ্রীষ্মের রাত। পরনে ছিল সবুজ তাঁতের চেক শাড়ী। হাতে একটা সুন্দর চামড়ার বেডিং। "শিলিগুড়িতে কিনে ছিলাম" হেসে বল্লো সে। "কিছু খাওয়া হয়েছে ?" জিজ্ঞাসা করি। "সময় কোথায় ? বের হতে যাবো, রিক্সা পাওয়া যায় না, হঠাৎ বাড়ী থেকে ভাই এসে হাজির। কোনরকমে অজুহাত দিয়ে পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যে সঙ্গে চাপরাশীটা ছিল" সে বলে ওঠে। আমি কিছু কেক, পেষ্ট্রি কিনলাম। কোনরকমে তাই খেলো। ট্রেন ছাড়লো।

খুব ভোরে ট্রেন আসানসোল স্টেশনে। পাশের কামরা থেকে বের হয়ে আমি উঁকি মারি। উপরের বাথে এখনও শুয়ে আছে। মাথায় অবিন্যস্ত হাত। আদ্রা স্টেশনে আমরা নামলাম। মুসলমান বৃদ্ধা অযাচিত আশীর্বাদ জানালো "সাহেব আপনি দেখতে সুন্দর, মনটাও মনে হয় ফুলের মতন, মেম-সাহেবকে নিয়ে সুখী হোন। আল্লার কাছে আরজি জানাই।" আমি হাসলাম। চল্লিশোর্ধ আমি, পুত্র-কন্যার জনক। চল্লিশের কোঠায় সে এক অবিবাহিতা। ভারতবর্ষে এ নিষিদ্ধ, এ পাপ। পায়ের শেকল ভাঙ্গার ক্ষমতা কই ?

জামশেদপুর স্টেশনে রেলওয়ে রিফ্রেসমেন্ট রুমে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সমাপন

হলো। আমার ছিল এক জরুরী এনকোয়ারী। বসে গেলাম দেরী হলে অপেক্ষা না করে লাঞ্চ সেরে নিতে। সে মাথা নাড়লো। ফিরলাম বেলা ৩টা। দেখি খায়নি। একটা বই পড়ছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহ। এতদিনে বইটার নাম ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি বিষ্টুপুরে এক চাইনীজ হোটেলে এলাম। আহার সমাধা হলো। ওর প্রিয় ডিম, আমার চিকেন। আহারের পর দেখি তখনও দোকান-পাট খোলেনি। গাড়ী ছুটলো ডিমনা লেক। জলন্ত সূর্য মাথার উপর।

"সৌরভ তুমি সত্যি সত্যিই অ্যাবনরম্যাল। আর তোমার মতন পাগলের পাল্লায় পড়ে আমারও পাগলামি শুরু হয়েছে। নয়তো আমার মতো প্রাচীন পন্থী কখনও তোমার পেছনে এইভাবে ছোটে" সে বলে ওঠে। "সত্যি তুমি নান (Nun) না হয়ে কি ভাবে মাষ্টারনী হয়ে উঠলে তাই ভাবছি" আমি বলি। লেকের হাঁটু ভেজা জলের মধ্যে নামলো সে। মাথায় জড়ানো রঙীন রুমাল। রঙটা বোধ হয় লাল-সাদা ছিলো, এতোদিনে ভুলে গেছি। তবে সেই মুহূর্তে একটা কথাই মনে এসেছিল—**bewitchingly beautiful.**

গাছের ছায়ায় বসলাম। দুটো গান শোনালো সে। "আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান" আর "সখী ভালবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি চোখের জল" গাইতে গাইতে তার গলা ধরে আসে, চোখে জল। আমি শোনালাম "তুম ন জানে কিস জ্যাহা সে খো গয়ে" আর "প্রেম একবার এসেছিল নীরবে।" বহুদিন ওকে উত্যক্ত করেছি কবিতা লেখার জন্য। আমার দুটো খাতা তো উচ্ছ্বসিত কবিতায় ভরে গিয়েছিল। কিন্তু ও লিখতো না। আজ প্রথম ওর লেখা একটা কবিতা শোনালো। সামান্য খাপছাড়া দু-একটা লাইন এখানে তুলে দিলাম :—

তোমার নাম রেখেছি সৌরভ।
তোমার ভালবাসার রূপ রঙ আমার
আচ্ছন্ন করে।
আমি বিপন্ন বিস্ময়ে চেয়ে থাকি—
তুমি কোন আকাশের পথিক।

কর্মক্লান্ত সূর্যের বিশ্রামের অবকাশে।
আবার কুঁড়ি স্বপ্ন দেখবে
ফুল হয়ে ফোটার।

এবার ওঠার পালা। সূর্য নরম হয়ে আসছে। ও হঠাৎ উঠে আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিলো। "ছি, ছি, এ কি করছো। তুমি না ডক্টরেট" আমি বলে উঠি। "তা তে কি হয়েছে। তুমি তো অনেক জ্ঞানী-গুণী" সে জবাব দেয়। "জানো যতো তোমায় দেখি ততই অবাক হয়ে যাই। তুমি আমার এতো কাছে থেকেও কখনও আমায় স্পর্শ করো না" বলে চলে সে। আমি বলি "এ বয়সে সব জিনিষে সেক্স দেখার চোখ চলে গেছে। তুমি আমার কাছে এক আধ্যাত্ম প্রেরণা। কখনও কবিতা লিখিনি। তুমি আমায় কবি করে দিলে। কতো পেলাম স্বপ্ন, কল্পনা আর অপূর্ব অভিজ্ঞতা" আমি বলে উঠি। "তাহলে আজ এই সুন্দর বিকেল নিয়ে একটা কবিতা লিখে আমায় শুনিয়ো। আর একটা কথা। বহুদিন বলবো বলবো করে বলা হয়ে ওঠেনি। আমাদের মেলামেশা আজই শেষ। এরপর যবনিকা পতন" সে বলে। চমকে উঠি। প্রচণ্ড আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যাবো না তো? "ছিঃ, এই অসামাজিক জীবন, বড়ই গ্লানিময়। জানাজানি হলে হবে মাথা হেঁট, হবে সম্মানহানি। তাই আমাদের ভালবাসা থাকবে শুধু মনে মনে। রাধা-কৃষ্ণ প্রেম তো রূপকথা, বাস্তব সত্য নয়। আমাদের দেশে নারী শুধু স্ত্রী অথবা মা হতে পারে। মহৎ প্রেম ঘুরেও ঠেলে দেয়—তুমি জানো না" একমনে বলে চলে সে।

এরপর বজ্রাহত আমি। উঠে পড়ার পালা। গাড়ীতে বসে চিন্তায় আমার মুখ গম্ভীর। "কি ভাবছো?" সে জিজ্ঞাসা করে। চপল সুরে জবাব দিই "গম্ভীর থাকলে পুরুষের ব্যক্তিত্ব বাড়ে—তুমি জানো না।" এই কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে সে। হাসি যেন শেষ হয় না। গাড়ী থামিয়ে রাস্তায় একবার জল খেলাম। দোকানদার তো অবাক। এইভাবে সন্ধ্যার ছায়ায় শহরে ফিরে এসেছি। নটরাজ সিনেমা হলে এক হিন্দী ফিল্ম চলছিল। এতোদিন পর নামটা মনে পড়ছে না। সিনেমা দেখার মাঝে ওর হাত ছিল আমার হাতে নিবিড় আবেশে। দুবার ওর জন্য চিনাবাদাম আনতে উঠলাম। সিনেমা শেষে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে ওর কলকাতা যাত্রা। রাত দশটা।

ট্রেন ছাড়ছে। আমাদের চোখের জল আর বাঁধ মানছে না। যতদূর মনে পড়ছে নীল রঙের চিকন শাড়ী পরেছিল। বার বার অবাধ অশ্রু মুছে চলেছে। ট্রেন ছেড়ে গেল।

এরপর দীর্ঘ, দীর্ঘ বিচ্ছেদ। দেখা হয়েছে মাঝে মাঝে পাটনায়, কলকাতায়। কিন্তু দৃষ্টি তার হয়ে গেছে ভাবলেশহীন। সেই পাথরপ্রতিম শিক্ষিকা। আমার মন কিন্তু আজও তার জন্য কাব্যময়। আমার জীবনের পাথর চাপা নির্ঝরিণী সে খুলে দিয়েছে, কেমনে পশিল রবির কর, তা আমার অন্তরাত্মা জানে। সে হয়তো সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, নিজের ইমেজ প্রভৃতি চিন্তায় হয়ে গেছে পাথর। হয়তো পাথর চাপা নির্ঝরিণী। হয় তো? তুমি আর নেই সে তুমি। সত্যি কি?

আজ এত বছর পরে পেছন ফিরে দেখছি, সত্যিই কি ১৯৭০ সালের মায়া শরতের হাওয়া লেগেছিল অক্ষরের গায়ে। সতেরো বছর আগের এক বেদনা বিহ্বল লেবার রুম। প্রসবনীলে আচ্ছন্ন সরস্বতী। রক্ত, মাংস, প্লাসেন্টায় মাখামাখি, দুখানা রাবারের দস্তানা তখনও পাশে পড়ে। জন্ম।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

বিপন্নতার জন্য

এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে আত্মহত্যা সমাধান নয় কোনো ; অনুমান মাত্র। শেষ বিকেলের আলোয় তার ছায়া বড় হয় লেপ্‌টে যায় মেডিকেল কলেজের থামে, সে রণো, দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যাশিত শবদেহের প্রতীক্ষায়। তা যুবতীর। নীচে, তারও আগে বেশ কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে যেতে হবে, পাতা রয়েছে শূন্যখাট ফুল দিয়ে সাজানো চমৎকার, ধূপও। ঘিরে আছে শোকে পাওয়া মানুষ ; এবং শোক পাবেই, মানুষ বটে।

"আমার স্কুলের চাকরীটা হয়ে গেছে, এম.এ -টা দিয়েই জয়েন করব" এই কথা বলে মেয়েটি কোল্ডড্রিংকস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আশেপাশে শিগেলামুক্ত জল পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কায়। রণোও রাজী। এরপর তারা হগ মার্কেটে ঝুঁটিলাল কাকাতুয়া দর করতে চলে গিয়েছিলো। ফেরার পথে ট্রাম রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই শহরের সন্ধ্যে হওয়া দেখতে দেখতে তাদের আলোচনা যা বরাবর আকাঙ্ক্ষিত ; ভোরবেলা কোলাঘাট যাবার কথা, বটানিকাল গার্ডেনের সব গাছের নাম পড়ে ফেলবার কথা, আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল বা রিভলবার কোন্‌টা কেনা উচিৎ ; এইভাবে ক্রমাগত ভুল করে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। সে সময় "মার-মার" বলে চেনরডছুরি সমেত ছুটে গিয়েছিল কয়েকটি যুবক, মুহূর্তে হুটোপাটী শুরু, আক্রান্ত হ'ল অমিতাভচুল দীর্ঘদেহী এক যুবক। বার দুয়েক সোজা[১] হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে 'মাগো' বলে সপাটে আছড়ে পড়ে রাস্তায়। মানে ঠিক 'মাগো' এই শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো কিনা শোনা যায়নি। তবে হলেই ঠিক মানাতো। যেমন, আমরা ভয়ে 'বাবাগো' আর যন্ত্রণায় 'মাগো' —এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করি। এইভাবে আমরা বাবা এবং মাকে ভয় আর যন্ত্রণায় ভাগ করে নিয়েছি। বেমানান কোনো কিছুইতো সহ্য করা হয়নি, যারা বৌ-চৌ খুন করে আমরা তো তাদের পোষাক দিয়েছি। এমন কি মৃত্যু—তাতেও

কজনই বা মেরুদণ্ড সো । রেখে দাঁড়াতে পেরেছে ?

রুচি ও সংস্কৃতির ছাপ থেকে যায়। এ ব্যাপারে আরও যত্ন নেওয়া হচ্ছে! হত্যাকাণ্ড দেখে তারা সভয়ে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। তখনো তারা ভীত। ভয় তাদের ঘিরে ধরছে।

গল্প শুরু হতে পারত অন্য জায়গায়। হয়েও গিয়েছিলো প্রায়। হল না। ফলতঃ এরপর যা কিছু—গল্পের বাইরেই রয়ে গেল। সাংবাদিক তো হন্যে হয়ে story খোঁজে, লোকে খাবে। বাঃ চাষীভাইয়েরা এবং মজদুরমণ্ডলী ছাড়া, সাংবাদিকরাও আপামর শহরবাসীর খাবার জুগিয়ে যাচ্ছে? এদের মধ্যে অধ্যাপক কেরানী অফিসার দালাল ঠিকাদার ব্যবসায়ী চোর বেশ্যা সমকামী রেপিস্ট মার্কসবাদী অস্তিত্ববাদী পরাবাস্তববাদী নৈরাজ্যবাদী কবি সাহিত্যিক ভিখারী গুণ্ডা খুনী বৌদ্ধ ব্রাহ্ম বৈষ্ণব বাকুন.....কতরকম। আবার এদের পারমুটেশন কম্বিনেশন—যেমন মার্কসীয় অস্তিত্ববাদী, অ্যাঁ তাহলে! সব শুনে সংবাদপত্রভোজীদের জন্য মেয়েটি একটি সন্তো স্বীকার করে। টেপ্-রেকর্ডার চালু:

—বাড়ী কোথায় ছিল?

—যশোর।

—গ্রামের নাম?

—সাগরদাঁড়ী।

—নদীর নাম?

—কপোতাক্ষ।

গল্প এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিলো। কিন্তু, "মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম জানা আছে?"—এই প্রশ্নই গল্পের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। "শুনেছি নামী লোক, খুব মদ খেতেন। আমার ছবি তুলবেন না?" ক্যামেরাম্যান ফলস্ ক্লিক্ মারে। হঠাৎ ফ্ল্যাশের ঝলকানি লেগে তার মুখ ঝলমল করে ওঠে। উপভোগ্য প্রতারণা। সেই একই গল্প। দেশ ছেড়ে চলে আসা—ভয় পরিবার—রিফ্যুজিক্যাম্প—অত্যাচার—আড়কাঠি—লাট খেতে খেতে—বেলফুল চাই বেলফুল[২] নির্ভীক ঝলক হেঁটে যায় পুঁজরক্তথুতুময় প্রাচীন দেহলীর মধ্যে দিয়ে লাইনবন্দী শোকার্ত আত্মাদের ভীড় ঠেলে। পিছনে মুক্তাণ। ব্যাটারী ডাউন

---

২. অনেকটা রবিবাবুর 'ডাকঘরে' যেমন: বইওয়ালা—বই-বই ভালো বই। সুরটা মনে পড়ছে? ঐ ছাব্বিশ খণ্ডের বাইরে কবে যে যাবো।

হয়ে যাওয়ায় টেপ্ থেমে যায়। গল্প ভেঙে যায়। এরপরই রণো আঁতকে উঠে পালিয়ে আসে। সে স্পষ্ট দেখেছে, না মদ খায়নি, টেবিলের উপর রাখা ছিলো 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' এই শিরোনাম সম্বলিত কৃশকায় একটি বুকলেট। এখানে কারা পড়ে ঐ সব? কেনই বা পড়ে? হো-হো এরা সব পড়ে ফেলল হো-হো-হো। L7A সরশুনা-হাওড়া লাস্ট বাসের প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই হাসি। যা রণোর। হঠাৎ চুপ। শুধু কণ্ডাক্টরের উদ্দেশে "হাওড়া একটা" রাজভবনের সামনে দিয়ে হু হু করে ছুটে যায় L7A সরশুনা থেকে হাওড়ার দিকে।

গত শীতে ভুবনডাঙার মাঠে খুব গান এলো। গান তো কেউ না কেউ কখনো না কখনো গেয়ে যাচ্ছে স্নান ঘরে, উল বুনতে বুনতে, খুন্তি-নাড়তে নাড়তে, লোকাল ট্রেনের দরজায়। রুবি দত্ত শাল জড়িয়ে নেয়, রমেন বাসু ও বাকীরা গোল হয়ে, রণো একটু দূরে, বসে। গান শুরু হয়ে যায়—এসো এসো আমার ঘরে এসো / আমার ঘরে / বাহির হয়ে এসো……এসো ঢুকে পড়ো বাঁধ ভাঙা হু হু নোনাজল, ভিতশুদ্ধ কাঁপিয়ে দাও, উপড়ে ফেল বনস্থলী, চুরমার করে দাও এইসব মেকী নান্দনিকতা, ভাসিয়ে দাও সভ্যতার লাম্পট্য। নাভীমূলে তাকানোর সময় অশ্রুপাতের আয়োজনে সব জেনে নাও, জানিয়ে দাও। হিম পড়তে গান থামে। বেশ সন্ধ্যে। পাশেই সার্কাসের তাঁবু। চলো কিছুক্ষণ অন্তত। প্রায় ফাঁকা গ্যালারী। হ্যাজাক জ্বলা গরীব সার্কাস, দর্শকরাও। অপুষ্টিতে ভোগা দুটি অর্ধ উলঙ্গ মেয়ে মুখে রং মেখে নাচতে থাকে, ড্রামের তালে। দর্শকদের উল্লাস আসে। রিং মাস্টার, চোখ দুটি ঢোকা, হাড় বের করা চেহারা, চাবুক—যা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, সহ দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়। পশুর খেলা শুরু করতে পারে না। পায়ের কাছে বসে থাকা বৃদ্ধ আফিমপ্রাপ্ত বাঘটিও প্রায় তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। বাজনা ও নাচের লয় বাড়তে থাকে, দর্শকদের উল্লাসও। রমেন বাসুরা বেরিয়ে আসে। তাঁবু'র পিছনে গায়ে জামা মাত্র বালক উনুন ধরাচ্ছে এই শীতে। রণো এই প্রথম সার্কাস দেখে দুঃখ পেল। দুঃখের সার্কাস। আবার গান রমেন বাসুর কোয়ার্টারে। বাইরে খুব জ্যোৎস্না। যাকে বলে বাঘ জ্যোৎস্না। যে জ্যোৎস্নায় বাঘ বেরোয় তাকে বাঘ জ্যোৎস্না বলে—এ রকম বলা যায় আমাদের জীবনযাপনে বাঘের অবকাশ কোথায়। বাঘ আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু ঐ মানুষ-মানুষীরা চেয়েছিল—আসুক অন্তত একবার এসে দাঁড়াক ঐ ডোরাকাটা গতিময় বস্তুতা। না হয় একটু

আঁচড়, রক্ত, মৃত্যুভয়। অয়নের গীটার চঞ্চল হয়,,গম্ভীর গলায় জন্ চেন্‌ভার you fill up my senses/like a night in a forest/like a walk in the rain...আরও গান—ধরতে পারলে মনোবেড়ি আমি দিতাম পাখীর পায়—এইসব উল্লোল সঙ্গীতে গেলাস ভাঙে, বুককেসে মাংসের ঝোল, অসাবধানে পর্দায় আগুন লাগে এবং তা নেভানো হয়। আধপোড়া পর্দার পাশেই রুবি দত্ত, আশঙ্কা প্রকাশ "চুলে আগুন লেগে গেলে!" "হুঁঃ, এইজন্যেই ত বয়কাট্" রুবি দত্তর প্রত্যয়ীশ্বর, সঙ্গীতে এম. এ.। অতঃপর রমেন বাসু গেয়ে ওঠে—আমার আঁধার ভালো / আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে। "Darkness-টা তাহলে accept করলেন?" বাসুর প্রতি রণো বিজয়ীর ভঙ্গীতে। "এ বলে কি? তোমার বয়স কত হল হে! অ্যাঁ?" সবিস্ময়ে রণোর দিকে তাকিয়ে থাকে অধ্যাপক রমেন বাসু, ৫০। রণো ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডের ১ নম্বরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর উদ্দেশে।

১৫ বছর হ'ল বাতাস বারুদগন্ধহীন, যেহেতু ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল ও শান্তিকামী দেশ। বাঁ ট্যাকে আধুলি গুঁজে নিঃসাড়ে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। বস্তি ঘরের দাওয়ায় বসে তার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে আছে দুখাইয়ের বাপ; চটকলের বদলী শ্রমিক, এখন কাজ হারিয়ে বেকার। দুখাইয়ের মা বাবুর বাড়ীর ঠিকে ঝি। আর দুখাই প্রায় উলঙ্গ বালক এখন বাস স্ট্যাণ্ডের মোড়ে চায়ের দোকানে কাপ-ডিশ ধুচ্ছে। এ দেশের ২১০ লক্ষ শিশু শ্রমিকের একজন। এই হল ভারতবর্ষ—দারিদ্র আর অজ্ঞানতার দগদগে ঘা, মাছির মত শোষকদের খাদ্য হিসাবে···ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এরপর অন্ধময় অন্ধকার। আমাদের রাশিয়া নেই। আমেরিকা নেই। ডলার নেই। কেজিবি নেই। স্তালিন নেই। মাও নেই। চে গুয়েভারা নেই। টিনটিন নেই। বেতাল নেই। ভায়না নেই। ডেনকালির জঙ্গল, পিগমী ব্যাণ্ডর এ ই স ব কিছু নেই। "কি হবে এসব? আমি বুঝি না।" মেয়েটি বেঁকে বসে। "ঠিক আছে, বুঝতে হবে না" রণোর আশ্বাস। কবিতা হেগেল মার্কস মজুরী মুনাফা অ্যালিয়েনেশন ভ্যানগঘ পিকাসো সেজান কাম্‌সার্ত্র মাও সামন্ততন্ত্র নকশালবাড়ী লুকাচ ফ্যানন মার্কুস দুয়েন্দে নাদার ক্ষত্রিক রুবিককিউব শব্দজব্দ—এদের একটিও না বোঝার জন্য তোমাকে সম্বর্ধনা দেব আমরা। "কবে তুমি আসিবে বলো তো?" খোলাখুলি প্রশ্ন রাখে রণো। পতনের আগে চূড়ান্ত উত্থান হয় মেয়েটির "শুধু এই? এই জন্যেই ভোরবেলা শিছু ডেকেছিলে? পোষ্টার হাতে হেঁটে গিয়েছিলে দেওয়ালের

দিকে ? ত্রিশিরা কাঁচ ধরেছিলে রোদে ?"[৩] বলতে বলতে দেওয়াল থেকে নামিয়ে আনে শঙ্কর মাছের চাবুক, গতবছর পুরী থেকে তাদের পারিবারিক সমুদ্রস্নাতি। "চাবুকে ঠিক করে দিতে হয়" কশা হাতে উদ্যত নারী। ভোররাতে সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে সারি সারি জেলে নৌকো। ভূলগর্ভে ফিরে আসছে হাজার হাজার উদ্ধত লাল কাঁকড়া। "হ্যাঁ মাঝে মাঝে তাই করা দরকার" এই কথার সামনে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, ধবল অ্যাম্বুলেন্স টহল দিয়ে ফেরে আর্তের সন্ধানে। অই নারীর তাবৎ কান্নার বিরুদ্ধে রণো হেঁটে যায় লেনিন সরণী দিয়ে এস্‌প্ল্যানেড ইস্টের দিকে। মিছিলটা বেশ বড়ো হয়েছে। কেউ স্লোগান দিচ্ছে চারপাশ কাঁপিয়ে। রণোও গলা মেলায়। মিছিল। চলতে। থাকে। এস্‌প্ল্যানেড ইস্টের। জমায়েতের। দিকে। আবার। কবে। মিছিল। হবে। সেটা। ঠিক। করবার। জন্য।

"খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করা দরকার—দু এক দিনের মধ্যেই—" পুরু কাঁচের পিছনে ডাক্তারের চোখ ফেটে যায়নি, যেন যে কোন সময়ে যাবে।

ডাক্তার যা বলে না তা হোলো, তা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচবে না। ডাক্তারের দৃষ্টির এই সরলার্থ রণো পেয়েছিলো। "আজকেই ভর্তি হয়ে যাও।" এই বলে তাকে হাসপাতালে রেখে আসা হয়। তুমি বাঁচবে না। এভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে গুলি করে মারা উচিৎ তোমাকে। না হয় মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে সমবেত 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাওয়া হবে—'জাগো অনশনবন্দী ওঠোরে'—দারুণ, অন্তত জমকালো একটি মৃত্যু। স্মৃতি চারণ হবে না। রণো পরাজয়কে মেনে নেয়। এও তো এক প্রাপ্তি যার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বিজয়ী। পরাজয়ের উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে রণো বলে ওঠে "পৃথিবীর তাবৎ বিজিতরা উঠে দাঁড়াও, তুলে ধরো তোমাদের পরাজয়ের পানপাত্র।" এরপর যা মানাতো হাতের শিরা কেটে ফেলা, আগেই বলা হয়েছে যা অনুমানমাত্র, ছেলেটি তাই করতে গিয়েছিলো, পারেনি। বেমানান রয়ে গেল। এই চিরকালীন রিলে রেস—একটি মৃত্যু বিজয়দণ্ড তুলে দিচ্ছে জীবনের হাতে এবং জীবন তা ফিরিয়ে দিচ্ছে পরবর্তী মৃত্যুকে। আলো থাকায় রণোর ছায়া এখনও পড়ছে ঘামে, তবে তা সূর্যের নয়, নিয়নের। শববাহকেরা রওনা হয়ে যায়। রণো অন্যদিকে।

---

৩. আলট্রা লাভ, থেকে ইনফ্রা লিবিডো—এই ভুল পরিক্রমণ।

আত্মহত্যা আর উন্মত্ততা এ দুয়ের মাঝে সমদূরত্ব বজায় রেখে লেনিন সরণী দিয়ে প্রাণপণে হেঁটে যায় পরাজিত যুবা, রণো।

উপসংহারে অত্যন্ত মামুষ, যারা ভাবছে সব সময় কিছু না কিছু শুরু বা শেষ হচ্ছে। সিনেমা যেমন। অথচ ওই ভাবে কিছু শেষ হয় না। হয়না শুরুও। যাহোক—উপসংহারে রাখা হোলো খরা, মৃত্যু, খিদে, বন্দুক। এত সবের পরেও রাত শেষের প্রত্যাশিত লাল সূর্যটিকে ওঠানো গেল না। দ্বিপ্রহরে ওন্দায় দেখা—বাঁকুড়া পুড়ে যাচ্ছে ধূ ধূ। খরায়। মাটি কেটে চৌচির। নজরখানায় নারী-পুরুষের হুড়োহুড়ি। এরই আড়ালে কালো কালো মানুষদের ভাবনা নীতিশীল হয়। শ্রেণী হিংসায় ঘুম ভাঙে। গড়ের মাঠে শেষরাতে জীপের দাঁত ঘষটানি। তাকে হেঁটে যেতে বলা হয়েছিলো। সে বুঝেছিলো এইভাবে মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাওয়া বরং দৌড়েছিল কি? ৫ই আগষ্ট ১৯৭১। বাতাসে বুলেটের শিস্। একটু পরে গঙ্গার পারে লাফিয়ে ওঠে সূর্য। নরম রোদে দৃশ্যমান হয় আততায়ী জীপ, টুপিপরা কয়েকটা মানুষের মাথা, আইনি বন্দুক, ধূমায়িত চায়ের ভাঁড়, হাতে তৃপ্তির সিগারেট, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার রম্যপ্রস্তুতি চলতে থাকে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় মৃত্যু চেয়েছিলো। মৃত্যুই যাদের বাঁচিয়ে রাখে বহুকাল। গৌরবময়। উপসংহার। তাও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। এরপর যা বাকী থাকে তা হোলো: দুধাই হে, তবু তোমার কথা লিখতে হয়।

জগন্নাথ ঘোষ

মোরগ লড়াই

আকাশে ঘোর মেঘ জমেছে। মেঘ দেখে রতন একটু থমকে দাঁড়ায়। খুঁটার আধারে সাঁড়াটুকু চেপে ধরে ও ফের পুটুশের ঝোপ ভাঙতে থাকে। এদিকে পিয়াশালের জঙ্গল কেটে মাহাত বৃন্দাবনরাও দলে দলে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ দুয়ার বাবার পরব। স্কুল প্রাঙ্গণের পিছনে পারাং নদীর পশার ধরে যে বিস্তীর্ণ লালডাঙা তার মাইলটাক জুড়ে সেরা মোরগ লড়াই। সময় কিন্তু, ভুতা মাহাতোদের বগলে যে নিস্পৃহ নরম পালকে মোড়া সাঁড়া গুলান, কারো ভাগ্যে মরণ তো কারো আঙুলের আলতো খোঁচায় পাত্‌রাজুড়ি, ডাংমারিতে তুমুল হট্টগোল। রতন এদের যম বটে। গদাপিয়ার রতনের মত কতক সেরা লড়িয়ে জোটে এসে বারোই মাঘ, বনারডাঙা ইস্তক। সেরাইকেলার বাসদেব, সুইসার লখাই টুডু আর ঘাঘরা সাঁইয়ের সমলাল ছ-সাত মাসের কঠিন পরীক্ষায় আজ এক কদম পিছু হঠবার নয় কেউ ঘরের সাঁড়া বাজি লিঁলে আপসোস নাই, কিন্তুক কতক অপর সাঁড়া জিইতল্যা মন করে লড়াই তেজ হ'ল—এ লড়াইয়ের প্রচলিত ধারণা।

লড়াইতে যাবার আগে রতনের বরাবরের টেনশান। পুটুশের ফোকর গলে কার্তিক পিছে এসে জোটে একসময়। ও বিলক্ষণ জানে রতন পথ হাঁটতে এখন মুখ খুলবে না, তবু শুনতে পায় এমনি করেই বলা—তুমার সাঁড়া টুকু অবর হল হঁ। সিমুলডাঙার ভরত ওক্ উদিন বইলছিল, ইবারও দুয়ার সিংয়ের বাজি রতনই লিঁবো। রতনের মুখে হাসি চল্‌কায় এবারে। খুঁটার আঁধারে ভাতলাগা পাখিটাকে একটুকু চেপে ধরতেই কঁকর-কঁর-কঁর আওয়াজ ওঠে কোচড় থেকে। এমন ডাক শুভ কিনা রতনের ভাবনা।

বাদাড় ঝোপ কাবার ক'রে সটান পথ। এই পথে জনকপুর, ঘাঘরাসোল, নতুনডিহির পরিচিত লড়িয়ের মুখের উপর পড়ে যায় রতন। এরা সকলেই আজ মুখোমুখি লড়িয়ে। পথ কাটতি কথা হচ্ছিল কবে ভীমপুরের লড়াইয়ে গদাই

কাহন রতনের ভূতা সাঁড়াকে এক স্থঁড়ে চুপসে দিল। সিইটা দেইকবার পারা লড়াই হ। এক স্থঁড়ে বাজি জেতা কথন সথন। তায় রতনের 'ঘড়া' সমান পাখিটুকু প্রতিপক্ষের এক ছুপলে চোখের পুতুল দুটো স্থির রেখে দুফালা হ'ল। হাজার মানুষের ভীড়ে রতনের চোখ দুটো কেমন আঁধার হ'ল। লড়াই কমিটির চটের তলায় ও যখন চোখ চাইল ভীমপুরে মেলা ছুট হ'য়ে গেছে। এখন সব বেইজ্জতের ঘটনায় ভেতরটা এখনও কেমন টিপ টিপ কাঁপে ওর। একটা লড়াই মানে সে সারা জন্মের মেহনত।

পথে পথে খবরটা রটল। চড়িগ্রার বুধাই সরেন রতনকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। রতনের সাঁড়াকে ইবার পুরুলিয়া লিঁয়ে যাব, দেখি কে ছুটায় হ। খবরটা রতন তক্ পৌঁছায়। বুকের মধ্যিখানটা কেমন মোচড় দেয় ওর। সাথে সাথে সেই পুরনো রোখটাও বাড়তে থাকে। এই চ্যাম্নাটা একদিন চুয়াটাকে ছুটাই লিঁল ঘর খসায়ে। সেই ক্ষত আজ চার বছরেও শুকোয়নি। আজ এই লড়াইটাও যদি হাতছাড়া হয় তো, বুধাইয়ের ঠেকার তল পাবেক নাই। ঘরের শান্তি লুঠেছে এবারে অবলম্বনটাও নিতে চায়, কন্তু বড় মুতলবটা দিখ বটো অঁ রতন মনে মনে ফুঁসে ওঠে। উত্তেজনায় ওর মাথার শিরাটা কেমন টন টন করে।

বুকের চাদরে জড়ান সোনা ঝিঁঝরাটাকে একটুকু বুকে চেপে ধরে ও! চোখের সামনে যেন লড়াইয়ের বৃত্তটা ধরা দেয়। খয়েরি সোনাঝিঁঝরাটা ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে হাল্কা তুলোর মত গলা ফুলিয়ে আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বুধাইয়ের উপর। ঝকঝকে কাইতখানা বেয়ে পুঁইফলের মত গাঢ় রক্ত ঝরে পড়ছে। হাঁ, এই ঘন রক্তটুকুই আজ রতনের চাওয়া।

লড়াই পাখিটার মেজাজ তৈরী রাখতে গত কয়েক রাত জাগতে হয়েছে রতনকে। এখন চোখে আঁচ লাগে। একটা লড়াই পাখি তৈরী করার কৌশল, প্রশিক্ষণের কায়দা কানুন রতনের আয়ত্তে, তো ভূতনাথরা পারবে কেন, মুখে মুখে এই কথাই ফিরছিল। প্রথম যখন এই ছানাটুকু নিয়ে এল পিড়াকাটার হাট থেকে যেন এক গড়ানো টেনিস বল। তখন থেকেই রতনের মনে দৃঢ় প্রত্যয়, এই সোনাঝিঁঝরা তাকে সেরা বাজি এনে দেবে। পাখিটা দেবার আগে জগত ওকে তিন হাট ঘুরাল। কাটনি সাঁড়া বড় মিলে নাই, যখন বুইলছা গাঁ খিক্যা ঢুঁড়ে লিঁব। জগত জানে রতনের পাখির বিচার বড় কঠিন, সাঁড়াটার মাথায় চাই লাল মুকুট, পায়ের নখ গুলান লবঙ্গ ফুল, চোখ জোড়া লাল পুঁতির মধ্যে কালো

রেখা। সবই হল। শুধু দামটা একটু মেগেই নিল জগত। ইমন মুলক্ষণ পাখি ভাগ্যে মেলে। রতনের ট্রেনিং পেয়ে পাখিটা লড়াই পাগল হয়ে উঠল। এমনকি নিজের ছায়া দেখলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বড় পাখিকে দেখলেও ও ঘুরে দাঁড়াত আক্রমণ হানতে। এমন লড়াকু পাখিই চেয়েছিল রতন। সে ঝিঁঝরাটার মুখের কাছে এগিয়ে দেয় মালকাঁকড়ার ডিম, মেঠো ঘুর ঘুরা, গরম ফর্সা চালের ভাত। বরং চুন্নার পেটে এক মুঠো লাপসি ভাত যোগাতে পারেনি সে তবু মুখে কোন রা ছিল না মেয়েটার। সে জানত রতন মানুষটা কত বড় লড়িয়ে। শুধু লড়াইয়ে যাবার আগে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতো চুন্না। শাঁখের মত নীর্ণ মুখখানা কানের কাছে রেখে ফিস ফিস বলত, তুমি এক মুঁড়ে বাজি লিঁলে সমসারে টুকু সুক হয়। একটুকুন ভেড়া, খাসি ত বড় কম লয় গঁ। বছর চায় আগের সেসব দিন! একখণ্ড ছেঁড়া কানিতে সমস্ত শরীরটা শাসনে রেখে সে চৌকাঠে এসে দাঁড়াত। রতনের চোখ জোড়া ছটফটাত চুন্নার শরীরের ঐ ঘন বাঁকগুলির উপর। চুন্নার শরম লাগতো ভারি। আঁচলের খুটটা কামড়ে ধরে অস্ফুট উচ্চারণ করত—ভাকু, চক দিয়ে গিইলছো কিমন বটো। লড়াই যাবার আগে লজরের পাপ মরে নাই। সেই চুন্না পরে পাল্টে গিয়েছিল চের। রতনের উপর্যুপরি জয়ই বুঝি ওর আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছিল। এমন একটা সময় এসেছিল যখন একটা বাজি জেতা মানে রতনের জীবন যুদ্ধের এক একটা বাঁক পেরিয়ে আসা। হার মানে চুন্নার অহঙ্কারের চুরমার ভাঙন। এই টেনশানের মধ্যে দিয়ে রতন ক্রমান্বয়ে হারের মুখে পড়ে গেল। ওর সমস্ত হিসাব বানচাল করে পাখিগুলি বুক কালা করে লড়াই গণ্ডিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। পরাজয়ের গ্লানিতে চুন্না যেন কালসাপ হয়ে উঠেছিল। একদিন সে বলতে শিখল—হারমানা মরদ চ্যামনা সাঁপ পারা মনে লয়। অমন মরদকে ঘিন্না হয় থুঃ। সে সব বড় শরমের বৃত্তান্ত।

শালডিহির বাঁকটা পেরতেই মেলার হট্টগোল স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। মোরগের একটানা ডাকে বনভূমি সচকিত। মানুষের পায়ের আঁচড়ে গেরুয়া মাটি উড়ে বেড়াচ্ছে। কড়া মদের গন্ধ মানুষের মুখে, মোরগের পেটেও কতক! বুড়া যুধিষ্ঠির ছোকরাদের এই অনাচার সইতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—ছানাগুলার কিরূপ বিবেচনা বাপু, লড়াই মুখি সাঁড়াকে কতক মউল খাওয়ালি হুঁ। মানুষের একটা জটলা আকাশমনির নিচের ঢের হ'য়ে বসেছিল। ওদের মধ্যে প্রহ্লাদের মেজাজে কথাটা ধাক্কা মারতেই ও তেড়ে ফুঁড়ে উঠল—বুড়াটা, এই পেল্লাদের

কথা টুকুন ভাল ক'রে বুঝ। আমার কাটনি সাঁড়া জিরন্ত থাইকতে মেলায় খাঁলি অপর কেহ ছিনাতে পারবেক নাই। এই মদো মাতালটার কথাটুকুন মিলাই লিব্যা হ। যুধিষ্টির গাঁয়ের মুখিন না হলেও পাঁচজন মুরুব্বির একজন। বয়সের জন্যেই ওর কথার একটা ওজন আছে। কিন্তু পরব উৎসবের দিনে কেউ কারো বশে নেই। হঁ হঁ ঝিমান সাঁড়া উয়াঁকে রাজা কর াই দিবো—যুধিষ্টির বকতে বকতে এগিয়ে যায়।

বিস্তীর্ণ রনারডাঙায় মেঘ ফাটা হলুদ রোদ ছড়িয়ে পড়লেও ঠাণ্ডা হাওয়া চামড়ার মধ্যে যেন বরফের পেরেক ঠুকে দিচ্ছে। এখান থেকে দুয়ার বাবার পাহাড়খানা হাতের নাগালে। পাহাড়ের ওপিঠে মাইলটাক উধর জমি পেরলে করম গামারের জঙ্গল হাত্তিমারি। এরই মাঝে গোটা কয় মহালি গাঁ। এই পরবের ক'টা দিন অঞ্চলটা জেগে ওঠে যেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে শুধু মানুষের স্রোত উপরে উঠছে। বাবার থানে মোরগ কাণ্ডির গরম রক্তে মানত চড়িয়ে ফের নেমে আসছে মেলার ভীড়ে। রতন মেলার আকর্ষণ পেরিয়ে লড়াই মাঠের দিকে এগিয়ে যেতে কার্তিকের মুখে পড়ে যায়। কার্তিক বলে, বুধাই বড় কঠিন সাঁড়া আইনছ্যা, সুধায় রতন কুথা। উয়াকে টুকুন রেয়াত কইরব। কথাটায় বিলক্ষণ হুল আছে মনে করে রতন দাঁড়িয়ে পড়ে। চুপি চুপি শুধায়—বুধাটার সাঁড়াটুকুন দেইকছ্য বটো? কার্তিক মাথা ঝাঁকায় দিখাবে নাই, খুঁটায় বাঁন্‌ধা। কথার মাঝেই জনা কয় সাঙ্গাৎ নিয়ে বুধাই এসে দাঁড়াতেই রতন তাচ্ছিল্য ভরে কথাগুলি ঠেলে দেয়—তুমার সাঁড়া টুকুন কিমন লড়াই পাগল ইয়েনছ্যা। রতনের কথায় খোঁচাটা টের পেয়ে বুধাই পাল্টা দেয়—উয়ার শিক্ষণ ও তুমার সাঁড়া ব্যতিরেকে অপর কাহাকে দিখাবে নাই। এই কথাটার উত্তর রতনের বিবেক স্পর্শ ক'রেই যেন বেরিয়ে এল—ভক্কাটার আপন পাখিটুকুন ঘর খসায়ে লিইছ। অই হিসাবটুকুন আজ বুঝাব, অই কথা দুয়ার থানে রাখলাম হঁ। রতন ফুঁসতে ফুঁসতে লড়াই কমিটির দিকে সরে যায়।

রতন ভক্কার মোরগটা মাথায় লাল টাঙ্গির ফলা আর শরীর ময় উজ্জ্বলতা নিয়ে বৃত্তের মাঝে দাঁড়াতেই ও টের পেল তার পক্ষে দর্শক আজ কম নাই। কে একজন ভীড়ের মধ্যে থেকে আওয়াজ ছুঁড়ল—অটা সাঁড়া লয়ত কাঁড়ার বটো। কথাটাকে ধরে খুব খানিক হল্লোড় হয়। আর এমন সব ফুটকারির মাঝে কাইত-কারের হাতছুট হয়ে বৃত্তে ঢুকে পড়ল এক কালো চ্যাঙা ছটফটে মোরগ। ছিট

কালো এই ভুতাটার গলাটা লম্বা সরু। পা দুটিও শরীর অনুপাতে যথেষ্ট লম্বা। এমন এক বেঢপ পাখি দেখে দর্শকের মধ্যে থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু হল বুধাইয়ের উদ্দেশে। বুধাইয়ের পাখিটার পায়ে খুব কায়দা করে কাইতখানা বেঁধে দিল খান্দু। খানিক ধুলো ছিটা দিয়ে পাখিটাকে সে চনমনে করে তুলল। লড়াই মাঠে পাখির মেজাজ চড়াতে খান্দুর চেয়ে বড় ওস্তাদ এ তল্লাটে বিরল। বুধাই এক সময় ওর কানের কাছে ফিসফাস করে গেছে। দর্শকরা চায় সিধা লড়াই দেখতে। ওদের মধ্যে উত্তেজনা এখন কানায় কানায়। কে একজন ভীড় থেকে চেঁচিয়ে বল্ল, কন তুকতাক লয়, সটান লড়াই মিলাও। সকলেই একথায় গলা মিলাল—হঁ, হঁ বাঘের লড়াই দিখবক বটো। রতনের সোনা ঝিঁঝরা মাথায় তীব্র রাগের জ্বালা নিয়ে বৃত্তের মাঝ বরাবর ছুটে এল। কালো ভুতাটা তখনও নখের আঁচড়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মেজাজে শান দিচ্ছে। এক সময় দুটি পাখি মুখোমুখি হল। ঝিঁঝরার পাখায় উড়ান আছে, পায়ে গতি আছে ঢের, দম আর শক্তিও কম নেই। ভুতার সম্বল উপস্থিত বুদ্ধিটুকু। তাই বাজির টাকা ঝিঁঝরার উপরেই বেশি উড়ছে। শুরুতেই কয়েকটি আক্রমণ গড়তে গড়তে কেটে গেল। এক সময় রতনের পাখিটা শরীর ফুলিয়ে চকিতে আক্রমণ হেনে বসল। অবধারিত মৃত্যু মাখানো ষ্টিলের ঝকঝকে ছুরিখানা ভুতার পালকে মোড়া বুকখানা ছুঁয়ে ফেলেছে। কয়েক পল তফাতে মাত্র একটি মৃত্যুর ছোবল, এগিয়ে আসছে। হাজার মানুষের উত্তেজনায় বৃত্তের গড়ন ভাংচুর হ'য়ে গেল। জয়ের উল্লাসে টামাকে আছড়ে পড়েছে করমের ভারি ডাল। ভুতা শরীরখানা ছোট্ট একটু মোচড়ে কাইতের মুখ থেকে সরিয়ে এনেই প্রতি আক্রমণ করে বসেছে নিমেষে। এক সূক্ষ্ম সুতোর হিসাব নিকাশ। ঝিঁঝরার পা দুটো তখন নিজের আয়ত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ঝিঁঝরার সামনে তখন ক্ষিপ্রগতির কালো ভুতাটা আর পেটের কাছে লম্বার আরকে ভেজান ঝকঝকে কাইতখানা, যা একটি মুহূর্তের মধ্যে ওর মাংসল বুকে গেঁথে গেল। শরীরে দাউ দাউ রক্তের মশাল নিয়ে বৃত্ত ভেঙে উড়ে যাবার মুখেই রতন নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পাখিটার উপরে। ওর হিংস্র থাবার মধ্যে আহত অবসন্ন পাখিটা থির থির কাঁপছে তখনও। মুহূর্তের মধ্যে ও সোনা ঝিঁঝরার গলাটা দুহাতে ধরে রবারের মত টেনে ছিঁড়ে ফেল্ল। রক্ত আর পালকের টুকরো ফেনার মত বাতাসে উড়ে ছড়িয়ে পড়ল। পাখিটার ঠোঁট চোয়ানো গাঢ় রক্তে রতনের পায়ের থাবা দুটো ভরে উঠল নিজেরই অলক্ষ্যে।

এমন সব ঘটনা ঘটল চোখের পলকে। একটা বাজি ওলট পালট হ'ল। মানুষের মুখে রা নেই। কার্তিকদের ভাউটিয়ার বিস্ময়ের ফুঁ পড়ল না। গঙ্গাপিয়া গাঁয়ের পাচটা তামাক না-কাটা হ'য়ে ফিরে গেল। লড়াই কমিটির খাসিটা রতনের পায়ের কাছেই খানিক ঘাস পাতা খুঁটে খেয়ে পিটিশের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেছে। রতনের চোখের পুতুলটায় ওর সোনা ঝিঁঝরার ছেঁড়া গলাটা, টুকরো শরীর আর তার পায়ের ছটফটানি স্পষ্ট দেখা যায়। খান্দুর তবু কথাটা বলার প্রয়োজন ছিল খুব। সে এগিয়ে এল রতনের পাথর-মূর্তির নামনে, অটা না বুইলল্যা আমার পাপ মইরবেক নাই রতন, খান্দুর গলায় স্পষ্ট ক্ষোভ। তুমার কাইতের মুখটুকুন আমি ফিরায়ে দিলাম হ। রতন যেন চাবুক খেয়ে কেঁপে উঠল। দর্শক যারা ফিরে যাচ্ছিল সকলেই কৌতূহল নিয়ে ফিরে আসছে। ওদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। খান্দু বলে চলে, বুধাই কুসকুসাল রতনের পাখিটা বিয়াদপ হলো উয়ার কাইত বাঁনধা করবি। আমি ভাবলাম সনা ঝিঁঝরা জিয়ন্ত থাকলে বুধাটার হার বিলক্ষণ, আমার বেইজ্জত। আমি তুমার পাখির কাইতে ধুলা ছিটায়ে মুখ বাঁধলাম। খান্দুর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ যেন রতনের রোমকূপে আগুন ছড়িয়ে দিল। রোষে ওর চোখ দুটি রক্ত হ'য়ে উঠেছে ক্রমে। হঠাৎ এক হুংকার ছেড়ে বুধাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। অপ্রস্তুত বুধাই সব কিছু বুঝে ওঠবার আগেই রতন ওর গলাটা চেপে ধরে এক ঝটকায় মাটিতে পেড়ে ফেল—বল্ দুয়ার বাবার সামনে তর পাপের বিস্তান্ত কবলা কর চ্যামনাটা। বুধাইয়ের গলার চারপাশে যতই সে আঙুলের দশটা শিকড় গেঁথে দেয় দর্শকরা ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর বুধাইয়ের অস্তিত্ব এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঝাঁক নিতে থাকে। যুধিষ্ঠির বুড়া ভিড় ঠেলে রতনের সামনে এসে দাঁড়ায়—শুন রতন, দুয়ার বাবার থানে সাঁড়া ব্যতিরেকে অপর কন লড়াই হবার লয়। শত বৎসরের পরবে ইমন অনাচার হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব মাখানো কণ্ঠস্বরে দর্শকরা নীরব। যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বর আরো কঠোর হয় এবারে—তুই বুধাইকে ছাড়। মানষের রক্ত দুয়ার বাবা মাগে নাই। সাঁড়া ভেন্ন অপর কাহারও রক্ত ছুটালে এই পরবটুকুন মিথ্যা হইয়েন যাবেক। যুধিষ্ঠিরের কথায় কাজ হল। বুধাইয়ের বিপর্যস্ত শরীর থেকে রতন উঠে এল ধীরে ধীরে। অবিন্যস্ত চুলের গোছায় আঙুল চালিয়ে দিয়ে, দুয়ার থানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কী খানিক বকল আপন মনে, তারপর লড়াই গণ্ডি পেরিয়ে টলতে টলতে উত্তরের ঐ জঙ্গলের দিকে ফিরে গেল।

শালডিহির জঙ্গল ধীরে মঞ্চের আসর। মাটির কলস আর জারকিন ঘিরে আদিবাসীরা ঢের হ'য়ে আছে। কাঁচা শালপাতায় চুমুকে চুমুকে নেশার জল চালান হ'য়ে যাচ্ছে পেটে। রতন পর পর দুটো বোতল গলায় ঢেলে দিয়ে ঝিম মেরে গেল। মউল কুটা মেয়েটা সেদ্ধ কাবুল দানা আর পাতার উপর লবণ লঙ্কা রেখে গেছে। রতন খুব অলস ভঙ্গিতে কাবুলদানাগুলি চিবুতে চিবুতে একটু আগের ঘটনাগুলি ওর সামনে এসে হাজির হতে থাকে। এই পরাজয় যেন বাঁচার সমস্ত প্রেরণাই ওর মন থেকে মুছে দিয়ে গেছে। বছর চার আগের একটি দিন রতনের মনে পড়ে যায়। সেদিনও বেঁচে থাকা তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। শুধু এই লড়াইটুকুই ওকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল সেদিন। আজ এইটুকুও যদি শেষ হ'য়ে যায় তো সে বাঁচবে কী নিয়ে।

এই সকল চিন্তার মধ্যে পিছন থেকে কে তার নাম ধরে ডাকে—রতন বটো কি না? ও চমকে ফিরে দেখে চুয়া সন্ত্রস্ত পায়ে ওরই দিকে ফিরে আসছে। হতবাক্ রতন চুয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে সে একজন কাছের মানুষকে চাইছিল ঠিকই যে তার পরাজয়ের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতে পারে। সে অপর যে কেউ হতে পারে অবশ্যই চুয়া নয়। চুয়া রতনের সামনে এসে দাঁড়ায়—আমি তুমাকে সারা মেলাটা ঢুঁড়া করলাম···। রতন সন্দিগ্ধ চোখে দেখে ওকে, কি মুতলবটা? চুয়া গভীর আগ্রহ নিয়ে বলে—অনেকগুলান কথা ঢের করা আছে বুকটায়, তুমাকে বলা করতে আইসলাম। রতন কথাটা তেমন গ্রাহ্য করে না। গত চার বছরে তো তার মনেও অনেক কথার পাহাড় জমে উঠেছিল। অনেক ঝড়, বিষাদ, ক্লান্তি এ সকলের মালিকানা তার নিজেরই ছিল। এমন কি উচ্চাভিলাষী চুয়া যেদিন ওর সমস্ত অনুরোধ দলিত করে সংসার ভেঙ্গে দিল, সেদিনও সব দুঃখ, শূন্যতার মুখোমুখি তো সে একাই হয়েছে। সুতরাং আজ আর চুয়ার মনে জমে থাকা কথার প্রতি ওর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। কী প্রয়োজন সেই পুরনো খেলায় সামিল হওয়া। রতন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটু টলে ওঠে, নাঃ অনেক বেশী হল চুয়া। অনেক কষ্টের দিন পেরাল তুমি ফিরলে নাই। আজ হারা রতনটা যে চ্যামনা সাঁপ পায়া, কন কষ্মের লয়। উয়াকে তুমি একেবারে ছাড়। রতন সামনে এগিয়ে গেল দ্রুত গতিতে।

চুয়া তার পিছু নেয়—ওটা ত তুমার সখের হার রতন! তুমি জিতে লিতে

চাও নাই এই চুয়াটাকে, অখনই। এই একটি কথায় রতনের মনের মধ্যে কেমন ভাংচুর হ'য়ে গেল। বুকের মধ্যেটা ওর দ্রুত ওঠা নামা করে। 'জানি নাই' এই কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই রতন জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে শালডি জঙ্গলের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চুয়া বাঁকটার মুখে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। রতনের মনেও বুঝি কিছুটা ছোপ ধরল সেই কান্নার। চুয়ার শরীর উপছানো সেই পুরনো কুসুম তেলের গন্ধটা রতনের আজ ভালো লাগে। ও টের পায় ভেতরে ভেতরে একটা লড়াই সুরু হ'য়ে গেছে তার। আর একটা সাঁড়া লড়াই।

আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নতুবা অন্য কাগজ যখন দু-চার দশ সংখ্যা যেতে না যেতে মুখ থুবরে পড়ে তখন কৌরব কেন, ৪৯। ফলে আপনাদের একটা দায়িত্ব দেওয়া হোল, যা প্রাণ চায় ভাল-মন্দ মান-অভিমান নিষ্ঠুরতা জানান। কৌরবের থাকা না থাকার ব্যাপার। কৌরব কতটা আপনাদের কাছের বা দূরের ছিল। কতটা সাহিত্যের, কতটা নতুনের, কতটা পরীক্ষার, আর কতটাই বা অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক দুর্মূল্যের বাজারে কাগজ কালি নষ্ট করে গেছে।

কমলকুমার মজুমদার থেকে যোগেন চৌধুরী অবধি বহুখ্যাত,
অখ্যাত, শিল্পচোর, সাহিত্যিকদের আঁকা অসংখ্য ড্রইং ;

দেশ আনন্দবাজার যুগান্তর থেকে সত্যযুগ অবধি
মায় সদ্যোজাত বহু কাগজের যোগদান ;

ডি. কে. পুরস্কার মানপত্র, টিভি কভারেজ, সাহিত্যের শ্লীলতাহানির
দায়ে কৌরব-দাহন প্রভৃতির ডকুমেণ্টারী ফটো ;

গুণমুগ্ধ, হিতৈষী, নিন্দুকের আড়াইফর্মা ঠাসা চিঠি ;

বহু বিখ্যাত, অখ্যাত, কুখ্যাত মানুষের উপস্থিতি ;

এবং কিকরে পঞ্চাশ তার রম্য ইতিহাস—

A Handbook of Little Magazine Craft

কৌরব ৫০

৩৫০—৪০০ পৃষ্ঠা নেট

এই আকর গ্রন্থটির মূল্য মাত্র ১৫·০০ (এখন)

আজই আপনার নাম ঠিকানা এবং ১৫·০০ দিয়ে বুকড্ করুন

৫০·০০ টাকা মূল্যের এই বৃহৎ বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থটি
অবশ্যই 'আগে এসো আগে পাও' ভিত্তিতে দেওয়া হবে।
সাবসিডাইজড্ মূল্য সময় সীমিত।

বারীন ঘোষাল

রূপ অরূপ

শুয়ে আছি বরফের মধ্যে বরফ হয়ে। গরম বরফ। একথা সে বলতে চায় যার শীত করত জ্যৈষ্ঠেও। সোয়েটার কম্বল চাপিয়ে তার শীত যেতনা। ঘাম হতনা। সে ঋতু চেনেনা, পৃথিবী চেনেনা, সে তার ভেতরটা নিয়ে ব্যস্ত। চির-শীতল শান্ত অথচ আলোহীন যে ব্যাপ্তির কথা তাকে বলা হয়েছিল, যে নতুন বিশ্বের রূপকথা, থাকা না থাকার তফাৎ ঘোচানো রহস্যের কথা—এসব নিয়ে বুঁদ হয়ে গেল অনসূয়া। ভাবিনি সে বুঝবে সেই কথা যা আমি নিজেই বুঝিনা। বরফ আর তিনশ ডিগ্রীর চুল্লির মাঝে তিনশ পা হেঁটে যেতে যেতে ভাবি যে বিশাল শূন্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করা কাকে বলে যা অনসূয়া করল অবলীলায়।

অবেলার আলোয় চামর দোলাচ্ছে চুলগুলো। লীন জলবাহ। আর স্বচ্ছ আস্তরণ থেকে বেরোচ্ছে বাষ্প। জলের চশমা পরে অনিমেষ বলে ওঠে—'না দেখলে বিশ্বাস করতুমনা, জল জমে জমে রূপ খুলে যায়।'

থেমে বলি কাঁধে হাত রেখে, ঝুঁকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে। জলের ভেতর চাপে টান টান চামড়া। চিকণ হয়েছে। সেই জল বসেছে বরফে। বলি—

কামনা নামের ট্যাক্সিটি ছিনতাই হয়ে গেল। এয়ার কণ্ডিশন থেকে বেরোলে বহুক্ষণ একটা ভেজা ভাব বসে থাকে চামড়ায়। খোকন বলে,—'চল মহুয়া খাই, শীত করছে।' তখন জ্যৈষ্ঠ। ভীড়ের মধ্যে অনসূয়া শুয়ে ছিল এক আই আর ছাড়া, বীমা ছাড়া। কেউ চলে গেলে মানুষ না, প্রকৃতি না কালের কথা ভাবো। বলি—

ভদ্র লোকের শোক। বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির কথা ভাবি, ট্যাক্সি চেপে প্লেনের কথা। কামনা নামে ট্যাক্সি একটা আমার ছিল, একথা বললে ভুল হবে। তবে ওরকম একটা ট্যাক্সি আমি চাপতুম, যে আমার কথা শুনতই না। নিজের বলে ভাবতে ভাল লাগলেও নানা সন্দেহে শুধুমাত্র ব্যবহারের বেশী দাবী করতে

পারিনি। বরং তখন এ্যারোপ্লেনের কথা ভেবেছি। আর, ছিনতাই হবার কথা তো বিশ্বাসই করিনি। এর চেয়েও বড় কথা, আজ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আর একটা ট্যাক্সির জন্যই চেয়ে আছি। সোজা কথা বলা যাক, অন্য মেয়েদের কথাই ভাবছি। যারা ট্যাক্সি পছন্দ করে। যতরকম ব্যবস্থাই করা যাক, দুর্বল জায়গা-গুলোর মধ্যে একটা জায়গাতো দুর্বলতম, ছিনতাই হয়ে যায়। কে বা কেন, কিভাবে তার চেয়ে বড় কথা হল এর কোন সহানুভূতি হতে পারে না। লোকে আসে সান্ত্বনা দিতে। ওরা আগে এলে ছিনতাই প্রতিরোধ করা যেতো। বিশ্বাস করিনা। ওদের সান্ত্বনাকে বিশ্বাস করিনা।

একটা মাত্র ক্যাম্পখাট ঘরে। ঐ বিছানা। অন্য কোন প্রয়োজনও নেই। তবু দাবী আর লড়াই চালিয়ে যাবার উপকারিতা অনেক, বিশ্বাস বা প্রয়োজন নাই থাক। উপকার এই যে মানুষ ধীরে ধীরে নিঃস্বার্থ হয়ে পড়ে, আবেগে পাগল হয়ে ওঠে, যুক্তির বাইরে চলে যায়, মুক্ত হয়। শুয়ে শুয়ে ভাবি শুধু কমে যাবার কথা। তা নয়। আসলে অন্য সব কিছু বেড়ে যাচ্ছে বেদখল হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ আমার আর দুটো ঘর বেদখল হয়ে যায় বিছানা সুদ্ধ। কেমন করে সবাই জেনে যায় যে এর আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

অনসূয়া কি কি রেখে গেছে দেখার জন্য একটা ঘরের তালা খুলি।

দেখে অবাক হব এরকম মধু রঙের কার্পেট, বিছানার চাদর, ওয়ালপেপার, রুফ ডিসটেম্পার। মেঝে খাট আলমারি ফ্যান কিছু দেখা যাচ্ছেনা। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের নখের সাইজ পিঁপড়েরা ঠাসাঠাসি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরজার বাইরে দু-একটা বেরিয়ে আসতে বোঝা গেল। এই অনবরত পিঁপড়ে রাজ্য এখানে কেন তা ভাবাই বৃথা। আমি যেন সারফেসের অণুপরমাণুর ছোটাছুটি দেখতে পাচ্ছি হালকা হাওয়ায়, এবং আলো পড়ায় ব্যতিব্যস্ত ঈষৎ ঢেউ। একদিন ঐ বিছানায় শুতে হবে। ছটা ফুটোয় তুলো ঠুসে একটা আসবাবের মতো শুয়ে থাকবো প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত, প্রাণী বলে ওরা যদি টের না পায়। গা শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করলুম। জবরদখল ছড়িয়ে পড়ুক তা তো আর চাইনা।

অন্য ঘরে মাকড়সার বিস্তার। এও আবিষ্কার করতে হল। ঘরের বাইরেই

অনেকটা পাহাড়ি টিলা আর আধ মাইল জঙ্গল। জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মাকড়সা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। নানা পরিমাপের জাল তৈরি করে বসে আছে অগুণতি মাকড়সা। বিভিন্ন সাইজের। দেয়াল ছাদ, মেঝে, তাক, জানালা, আলমারি, ডিভান, আলনা, ওয়ালহ্যাঙ্গার, ফ্যান, লাইট, সমস্ত সম্ভব জায়গা থেকে জাল দেখা যাচ্ছে। এঘরটা পরিষ্কার করা সহজ মনে হল। একটা কাঠি নিয়ে চেষ্টাও করলুম একঘন্টা। দেখা গেল গড়ে আধঘন্টায় একটা মাকড়সা আবার জাল তৈরি করছে। হালকা, ইলাস্টিক, নরম, শক্ত, ছোট, বড়, নানারকম তৈরি হয়ে যাচ্ছে আবার। ঘামিয়ে উঠলুম, পর্যুদস্ত। তখন ভাবলুম, এ ঘরে আলো জ্বলেনা, দরজা জানালা খোলেনা, পোকা ইত্যাদি আসেনা, তাহলে মাকড়সাগুলো জাল বানিয়ে বসে আছে কার জন্য? ভয় ঢুকে গেল। লাফিয়ে বাইরে চলে এসে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

অনসূয়ার এতদিনকার ব্যবস্থাপনা এভাবে ওরা পাহারা দিচ্ছে কেন? আমার প্রবেশ অসাধ্য করে তুলতে কেন এই কারসাজি? ব্যাস। মাথায় ঢুকে গেল। আমাকে স্মৃতি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এসব ঘষার ঘসার আয়োজন আমাকে মেনে নিতে হবে?

এই দখলমুক্তির পরিকল্পনায় মদত দিতে ক্রমশঃ অস্বীকার করে থাকেন ১-এর বউ, থাকেন ২-এর বউ, অনিমেষের বোন, শিবানীর বোন, তার প্রেমিকা, তার স্বামীর প্রেমিকা। আমি সবার কাছে নিল ডাউন হতে হতে হাঁটুর চামড়া ছরিয়ে ফেলি। কেউ দয়া করেনা, অনসূয়া, কেউ দয়া করেনা। 'কেড়ে নাও'—বলতে চায়, বলেনা। দুটো দরজায় তালা মেরে চাবি এমন ভাবে ছুঁড়ে ফেলি যেন বহুদিন পর্যন্ত হারিয়ে থাকে।

কাগজ কলম খুলি। কিছুক্ষণ পরে একটা বিচিত্র উদ্ভাবন দেখতে পাই। প্রথমে লেখা

তুমি = YOU

তারপর— তুমি = Y

লেখা আছে, $Y = mc^2$

এরপরে একটা বর্তুল, ঘুরছে। আবার একটা হ্যালো, যিসাস-এর মাথার পেছনে যেরকম,—কে কেন্দ্র করে ঐ বর্তুল ওভালিনিয়র পথে ঘুরছে। তারপর,

ধরা যাক সূর্য্য, সোজা চলে যাচ্ছে একদিকে—এটাই হচ্ছে সময়ের দিক এবং মাপ। তাহলে বর্তুল বা পৃথিবী বা আমার ওস্তালিনিয়র পথটা কেবলই সরে যাচ্ছে একদিকে। ওই সময়ের দিকে। ভীষণ এক পাল্লা দেয়া আঁক এরপরে। আমি সময়কে মূল জমিতে রেখে এক সিমুসয়ডাল প্রবাহে চলে যাচ্ছি একদিকে কাঁপতে কাঁপতে। m তো আমিই, c তো আমারই গতি, Y হল আমারই নিয়তি হে। তুমি আমারই নিয়তি, তুমি আমারই নিয়তি তুমি আমারই—

এটা প্রমাণ করতে হবে, এটাই আমার অঙ্ক, যে—

ফুরিয়ার সিরিজ অনুযায়ী আমার কম্পন নিতে এলে যখন আমি মূল জমিতেই সোজা বিচরণ করব, আমার সূর্য্য কি তখন কম্পন সংগ্রহ করতে করতে আপেক্ষিক তাপ বজায় রাখবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? আমার প্রিয় পৃথিবী আমারই থাকবে তো?

দুধ জ্বাল দেওয়া বেশ কঠিন কাজ। ঠিক পাত্র বেছে নেওয়া বা উথলে ওঠার আগে ফিরে এসে—এ আমি কখনো পারিনি। প্রতিবার দুধ পোড়া গন্ধ আমাকে টেনেছে। উথলে ওঠাটা টেরই পাইনা। সবসময়ই রাগে বা আবেগে উথলে উঠতে দিয়েছি লোকজনকে। তুলনায় বরফের ওপর শুয়ে থাকা, বা বরফ হয়ে, তো ভীষণ কঠিন। নতুন এক রহস্যলোকে আমার বিহার শুরু হতে যাচ্ছে, এই স্বপ্ন বা রোমাঞ্চকে সম্বল করে কোন মৃত্যুপথযাত্রী সুখী বা আশ্বস্ত হয়না, সে অতীতের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলে, তার কষ্টবোধ নিজের জন্য না অন্য প্রিয়জনের জন্য তা বোঝা বেশ মুস্কিল। সে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে চায়। তখন তাকে কোন সাহস বা আস্থায় দেখা যাবেনা।

অথচ বড় কঠিন কাজ করে ফেলেছে অনুভূয়া স্বপ্নলোকের রোমাঞ্চে আবিষ্ট তার মুখ আর শরীরের চিকণ বড় সুখে সেই রূপের সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে স্বপ্ন আমারই আদিষ্ট। এরকম ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। মৃত্যুকে বিশ্বাস করা. স্বীকার করে শান্তি পাওয়া। এই ভীষণ বাস্তবে লীন হয়ে যাবার ভাবনা যে এত সুখকর হতে পারে—আমি কি পারব কখনো? ভাবতেও পারছিনা—রোমাঞ্চ হচ্ছে।

যেমন ডাক্তারের সাথে ওষুধের দোকানে সাট্ থাকে, তেমনই জ্যোতিষীর সাথে

গ্রহরত্ন ব্যবসায়ির সম্পর্ক থাকে। জ্যোতিষী 'অ'বাবু তর্করত্ন বলেন—

—'দূর মশাই আপনাকে কোন রত্ন ধারণ করতে হবেনা।' একথাটা আমার আস্থা বাড়ায়। তিনি বলেন,—'হাত দেখে বা কোষ্ঠী বিচার করে বোঝা যায় কে দুর্বলচিত্ত। এভাবে রত্নের খরিদ্দার কে চিনতে হয়। তারপর যত ইচ্ছা বেচে যাও।'

আমি শিউরে উঠে বলি—'সেকি, রত্ন কি তবে কোন কাজ করে না?'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'করে করে। একটা আশ্চর্য্য সম্পর্ক আছে। জয় গুরু জয় গুরু, তাইতো আমরা করে খাচ্ছি। রত্ন ধারণ করে আপনি ভাববেন, এইবার পেয়েছি, আর চড়চড় করে আস্থা বেড়ে যাবে। হাতে হাতে ফল লাভ। সাহসী হয়ে যাবেন। তা না হলে ন'টা আরো আঙুল তো আছে হাতে। এছাড়া কব্জিতে বাজুতে গলায় কোমরে বেঁধে যান যত খুশি। রত্ন নিজে কিছুই করেনা। আপনাকে দিয়েই করায়।'

পাষণ্ড জ্যোতিষীর দিকে চেয়ে থাকি। কোনরকমে বলতে পারি—'তাহলে কে কি রত্ন ধারণ করবে তা নিশ্চয় হয় কি ভাবে?'

'সোজা ব্যাপার। কে কত খরচ করতে পারবে জানতে হবে, কে কি রঙ পছন্দ করে, ইত্যাদি। এটাই তো এই ব্যবসার দক্ষতা। নিন, পঁচিশটা টাকা দিন। আধ ঘন্টা গেল।'

পঁচিশ টাকা দিয়ে বলি,—'আর একটা কথা। আংটিধারী লোকেরা ব্যবহারের দিক থেকে বেশী বিপজ্জনক কেন?'

তর্করত্ন মিটিমিটি হাসেন। 'আংটি তো আর কাওজ্ঞান দেয়না।'—

মানুষের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে এই শোষণ ব্যবস্থা আমার ঘেন্না ধরায়। অনেক অধ্যবসায় করে অনুসূয়ার আঙুল থেকে নীলা আর পলার দুটো আংটি খুলে ফেলি। তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হয়না। কিন্তু তার চোখে অবিশ্বাস ছায়া ফেলে। কেউ কেউ মনেও করে—মৃত্যুপথযাত্রীকে লুট করা কত সোজা। সন্দেহে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। জল হয়ে পড়ে। বুঝতে পেরেও ঝুঁকি নিয়ে নিষ্ঠুর হই। কিন্তু একে শুধু নিষ্ঠুরতা মনে করাও ভুল। এতো অসহায় মানুষ ক্ষোভে নিজের কপালে করাঘাত করছে, নিজের গলায় দড়ি দিচ্ছে। আত্মহত্যাকারী কি নিষ্ঠুর? সে তো কারো ক্ষতি করতে পারেনি বলেই নিজেকে উপড়ে ফেলতে চায়। পুণ্য অর্জনের জন্য শেষ হয়ে যাওয়াই তো হিন্দুভাগ্য।

পুণ্য চিনিনা, পাপ চিনি। নরককে অনেক বাস্তব মনে হয়।

এই বাস্তব থেকে পালাতে চাই। প্রেম জাগাতে চাই।

সম্মত ভাবেও প্রথমে প্রেম নিবেদনের সময় পুরুষের গলা কাঁপবেই আর নারীর মুখে আসবে ব্রীড়া। এখানে ইংরাজি শব্দ অনেকটা তরল করে দেয় ব্যাপারটাকে। এসব একদিন নিশ্চয়ই জল ভাত হয়। নিশ্চয়ই একদিন ঈশ্বর বা আত্মা বা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। প্রেম কী, সে বিচারের জায়গায় চিন্তায় আর সান্নিধ্যে আনন্দই বড় হয়ে ওঠে। এর ব্যবহারিক দিকটি অবশ্যই যৌনতা, যা ছাড়া একদিন সব ভুলে যাবো। অথচ কি আশ্চর্য্য, প্রতিবার নতুন মেয়েকে প্রেম নিবেদনের সময় গলা কাঁপবেই। শুধুমাত্র প্রেম বিষয়ক এই অনাস্থা নিয়ে ভাবছি। মনে হয় প্রেম নিবেদনের সময় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা। কত অসহায় মাঝে মাঝে মর্য্যাদাহীন কিরকম বোকামী করে বসে, না ?

কাণ্ডজ্ঞানে এসব হয়না। যেমন—জামা রিপু করা, বাকি একটা মাত্র ঘর হলেও বাসযোগ্য করে রাখা, চা করে খাওয়া, সময়ে চিঠি লেখা, লনড্রীর বিল জায়গা মতো পাওয়া, রিপুদমন করা।

মেয়েরা সবচেয়ে রূপসী হয় যখন রিপুহীন। গর্ভাবস্থায় যখন তার প্রেমিক তার মধ্যে সুখস্বপ্ন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এমন রূপ পুরুষের জন্য মনোহরণ সাজে বা যৌন তাড়নায় তার শরীরে আসেনা। কোন গর্বেই না। অনসূয়া এরকম অবস্থায় আমার সাথে দার্জিলিঙ-এ এসে নামল। তখনও জি এন এল এক হয়নি।

কোলকাতা থেকে দার্জিলিঙ প্রায় সাতশ কিলোমিটার বাসে। রকেট, তারপর মিনি। ভীষণ জোরে সারারাত বাস চলেছে। গতির জড়তা থেকে বমি করছিল

অনসূয়া, আর আমি গ্লাস ধরে বসে আছি। জানালা দিয়ে ফেলে আবার সেই গ্লাস। মাসদাতে এসে বোঝার সুযোগ পাই, তারপর শিলিগুড়ি। পথে রীতিমতো ভয় করছিল আমার। রক্তপাত শুরু হলে রাত্রে বিছুঁয়ে কি করব। অনসূয়ার এসব চিন্তাই নেই, বমি করে মুক্ত। কিছু যে হয়নি তা নিতান্তই কাকতালীয়। হলে মানসিক বিপর্যয় উল্টোখাতে বইত জানি। কিছু হবার আগেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া ছিলনা অনসূয়ার। এটা আমি শিখিনি। শেখা যায়না মনে হয়। একটা নির্বোধ নির্লিপ্তি।

বাসে বসে ওপরে উঠে আসা আর পায়ে হেঁটে স্টেশন থেকে মালে ওঠা এক ব্যাপার নয়। বাজার পর্যন্ত এসে অনসূয়া বসে পড়ে। একটা লোক পিঠে ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। 'ডাণ্ডি ডাণ্ডি।' হোটেলের দালান অনসূয়াকে ফুসলাতে থাকে ডাণ্ডিতে ওঠার জন্য। কষ্ট হবেনা, চটপট ওপরে ওঠা যাবে।

'না না' করতে করতে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আক্ষরিক ভাবে, নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ চাক্ষুষ করি আমি ঐ মুহূর্তে।

এরপর আমি কণাকে নিয়ে নিয়ে যাই কিরিতুল।

এরপর আমি ঝর্ণাকে নিয়ে যাই রবার্টসনগঞ্জ।

এরপর আমি চন্দনাকে নিয়ে যাই চাঁদিপুর।

এরপর আমি শোভনাকে নিয়ে যাই কানহা।

আরো অনেকবার দিল্লী যায় আমার সঙ্গে সুপর্ণা, অমৃতা, বিরিন্দর। এরা সবাই ঈর্ষা বা ঈর্ষার বিরোধে বেচারি হয়ে উঠেছিল। এরা সবাই ছিল একজন, সবাই মিলে এক। অনসূয়ার সে রূপ আমি আর কখনো দেখিনি কোন নারীর মধ্যে, জীবনে। শেষ ভ্রমণের আগে অনসূয়ার মধ্যে আবার তা ফুটে ওঠে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায়।

অসুখে ভুগে ও বিভিন্ন ওষুধে পুড়ে যাওয়া মুখ। কালো শুকিয়ে যাওয়া জরাগ্রস্ত গায়ের চামড়া। কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীর, মৃত বীভৎস দৃষ্টি—এই হয়েছিল সে মনে মনে পৃথিবী ছাড়ার পর। তোমাকে ধন্যবাদ যাদুকর। তুমি আবার আমাকে দেখালে। তিনভাগ জলে শরীর আবার শস্যময় হল, চামড়া টানটান, মুখের ভোল ফিরে এল তার কুমারীকালের, তার প্রেমের দিনের নিকণ এলো দেহে। রঙীন জৌলুষে সুখে রূপবতী হয়ে উঠল সে। শেষে মধুর সাধুশরীরে সেইন্ট-এর মতো দিব্য শুয়ে। শিয়রে বসে মাথায় হাত বোলাতে

বোলাতে তা দেখছিলুম। শেষ নিঃশ্বাস পড়ে গেলে কপালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে এলুম। আর পিছন ফিরে তাকাইনি। আর কোনদিন দেখব না।

রূপ অরূপ এই শীর্ষক। একথা বারবার মনে আসছে—

রেল কামরায় বসে যে কোন শব্দ মেলাতে পারি।
আকাশের মেঘে যে কোন ছবি ফোটাতে পারি।

আমি স্থির আর কেন্দ্র আমার চারপাশে ঘুরছে, এই বিশ্ব বিপরীত আমাকে লেখালো $mc^2 - Y$ হবে। তুমি হবে অপসৃয়মাণ কল্পিত এক সময় সারণী— আর আমি খুঁজব বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে যা মনে নেই, যা দেখা যায় না।

সাহিত্যের জন্য আরও একটি ক্ষতি স্বীকার

কোন মতে একবার কৌরবে বিজ্ঞাপন দিতে পারলেই হল, খবর পৌঁছে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের কেবলমাত্র জিজ্ঞাসু ও বুদ্ধিমান কয়েক হাজার পাঠকের কাছে। আমরা এখনই বলে দিচ্ছি যেসব লেখক বা কবি লক্ষ লক্ষ পাঠকের কথা ভেবে বিজ্ঞাপন দেন আমরা তাদের পক্ষে একান্ত অচল। এবং দয়া করে তারা আমাদের বিজ্ঞাপন দিতে বলবেন না। বিজ্ঞাপনের ভাষা আপনি দিতে পারেন কিম্বা আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগের বিশেষজ্ঞের ওপরে নির্ভর করতে পারেন। এবার রেট লক্ষ্য করুন।

	বইপত্র	অন্যান্য বিজ্ঞাপন
পুরো পৃষ্ঠা	৭৫·০০	৪০০·০০
আধা „	৫০·০০	২৫০·০০
সিকি „	১৫·০০	(সাধারণত নেওয়া হয় না)

কৌরব ৫০ রাজ-সংস্করণেও এই সাহিত্য-রেট রাখা হচ্ছে

আলোক সরকার

তমশঙ্খ

এই তো উৎসবলগ্ন—প্রভু, স্নান সমাপন করে
এসেছি, যেমন কথা ছিল—কথা ছিল নাকি ?
সারাদিন মালা-চন্দনের পরিশ্রম, সারাদিন
কোমল সযত্ন প্রসাধন, বারবার প্রসাধন, তা কি
তোমার আদেশ ছাড়া অন্য কিছু—কল্পবিহীনতা
তাও তো তোমারি নির্বাচন। তুমি এইবার
বাজাও তিমির শঙ্খ, করো উদ্বোধন করো
আমাদের স্বপ্নমিলনের রাত্রি। প্রভু, এই দেখ
ছায়াবিবর্জিত যাত্রা—এত বড় বস্তুবিহীনতা
তুমি ভিতরে ভিতরে বলেছিলে ? এত বড় আঁধার রৌদ্রের
আদিগন্ত ? প্রভু, বস্তুবিহীনতা বেশি ক'রে ভাবি, ভাবি নাকি ?
সব স্নান তা তো এই বস্তুবিহীনতা, সব প্রসাধন, তুমি
তমশঙ্খ দুই হাতে তোলো, বাজাও বাজাও নিশ্চেষ্টতা—
শূন্যময় আঁধার রোদ্দুর, বাজো প্রকল্পবিহীন যুগ্মধ্বনি।

সমতল

মরুকুয়াশার পথে আজও কি চলেছে একা ?
আজও তো চলেছে একা। সেই তার যাওয়া
শুধু যাওয়াটুকু—আর অফুরন্ত পুবদিক
কেমন আঁধার রঙ চরাচর। কতবার
তাপস আঁধার রঙ চরাচর। ওই বড় বড় চোখে
ওই বেলা পড়ে আসে, বেলা কত দীর্ঘ পড়ে আসে

ওই চলেছে নিঃসীম সর্বম্বতা, শুধু যাওয়াটুকু, মূক অর্থময়
চলেছে নিরন্তিমান অন্তরাল। মরুকুয়াশার পথে
আধো মাখা নিচু লোক, মুখ ঢাকা আছে তার, যেন
বীতসম্ভাবন সমতল এমন মেদুর প্রত্যাহার।
অনাশ্রয় বালির প্রাচীন কীর্ণ বধির সমগ্র এককতা
দুইটি পায়ের আর সেই অসংযোগ। এমন নিরন্তিমান
সেখানে যা কিছু সবই অতিরিক্ত। কত হিম অতিরিক্ত
শুধু যাওয়াটুকু— আর সেই সমতল সেই অপ্রয়োজনের অদীপতা।

অতিপ্রশ্ন

যেন তা সহসা হয়েছিল। ওই দীপ্যমান
মরুকুয়াশার নিশীথিনী তত আগন্তুক যত
অলঙ্ঘ্য নিয়ম। আজ প্রত্যন্তবেলায় মেঘ
সাগর পেরিয়ে আসে অতিপ্রশ্ন। আজ প্রলম্বিত
ছায়া সমীরের জিজ্ঞাসামেদুর প্রস্তাবনা। আমরা কি
মরুতার প্রতিটি স্পর্শের কৌতূহলী, আমরা কি
আঁধার বিদ্বেষী—আমরা তো জেনেছি সমগ্র নিশীথিনী
তামস নিশ্চিত এককতা। ওই ওই দেখ
অপরিবর্তন নিশীথিনী, অমূলসম্ভব, ঠিক যত
আগন্তুক অলঙ্ঘ্য নিয়ম। হিম অমা কোথাও দোলে না
অমা কোথাও হয় না আরো গাঢ়, তরলতা, যেমন স্থিরতা।
স্থিরতা কি ক্রমউদ্ভাসন, স্থিরতা কি
ক্রমজায়মান? মরুকুয়াশার নিশীথিনী, আমরা তো
সমগ্রবিলাসী—আমরা তো কখনো দেখিনি রেখা
যত শুধু সেই দীপ্যমান।

অজেয়

অসুস্থতা ক্রমশ প্রাচীন। শুধু সেই মুহূর্ত যা
নর্তকীর থামা—সহসা নিরুদ্ধ থেমে-যাওয়া।
শুধু ঋজু নন্দিত যৌবন, নিশ্চিত যৌবন
সে কি নবীনতা নয়, বলো সেকি প্রত্যাশার নয়
আরো বেশি প্রার্থনার, উৎকাঙ্ক্ষা, দমিত বিক্ষোভ!
অসুস্থতা ক্রমশ প্রাচীন—যা কিছু ঘোষণা
সবই সেই অনুবৃত্তি, ছন্দময়—কেন ছন্দময় হবে
কেন পূর্বনির্ধারিত হবে—বিষাদ মনোনিবেশ
দেখে শুধু দুটি বাহু দুটি চরণের আবর্তন—
নারী নেই? নর্তকীর শ্যামল কোমল ডাকগুলি?
যা আছে তা শুধু নৃত্য, কতদিন নিশ্চিত অভ্রান্ত নৃত্য—
তা কি উন্মন করে না? তা তো সেই অসুস্থের জানালা যা
অবিমিশ্র যোজন যোজন পার হয়, রাঙা গাইদের দেশে যায়—
কেন যায়? কেন অজেয় ক্রন্দন! নর্তকী কি একবারও থেমেছিস?

শংকর চক্রবর্তী

একটি মানচিত্র

এই মানচিত্র জুড়ে কার মুখ বুঝিনি কখনো,
অস্পষ্ট বুলোয় মাথা আঁকিবুকি, যেন মেহগিনি
কাঠের আগুন, আমি সাধ্যহীন কল্পনায় দেখি
ওই তীক্ষ্ণ নাক, আমি হাসতে থাকি গোপন জ্বালায়—
কাকে বলি, অগ্নিতন্ত্র নিবেছে বৃষ্টির জলে, না ঈর্ষায় নয়,
প্রকৃত বার্ধক্যে কাঁপে হাত, তাই শেষবার সুড়ঙ্গের

কাছাকাছি ঘুরিফিরি, রক্ত নিয়ে কারবার করি, তবু
আঘাত আমাকে দেয় রুচি, দেয় খানাখন্দে বাঁচার বিষয়
এই রুটি, সাম্প্রতিক বই নয়, কোনো কামুকের
আড়বাঁশি নয়, শুধু পুড়ে যায় মানচিত্র, মুখ,
পোড়ে, আপ্তজন ছেড়ে একা একা···

অপেক্ষা

এই ভরদুপুরে বারুদের গন্ধ-মাখা মাছের ঝোল
উপ্‌চে দিলো ভাতের থালা
ফুটপাথে জলপাই-রঙা যুবতী সেমিজে সেফ্‌টিপিন বিঁধিয়ে
স্নান সেরে নিলো
আমার বুক পকেটে এক অচেনা বাতাস
ঠা ঠা পাথুরে রাস্তা থেকে এক মায়াজাল
উঠে গ্যাছে মহন্ত বাড়ির তেতালায়···
স্পষ্ট মনে আছে গত বছর এমন দিনে

কেউ কি ফিরে আসবে আবার ?

অরুণ মুখোপাধ্যায়

বাণিজ্য

মধ্যরাতেও ভেসে আসে মানুষের চিৎকার ;
সারা দিনমান তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে
এই মধ্যরাত।
ক্রীতদাসী, ফসলের ক্ষেতে বেঁধেছে মানুষকে—

তার স্রাণ নিয়ে, স্নেহের কথা ভেবে
প্রতিরাতে জন্ম দিচ্ছ বৃক্ষের ;
দীর্ঘ পায়ে হেঁটে হেঁটে
ঢের জমেছে শস্য খামারে—
এখন মধ্যরাতে মানুষ এসেছে
বাণিজ্য নিয়ে।

ক্রীতদাসী, মৃত্যুর জন্য আর কোন ক্ষোভ নেই
মানুষ বাণিজ্যে এসেছে, সবকিছু খুইয়েই।

সুদর্শন চক্রবর্তী

সীমেট্রি

শিশির ভেজা ঘাসে শুয়ে থাকে শহিদের স্মৃতি···
তোমার আমার বাসরের সংখ্যা কতো !
এমনি শুয়ে থাকবো সবাই—
তুমি, আমি, আরও অনেকে
শুকতারা ভোরে ঘাসের আস্তরণে
দু' একটা নাম না জানা ফুল
ফুটতেও তো পারে !
টুপটুপ ঝরে যাবে ফুল···
নিঃশব্দ প্রণতিতে সবাই মূক !
তোমার আমার ভেলায়
বাতাস যেন বেশ শীতল
যেন চারপাশে বরফের আস্তরণ···
শুনছ যারা
মনে রেখো
আমরাও সীমেট্রির অংশীদার !

সঞ্জীব প্রামাণিক

ঈর্ষা

বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়েছে প্রেমিকা না-পাওয়া এক হাবাগোবা ছেলে
বৃক্ষ তাকে দেখিয়েছে ফুল।

সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়েছে আকাট-কৃপণ
সমুদ্র দিয়েছে তাকে অগণিত ঢেউ।

সূর্যাস্তের কাছে দাঁড়িয়েছে পাকা-জোতদার
সূর্য তার সমূহ আভা দিনের গর্ভে দিয়ে গেছে।

কী-ই বা করার আছে ছেলে কিংবা কৃপণের, জোতদারটির ?

ঈর্ষা শব্দটিকে সত্য মনে হল।

ভোর

কার জন্য এই ভোর রচিত হয়েছে ?

আকাশের বুক থেকে লাফ দেয় দুধ-রঙ আলো
যে যার নিজের কাজ মুঠো করে ধরে।

কার জন্য এই ভোর, কার ?

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে মঙ্‌লা টুডুর বুড়ো বর
সে এই ভোরের দিকে তাকাতে পারে না—

তার চোখে এই ভোর অন্ধকার আনে

তার চোখে এই ভোর বৈধব্য-প্রতীক।

জয়নাল আবেদীন

বাঁচা

শহরতলীর শেষ জানালার নিচে এক আদিগন্ত মাঠে
যে শব্দে তোমাকে ডেকেছিলাম
সেই আশ্চর্য শব্দটি আজও হারিয়ে যায়নি।

ভালোলাগা চলে গেলেও জীবন থাকে
বুঝতে শিখেছি
টুকরো হতে হতে যা অবশিষ্ট সেই তো তুমি
ফেলে আসা স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে প্রেম।

বুঝতে শিখতে জানলেই একান্ত আপন করে
অনায়াসে বেঁচে থাকা যায়।

শক্তিপদ হালদার

"আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি"

আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি
কবিতা লেখার সময় মনে পড়ে
তোমাদের সারি সারি মুখ।
স্বপ্নময় আবেশে লিখি কবিতা
ফুলের মত সুন্দর যত নাম
কবিতায় তোমরা হয়ে ওঠো ভাস্বর
আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি।

সংযম পাল

১৭ মার্চ

সেভেনটিন্‌থ মার্চ তোমার জন্মদিন ছিলো
বাদুড় এসে দাঁড়িয়েছিলো মাঝদুপুরবেলা
আমরা সবাই ত্রস্ত, সেই ভাহা রোদের ফাঁকে
চিতা ছাড়াই শব পুড়ছে, কলঙ্কমঙ্গলা
দেবীর মাথা নেই, শুধু বিষম ভয়, চাপা
কান্না যেন ঘমকে উঠে প্রার্থনাকে যাচে

নাইনটিন্‌থ মে আমার মৃত্যুতিথি হবে
আগুন ভেঙে জলের তোড়ে মরা বাদুড় ভেসে
দীপের কোলে ফুলের প্রাণ, তরঙ্গ সংক্ষোভে
শুধুই খান তরুণ তান অন্তলোকে পিতা
সেদিন সেকি মৃত্যু, নাকি তরুণ জন্মে
সেভেনটিন্‌থ মার্চ, সেকি নাইনটিন্‌থ মে ?

স্বাধীন

পুরনো কেল্লা, একা বাদুড়, তার প্রহরার দিনে ডাকে আমায়
ভেতরে কাঁচের আলো ঠিকরায়, নিশাপ্রবঞ্চ এমন মহলে
ডাকে, আর বলে : ভেতরে দাঁড়াও, রাণীর বাদুড় ছায়া এসে যেই
তোমাকে ডাকবে, তুমি মাথা নীচু প্রণাম করবে, প্রণাম করবে

আমি পারবো না, বললাম তাকে, কেন আমি এই বর্তমানের
অর্থবিভাগে কর্মরত ও কবিতা লিখেছি এমন যুবক
নিজের নারীর পায়ে নয়, ওই শোষকবংশ রাণীর আঙুলে
প্রণাম রাখবো, পারবো না আমি, স্বাধীন এ জিন বর্তমানের

অশোকতরু চক্রবর্তী

নাবিক

জলের শব্দ
হাওয়ার শব্দ
আজ নাবিকের কাছে স্পষ্ট হবে।

হে জাহাজ একদা তুমি গল্প বলেছিলে
প্রবীণ এক সহকর্মীর

সেও নাবিক ;

একটি যুদ্ধের স্মৃতি
একটি মৃত্যুর স্মৃতি
কখন জল হয়ে ভাসিয়ে নিয়েছে
তাকে বহুদূর

সেখানে শহর নেই
সেখানে মানুষ নেই।

নারায়ণ সেন

বোধিবৃক্ষ

বহুদিনের সাধ বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বসে
জ্যোৎস্নায় শরীর ডুবিয়ে চান করব
তা আর হল না, সুশীতল বৃক্ষের তলায়
বহুদিন সুস্নিগ্ধ ছায়া অথবা নিরুত্তাপ আলো নেই

শুধু ঘোর অন্ধকারে সর্প গরলের মতো এই গুহায়
একবুক জ্বালার মধ্যে বেঁচে বর্তে আছে দুঃখ

সময় ফেরিওয়ালার মতো হাঁকতে হাঁকতে যায়
অনাবাদী ফুটিফাটা মাঠে বসে থাকে দান-খয়রাতির দিন
দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিপন্ন কৃষক
তাকিয়ে থাকে ভাগাড়ের শকুন
স্বয়ংশাসিত পৃথিবী চুপচাপ বয়েসের হিসেব করে
আর লোকসমাজ রহস্যময় আকাশের নিচে শুয়ে
হাতবদল করে গাঁজার কলকে

বহুদিনের সাধ বোধিবৃক্ষের স্নেহের স্পর্শে শুদ্ধ হবো
মস্ত এক বাধা দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে
স্বপ্নও দেখেছি অথচ অজ্ঞানের অন্ধকার গুহায়
সজ্ঞানে ঢুকে পড়েছি কখন জানি না
না আলো না ছায়া অবগাহনের মতো এই হৃদয়
জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে গরলে

কাশীনাথ বসু

কে বলেছে অজয় পুরুষ !

কে বলেছে অজয় পুরুষ ?
আমি তো দেখেছি তাকে
বাঁকা সিঁথিতে সামান্ত লাল নিয়ে শুয়ে আছে
যেন শহরের নারী ।

কে বলেছে অজয় পুরুষ !
আমি তো দেখেছি তার

শুধু নাচুনে কোমর, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী
ঠোঁটে ঠোঁটে অনন্ত পিপাসা
যেন খাবে, আকণ্ঠ খাবে, খেয়ে
আমার ব্যাখ্যা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে
ভুলে যাবে কোপাই বিরহ।

কে বলেছে অজয় পুরুষ!
আমি তো বুঝেছি
বাঁধনের আশা তার কোষে ও মজ্জায়।
এত-শত গ্রাম ছুঁয়ে, ছোট ছোট ঘর ছুঁয়ে
ওই যে রাঢ়ের পুরুষ ভালবাসা
সে যে প্রতিমারই কাজ
আজ তাই এমন সংলগ্ন কালে
ও অজয় নারী হয়ে যাক
প্রকৃতই নারী হয়ে যাক।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিরে আসবো

অনন্ত রাত্রির কাছে তুমি চেয়েছো চিরশান্তি
সমস্ত উদ্বেগ পার হতে হতে একদিন গ্রহণ করেছো নীল বিষ
কখনও কি দেখেছো কোন উষ্ণ হাত
কোন চোখ প্রশান্তি নিয়ে দেখেছে তোমার ভিতরটুকু
কুয়াশা আর দুঃস্বপ্নের দিন ভাঙতে ভাঙতে
একদিন ঠিক তোমাকে ফিরে আসতে হবে

বেঁচে থাকার গোটা বৈচিত্র আজ অহেতুক
ভেঙে যায় ভিতরের নির্মাণ

চোখের সামনে ভেসে আসে অজস্র শালুক পদ্ম
জলের বুদ্বুদ ভাঙে জোয়ারে
এক মানুষ সমান পাঁচিল ভেঙে পড়ুক আর্তনাদের মতো
হাওয়ার টানে বুকে লাগুক সম্মোহনের বাতাস
চুরমার স্বপ্ন ভাঙতে ভাঙতে গড়িয়ে যাক দিন
আস্তে আস্তে চিরশান্তি অনায়াস জীবনের মোহ ছেড়ে
একদিন ফিরে আসবো তোমাদের কাছে

তপনকুমার মাইতি

তোমাকে এবং তোমাকে

১.
ক্ষণেক আনন্দটুকু নিয়ে তুমি যাবে চলে জানি—এই ভালোবাসা তবে !
চোখের কাজলের মোহে সন্ধ্যা কি নামে দিবাভাগে কখনও ভুলে ?
উত্তর সমুদ্র তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে কোন প্রতীকী অরণ্যে ?
ক্যাথলিক গীর্জা, দিনান্ত স্বর্ণাঙ্কিত আসঙ্গ নিঃশেষ সুখে ।

২.
একাকীতম দীর্ঘশ্বাস পেয়ে যায় শব্দ-মঞ্জরী । অতীন্দ্রিয় চোখে
ভাঙ্গে বেদের কুয়াশা । দুরূহ কোণের দিকে সরে গিয়ে দেখি চিরন্তনী প্রাণ
ঝাঁপ দেয় গায়ত্রীর নীল অগ্নিমন্ত্রে ; নিউক্লিয়ার ব্রহ্মের নির্ভাষ একাত্মিকা—
তোমার সমস্ত পুরানো চিঠি ছায়াচক্র মেলে উঠছে তন্ত্রাবেগে ।

৩.
এই সময়টার কথা তোমাকে আমি বলতে চাই—ঠিক এই সময়টার কথা
যখন তুমি আমার পাশে বসে আছো, আর সাঁওতালের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ
মেঘ আকাশে থৈ-থৈ—হাতে হাত ধরো, ঠোঁটে তোল
চুম্বনের ঢেউ—কারণ এই সময়টা আর পরে থাকবে না ।

সিদ্ধার্থ বসু

নরম ঘড়ির চোখে

যে অতীত, নরম ঘড়ির চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা মোম
শকুনডানার ছায়া পোষাপ্রাণীর মতো কাঁধে
সংস্কারহীন স্মৃতিপ্রান্তর কতো মৃত বোধের ভাগাড়
যেখানে মায়ের প্রত্নহাসি, পোকাধরা দুধে দাঁত
প্রথম স্বপ্নমৈথুনের ক্ষারগন্ধময় তারল্য

যদিও মৃতের জগতে কয়োটি ঘুণই শুধু অবিনশ্বর
মুহূর্তের চক্রগতি আবর্তনই অনন্তসূত্র
যে দীর্ঘ কাঁটার ক্ষুরধার ঋজু উত্থান কখনোবা
গোপন হত্যায় ঢুকে যায় নরম ঘড়ির তলপেটে
সন্তানের বিকল্পে ক্রমশঃ হতে থাকি স্মৃতিহীন।

যাদব দত্ত

নিঃশর্ত সংলাপ

তোমার শরীরে আজ রহস্যের ছায়া, সমর্পিত এবং উদাস
যত সময় যায় তোমার দিকে উন্মুখ ভীরু স্পর্ধিত চোখ—পুরুষের
সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে বাসরের ঘরে রুদ্ধশ্বাস প্রথম প্রেমিক
আস্তিন গোটাতে গোটাতে।

কতটাই বা দূরে বসে থাকা—তবু মনে পড়েনা কী দিয়ে শুরু হবে
আকাশ ও শিশিরের গল্প ; মাটির দিকে মুখ ফিরে ঘুমিয়ে থাকা
এই হাত তোমাকে জাগাবে বৃষ্টির মত অলৌকিক ছায়া হয়ে
প্রথমে বিস্ফারিত হবে চোখ অবিশ্বাসে কঠিন প্রতিমার আগুনে বিষে

তারপর পাথরের মণি দুটি ঝড় হয়ে পুরুষের মুখে খুঁজবে অলজ্জ কুসুম
ভালবাসা-রোদ্দ দেবতার গায়ে চন্দন গন্ধ।

একদিন চলে যাওয়ার পর বুঝবে মানুষটা কদলীবৃক্ষের সাথে,
ময়ূরের পেখমও চেয়েছিল তাই মাংসাশী বেড়াল হয়ে
রাতভর ঘরময় খুঁজতো সাদা নাসপাতি
সে আর ফিরবে না আল্পস পর্বতমালায় অথবা নরম মাটিতে
তার অনুপস্থিতি এমনি দাহক মুখ হয়ে আলো গিলে খায়
তুমি নেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখার ঠোঁট আকাশে ঠেকেছে
বল কোথায় লুকাবো মুখ !

কলকাতার শরীর

প্রতিমার মত তুমি কেন যে হঠাৎ কোন নারীর মুখের আদলে বসে যাও
বুঝিনা কেন এই পাপবোধ কলকাতা শরীরের ভেতরেও
তোমার এই আন্তর্জাতিক সীমানা ভাঙ্গার খেলা ; রাস্তার ঘনঘোর
ব্যস্ততা থেকে সবুজ মাঠের দিকে অবিরত ফিরে বসা কবে শেষ হবে জানি না !

রৌদ্রে-লীন ঘাম আর ধূসর আকাশ নিয়েও তুমি সেক্সি হয়ে যাও
শান্তিনিকেতনের পথে তুমি কী ঘুরে এসেছ শেষবার অনন্ত সূর্যের লাল রঙ নিয়ে
কেয়াবনে তোমার বর্ষার সাদা হাত নিয়ে কেউ কী জেগেছে আজ ; কবিত্বের
সীমূলবীজ ফেটে কবিতার চোরাবালি পেরিয়ে তারই সামুদ্রিক জোয়ার !

সকল নাগরিক হয়েও তোমার স্নেহাই নেই, তোমাকে যুক্ত করার
সংগঠন যে শব্দ খালি বোতলের মত কাৎ হয়ে পড়ে আছে
তা থেকেও সংগৃহীত
আগামী হেমন্তে তোমার পরাঙ্মুখ বুকে ফীর জমবে এ সংবাদে
আমিও কম পুলকিত নই তাই আমি বেহালাবাদকের সাথে
সকল লাইব্রেরীয়ানের হাতের কোনো তফাৎ দেখিনি।

ঘড়িতে শেষ বিকেলের আলো ঝিকিয়ে ঝুলে পড়ছে
আজ আর কোথাও যাবো না আমার ভেতরের সুখ দু'চোখ ভরে ঘুমিয়ে
পড়তে চায় আজ বিকেলে দেখা শেষ নারীটির রূপ ভেবে
সেখানে শুধু কলকাতা কেন তোমার আদলে এক নিমেষের
পাখী হয়ে তুমিও আছো।

প্রদীপ পাল

দেখছি দেখছি

দেখছি দেখছি। বন জঙ্গল, হাতি, শুয়োর
পলায়নী চিতা। ভীত সন্ত্রস্ত
সারি সারি বন্দুকের নল। ট্রিগারে টারগেট। ধরাশায়ী রয়াল বেঙ্গল
চারজন টেনে তোলে আহত শরীর। কারো স্বামী, কারো বাপ
কাঁটা খাঁচা, কাঁটা খাঁচা। দড়ির বন্ধন সারা গায়ে
চিতি বোরা, গোখরো, গোখুর দে দৌড় দে দৌড়
দেখছি দেখছি। শহরেও বনের হিংস্রতা। মরণ কামড়
খুব কাছ থেকে, খুব দূর থেকে কেউ ছুঁড়ে দিচ্ছে মৃত্যুবাণ

বনেও দেখেছি, শহরে দেখেছি স্বার্থের আগুন
দেখেছি হিংসের জ্বলে পুড়ে যাওয়া
ভয় পাইনি। ভয়ের দেখেছি অনেকরকম চেহারা
এক ভয় থেকে আরো এক ভয়ের মধ্যে, ভেঙ্গে চলেছি
ভাঙনে হয়েছি সহস্র খণ্ড
গলা উঁচিয়ে বলিনি কখনো : ওগো, নল সরিয়ে নাও।
আমি ক্ষুধার্ত।
আমাকে দাও উচ্ছিষ্ট মনোহরা।
নরম গদি, মালপোয়া।

আমায় তখন

আমায় তখন কেউ ডাকেনি, কেউ বলেনি
একটু বোসো
আমায় তখন কেউ বোঝেনি, কেউ দেখেনি
একলা একটা বাউণ্ডুলে

হঠাৎ করে বৃষ্টি এল,
বজ্রসহ বৃষ্টি এল
বিদ্যুৎও কি কম ছিল ?
সেই আলোতে দেখতে পেলাম
পড়ে থাকা মাথার মণি
মণিতে খুব ভয় ছিল, ডরও ছিল
একটু আধটু
তুলে নিলাম, বুকের আদর মাখিয়ে দিলাম
পা থেকে নাভিকুণ্ডলে

সেই থেকে সেই তাক্ত মণি জড়িয়ে আছে
আপটে সাপটে

অভী সেনগুপ্ত

বসবাসের কবিতা

যাদের কাছ থেকে চ'লে আসছি তারা এখন রিক্ত খামারের গান গায়। অশ্রুপতনের মতন ঢালু রাস্তায় বেসামাল হয়ে যায় ঘোড়ায় টানা শকট। অস্পষ্ট হৃদয়হীন ফসলগুলি একে অপরকে আঁকড়ে ধ'রে জট বাঁধে সন্ত্রাসের। যাদের

কাছ থেকে চ'লে যাওয়া তাদের ফাঁকা বুলি তুকতাক শূন্যতাকে দৌড় করাতে চায় যেন এভাবেই উড়ে আসবে ঝড় যেন এভাবেই অসচরাচর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে আনবে শয়তানের বিগ্রহ। যা-কিছু মঙ্গল, সৃজনের রূপ বর্ণ মায়া সেইসব স্পর্শ করা ওদের অভিধানে 'বিরক্তিকর' হয়ে যায় হয়তো ক্ষমতায় কুলোয় না আর। যাদের কাছে চ'লে যেতে চাই তারা অনেকটা দূরে, হয়তো বা আমার মতন কারও অপেক্ষায় থেকে থেকে এগিয়ে চ'লে যায়—কিছুটা ধোঁয়াটে ভাষায় তাদের এখন। পেছনে কোনও গতিচিহ্ন রাখা নেই, রাস্তা অসমান মায়াত্মক রকমের পিছল অথচ বাতাসে সঙ্গীতের মূর্ছনা ঠিক শোনা যায়। হাহাকার কিন্তু রিক্ততা নয় দশদিক পাঠিয়ে তার এমনই অস্ফুটধ্বনি। রক্তাক্ত হাত-পাগুলি আমাকে পথ ভাষায়—অসময়ের কথা একজীবন বঞ্চনার কথা ওদের গলায় ওদের অস্তিত্বে কী মানানসই মনে হয়। আমার যাওয়া হয় না আরও। এক আলোকবর্ষ অন্ধকার থেকে চ'লে এসে আর এক আলোকবর্ষ আলোর দিকে চলে যাবার বদলে ঠিক মাঝ রাস্তায় আমি বসবাস-যোগ্যতা পেয়ে যাই।

থেকে যাবার মধ্যে যে ভালবাসা অপেক্ষা করে আমি তাকে ক্রম-উন্মোচিত করি।

গৃহস্থের হাততালি

সেই সমস্ত বিধ্বস্ত কবিতার কাছে পা মুড়ে বসতে চাই যাদের আর
উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই—

জাল গুটোতে গুটোতে এক সময় জলকে মনে হয় অযৌক্তিক তবু
আরও একবার বারবার জলের ভ্রূকুটির কাছে প্রার্থনা জানাতে যেতে হয়—
দিনের মধ্যে অপদার্থ দিনগুলোর বুক বরাবর হেঁটে যেতে যেতে
শরীর ঝলসে ওঠে
এতো রোদ ছিলো মেঘ ও মুখোশে ? তিন ভাগ জলের মধ্যে

বসবাসযোগ্যতা না থাকায় ভাবলাম তবে—'পিপাসা' ?
শালংকারা ছিলো, লোভী ও লম্পটেরাও ছিলো কবিতাগুলি
বিধ্বস্ত হয়েছে নির্জন পথে একাকী
—গৃহস্থের বাতি নেভানো ঘর থেকে কয়েক পা দূরে।

আজ আঁটো, কেবলমাত্র ঈশ্বরসহায় কবিতাগুলি ঘুরছে নির্ভয়ে
লোভী ও লম্পটেরা উধাও, গৃহস্থের হাততালি কেঁদে উঠছে
আরও আঁটো নিরাভরণ কবিতার জন্য।

শ্যামলজিৎ সাহা

নির্ণয়

জলশিরীষ গাছের পাতা বুঁজে আছে।
কাছেই পরিদর্শক, বাঁধভাঙা জলে
বুটজুতো কাদা দিয়ে অনায়াস ঘিরে দিচ্ছে
অদ্ভুত আয়াস। দুঃসময়ে আসিনি—চোখ
স্পষ্ট করে নিতে ঘোষগ্রামে চলে আসা—
এই ইচ্ছে চাড়া দিয়ে ওঠে দেশ খুঁজে নিতে।
দারুণ সরলতায় শোনা গেছে ধানকলে বৃষ্টি
যন্ত্রের বাজনা হয়ে সংলগ্ন দেয়ালে বেজে যাচ্ছে।
কার্যকারণ বুঝি না। শরীরে ঠাণ্ডার ভাব—
জড়ানো গলায় অন্যরকম জেগেছি ;
এখন শহরে বৈপরীত্য যার 'পরে আধিকার।
আর্তির ভেতর দেখি সুষম আলোয়
এখন দিনযাপন আর কষ্টকর নয়।
যা অশান্ত তাই মনে বুঝদার হয়ে ওঠে।
আবছা দৃষ্টির মধ্যে দীক্ষিত উদ্ভিদ—
যার কোষে সৃষ্টি, কৃষিকাজ, ফসফেট।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছ নম্বর ঘরে

আত্মনির্বাসনে আছি, ছ নম্বর ঘরে
উত্তর দুয়ার খুললে গোলদিঘি উঁকি মারে
নিচের ময়দানে, মাঠে। ট্রামের রগ্‌ডানি
মধ্যরাত ফুটো ক'রে প্রভাতে পৌঁছায়
অধিকন্তু, গোটা দিন। কাক ও টায়ার
ফাটায় কানের পর্দা। কলকাতায় আছি।

একটু জবুথবু ছবি : লোহার খাটিয়া,
হাতের নাগালে ছোটো মেজো বড়ো শিশি
ফ্লাস্ক, বেলফুল আর দেয়ালে লটকানো
খোপকাটা চার্ট, তার মধ্যে ব্যাটে-বলে
কিছুমিছু ম্লান সংখ্যা, বিপদসংকুল
রক্ত মলমূত্র নিয়ে হিসেবনিকেশ…
এইসব। স্বাভাবিক চাপ নেই রক্তে ও মজ্জিতে।

যেন সকলের আছে, সবাই পাখর
পদতলে স্বর্গ বয়, দুপাশের মাঠে
সবুজের বনভোজন, শালবনী হাট
হপ্তায় দুবার বসে, ওরাও যুবতী
মুখ ভাখে স্বর্ণাঞ্জলে, ছাঁচ ভেঙে হাসে।
আধোঘুম ছবিঘরে এমনই তৎপর
প্রদর্শনী, শুয়ে আছি ছ নম্বর ঘরে।

দিব্যেন্দু পালিত

বরবর্ণিনী, অয়ি শ্রীময়ী

পায়ের কাছে কিছু পড়ে থাকলে
এখন আর লোভ হয় না।

বরবর্ণিনী, অয়ি শ্রীময়ী,
অপেক্ষা করো তোমার শত্রুতা নিয়ে,
তোমার বশ্যতা নিয়ে,
সোনালি ফিতের বাঁধা তোমার নারীত্বের
নির্মম আকর্ষণ নিয়ে

আমার মনে পড়ে যায় বাল্যকাল—
সেই বাজি পোড়ানো, সেই নতুন জামা
আর শিউলির গন্ধ-মেশানো হাওয়া।

মনে পড়ে রাস্তায় যেতে-যেতে কিছুই না পাওয়া
এক হিসেবী বালকের থেমে থাকা—
পরীর দান ভেবে আগ্রহে সজীব হতে হতেও যে তার
অবিশ্বাস থেকে শক্তি জড়ো ক'রে
হয়ে উঠেছিল আক্রমণকারী…

মনে পড়ে পাথরে পা ছুঁড়ে তার সেই
আঙুল ভেঙে বসে থাকা
আর মাথা পর্যন্ত ছুটে যাওয়া যন্ত্রণা নিয়ে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—

আর তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া
পথচারীদের অবজ্ঞা আর হাসি।

কিছুই কি বদলেছে ?
শুধু আক্রমণ থেকে উপেক্ষা তুলে নিয়ে
আমার এই যাওয়া
যাওয়া
যাওয়া···

মৃণাল দত্ত

হঠাৎ ময়ূরী

পার্কস্ট্রিটে হঠাৎ ময়ূরী নেমে এলো।
স্তব্ধ হলো মুহূর্তে ট্রাফিক
উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে ঈশানে আমি যেদিকেই
ঘাড় ঘুরিয়েছি
শুধু মেঘ শুধু অন্ধকার
শুধু বিস্তৃত কলাপ আর নীলবর্ণ প্রতিভাস, বিদ্যুচ্চমক।

বৃষ্টি নেমে এলো।
শিহরিত মুহূর্ত আলোয়
দেখা হলো, হঠাৎ ময়ূরী নেমে এসেছে মুখর পার্কস্ট্রিটে
উড়ে এসে বসেছে আমার দীর্ঘ নিঃশব্দ চাতালে

ট্রাফিক হর্নের মতো কেকাধ্বনি কানে এসে লাগে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

কালীয়-দমন

কালীদহের জল সর্পরাজ কালীয়-র অগ্নিবাষ্পে, বিষে বিষে, নীল। বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে মৃত্যু, শোকোচ্ছ্বাস। গোচারণের মাঠে মাঠে শ্মশান-চিতার সার। অগ্নিকলকে প্রকৃতিও অর্ধমৃত যেন। কালীয়-দমনে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিলেন কালীদহে। তীরে উৎকণ্ঠ গোপবাসীর ভিড়। অবশিষ্ট ও জীবিত যারা।

গোপবাসী ১। মৃত্যুদৃশ্য দেখে দেখে
মৃত্যুদৃশ্য দেখে দেখে দেখে
ইন্দ্রিয় অসাড়।
সে এমন ধাতুপাত, মরচেও পড়বে না,
অথবা রক্তের দাগ মরচে মনে হবে।

গোপবাসী ২। আরেকটি মৃত্যুসংখ্যা যোগ হবে সহস্রের ঘাড়ে
এত নিষেধের পরও নিজের অস্তিমে তার ঝাঁপ
আত্মহননের সুখে।

গোপবাসী ৩। পাক খাচ্ছে জল, ঘূর্ণীজল
কালো জল, কালান্তক জল।
পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা, গরলের যথেচ্ছ বমন,
ফোলে, ফাঁপে, ছত্র হয়, যেন কালীদহে
আত্মপ্রতিকৃতি আঁকে কালীয়-র একনায়কত্বের বিলাস।
ফোঁসে ঢেউ ফেনাকে ফাটিয়ে, রাগে গর্‌গর্‌
ঢেউ-এর চূড়ায় ফণা, ফণাশীর্ষ স্ফীতকায় জল, ঘূর্ণীজল,
কালীদহ সাপের প্রান্তর।
বেহুলা-বাসর নয়, শত ছিদ্র, বা সহস্রাধিক
সুড়ঙ্গের চোরাপথে নিষ্ক্রমণ, আক্রমণ এবং ধ্বংসন

দংশনের পূর্ণ স্বাধীনতা।
দংশন সমস্যা নয়, বিষদাঁত কতবার কোথায় বসাবে
তারই নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের ফোঁসাফুঁসি, অন্তর্দ্বন্দ্ব
শৃঙ্খলাবিহীন পাক, ঘূর্ণীপাক, জল, ঘূর্ণীজল।

গোপবাসী ৪ ॥ শত শত নিমজ্জমানের
রুধিরের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে ভক্ষক,
লালসায় আরো ধূর্ততর
আতশবাজিতে স্ফীত, বারুদে সেজেছে বিস্ফোরক।
তবু যাত্রা নবযুবকের
স্থানান্তরে যাত্রা নয়, কালান্তরে, যা নির্মীয়মান ;
সংকল্পের ভবিষ্যতে ভর
অতীত ভাঙার ছুঁড়ে। নির্মাণ-সর্বস্ব বর্তমান।

গোপবাসী ৫ ॥ কিন্তু আর কতক্ষণ !
যেভাবে মরেছে শত গোপ-গোপিনীর সন্ততি-সন্তান
সেভাবেই হিম হবে, নীল হবে, নিরর্থক হবে অভিযান।
ঘুমঘোর এখুনি ভাসাবে।

গোপবাসী ৬ ॥ কী রইল তাহলে আমাদের ?
স্মৃতি-সত্তা জুড়ে শুধু মৃত্যুরোল, আর্ত শোকতাপ
ছিন্ন পল্লবের মুখ খুঁজে খুঁজে বৃক্ষের বিলাপ।

গোপবাসী ১ ॥ রইল মাটি, যা পুড়ে পাথর
রইল গাছ, যা আগুনে সেঁকা।
রইল পানি, যার স্বর নেই
রইল ঘরভর্তি দুঃখরেখা।

গোপবাসী ২ ॥ দেখ, দেখ, এগোচ্ছে যত
ঠিকরে বেরুচ্ছে কালীয়-র রক্তচক্ষু
শ্বাপদের ক্ষিপ্রতায় খুঁজছে নিশানা।
জঠর থেকে টেনে আনছে গরলাগ্নি,
ফুঁসছে ঝড় হাঁকিয়ে।
ওঃ, কী পৈশাচিকই না হতে পারে হিংস্রতা।
কংসের রক্তপায়ী খড়্গকেও কত ম্লান মনে হচ্ছে এখন।

গোপবালী ৩ । রাজার কুমার যায় মৃগয়ায়, শৌখিন শিকারে
শত সৈন্য পরিবৃত নিরাপত্তা, নিশ্ছিদ্র পাহারা ।
ও চলেছে একা ।
আগ্নেয়প্রতিভা, চুলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের
নক্ষত্র ঝিলিক ।
শিরস্ত্রাণ নেই, তবু মনে হয় যেন অলঙ্কৃত
সূর্যরশ্মিরেখা দিয়ে । নেই রথ, রথচক্র নেই ।
অশ্ব নেই, অশ্বের হ্রেষায় নেই ঝঞ্ঝার নির্ঘোষ,
তবু জলে শোনা যায় রথের ঘর্ঘর ।
প্রতিহিংসাপরায়ণ জল কাঁপে, কেঁপে সরে যায়
তরবারি ওঠে ভাঙে, চূর্ণ প্রতিরোধ,
জলের আহত দেহ আর্তনাদে টলে পড়ে জলে ।
বধ্য নির্বাচিত হলে ব্যাধের বল্লম
যে রকম নির্ধারিত গতিপথে ছোটে
সে রকমই সে চলেছে একা ।

গোপবালী ৪ । ওদিকে আকাশে ষড়যন্ত্রের সজ্জা
কালো মেঘদল বনের মাতাল হাতি,
সূর্যকে ঘিরে, যেন সূর্যই শত্রু
অবাধ অন্ধকারের নিকট জ্ঞাতি

মহাকাশে যদি এমন বৈপরীত্য
দুর্দৈবের বীজ বোনে চৈতন্যে,
আলোবিদ্বেষী এই প্রস্তুতিপর্ব
আরো ভয়াবহ কোন্ ধ্বংসের জন্যে ?

গোপবালী ৫ । দ্বিপ্রহর হয়ে উঠছে দুরভিসন্ধির মত ঘুটঘুটে ।
প্রাগৈতিহাসিক বাদুড়ের বিশাল ডানায় ডানায়
আকাশ যেন মানুষের আকাশ নয় আর,
নরকের গহ্বরের দেয়ালের কালো দিয়ে লেপা ।
কিন্তু আর কী বাকি আছে ঘটনায় ?
রক্ত থেকে তো কখন মুছে নিয়েছে সব উদ্ধিচিহ্ন ।

গোপবাসী ৬ ॥ কী ঘটবে জানা আছে যখন
আমরাই বা কেন এখানে জড়ভরত ?
মৃত্যুদাগ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
ফিরেই তো যেতে পারি যে-যার ঘরে ।

গোপবাসী ১ ॥ ঘরে কি রয়েছে কারো ঘর ?
ঘরে মুহুর্মুহু শোকস্বর ।
কার মুখ দেখবে ঘরে ফিরে ?
সে তো জ্বলছে চিতায় তিমিরে ।

গোপবাসী ২ ॥ কী আশ্চর্য !
ও যে পেরিয়ে গেল মাঝ-সরোবর ।
কিন্তু মরল না এখনও ।
মরীয়া ভেজে দাঁড় বাইছে হাত দু'টো ।

গোপবাসী ৩ ॥ ও কি আর পারবে পৌঁছতে ?
দেখছ না, সরোবর হয়ে উঠছে ফোঁসা সমুদ্র ।
এখনো যদি ফিরে আসে

গোপবাসী ৪ ॥ ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ ।
এখন কী আর ও এগোচ্ছে ?
ওকে নিজের ছোবলের দিকে টানছে
কালনাগিনীর অগ্নিশ্বাস ।

ক্রন্দনরত যশোদার প্রবেশ ।

যশোদা ॥ কানাই, কানাই কোথা, প্রাণের প্রদীপ ও কানাই,
এ কী করলি ওরে বাছা, মুখের খাবার ফেলে কেন বললি, যাই ।
এ যে মৃত্যুঝাঁপ, এ যে মরণকে স্বেচ্ছা-আলিঙ্গন
এত মৃত্যু থেকে তোকে বাঁচালাম, ওরে বাছাধন
মাতৃক্রোড় শূন্য করে তবু চলে এলি সেই মৃত্যুকুণ্ডে, বিষে ?
হে ঈশ্বর ! অন্ধ করো, পাথরে পাথরে মারো শিরে ।

বৃদ্ধের প্রবেশ।

বৃদ্ধ ॥ থাক্। ওকে যেতে দাও চূড়ান্তের দিকে।

কালের কল্লোল ওঠে ইতিহাসে, একেকবার ওঠে
তখনই পরীক্ষা, কার ধমনীর রক্ত কত লাল।
তখনই পরীক্ষা, কার চেতনায় কোন্ পাপড়ি ফোটে।
ভাঙে সীমারেখা, ভাঙে ছায়াপথ উল্কার উল্কায়,
শক্তি, শৌর্য পেয়ে যায় ভিন্নতর সীমার বিস্তার।

সখীসহ রাধার প্রবেশ।

যশোদা ॥ বলে দাও, ওগো অন্তর্যামী,
দেবকীকে কী জানাব আমি?
কী করে দেখাব তাকে মুখ?
শতখণ্ড হয়ে যায় বুক।

সখী ১ ॥ ডুবে গেল, ডুবে গেল, না ভেসেছে।
ভয়ার্ত পাখায়।
কী করে পারবে, বাকি এখনো যে অনেক সাঁতার।

রাধা ॥ যদি পারে, যদি পারে
যদি আনে উজ্জ্বল উল্কার,
খুলে দেব সর্ব অঙ্গ থেকে
সর্ব অলঙ্কার।

যশোদা ॥ জেগে আছি, কেন জেগে? কেন আমি মরি নি মূর্ছায়?
তোমার শাসন কই? হে আকাশ। বজ্রও কই?
এ কোন দুয়ার ভাঙে, মমতা চৌচির হয়ে যায়।
আমার আঙুলে যদি পদ্ম ফুটে থাকে কোনো দিন
ওরে বাছা, সে-দোলনে শুধু একটিবার ফিরে আয়।

গোপবালী ১ ॥ দেখ, দেখ, সে এখন কালীয়-র কাছাকাছি প্রায়।

গোপবালী ২ ॥ আসন্ন মৃত্যুরও কাছাকাছি।

গোপবাসী ৩ ॥ একী এত আলো, এত আলো কোথা থেকে ?
আকাশে কী শতসূর্য নাকি ?
বিস্ময় বোধের সীমা পার হয়ে যায় ।

গোপবাসী ৪ ॥ বিস্ময়ের আলো বহু বাকি
পটচিত্র বদলে যাচ্ছে দ্রুত ।
সূর্য পুনঃ স্বাধীন সম্রাট
ষড়যন্ত্রকারী পরাভূত ।

গোপবাসী ৫ ॥ ওদিকে কৃষ্ণও তার প্রতিজ্ঞার প্রান্তে উপনীত
কালীয়র আক্রমণে তাকে তো হয় না মনে ভীত ?

সখী ১ ॥ একী স্বপ্ন, নাকি সত্য, নাকি জলভ্রম ?
ও যে কালীয়-র সাথে করে যুদ্ধের উপক্রম ।

সখী ২ ॥ কালীয় জড়ায় পাকে পাকে তার লেজে
অগ্নিশ্বাসে টলে পড়ে নিস্তেজে ।

রাধা ॥ যদি পারে, যদি পারে
প্রতিহত করতে আক্রমণ,
নিজ হাতে সঁপে দেবো তাকে
নিজের যৌবন ।

গোপবাসী ১ ॥ এইবার শেষ দৃশ্য
গরল বিছোবে ঘুম স্নায়ুতে স্নায়ুতে ।

গোপবাসী ২ ॥ সেটাই তো ছিল স্বাভাবিক
কিন্তু মরা দেহ যেন দীপ্তি পায় নতুন আয়ুতে ।

গোপবাসী ৩ ॥ দংশনে দংশনে বিষ
মৃত্যুবিষ, আগ্নেয় গরল ।
আর জলে ঢেউ নেই, নত ফণা ।
স্তম্ভিত তারাও
দংশনের এতখানি বর্বরতা দেখে নি কখনো ।
সত্যিই পরীক্ষা আজ
অনন্ত পতন, নাকি
তার পরে আছে উত্তরণ ।
কৃষ্ণপক্ষ চিরস্থায়ী হবে কিনা তারই নির্ধারণে

দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি,
ধ্বংস ও জীবন।
প্রকৃতি কি ফিরে পাবে আবার শ্রাবণ
তারই নির্ধারণ দুই যোদ্ধার স্বাক্ষিকে।
ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস হবে কিনা, তারও।

গোপবালী ১ ॥ কালীয়র জিভ থেকে অগ্নিচুল্লা নিভে গেল কী করে হঠাৎ ?

গোপবালী ২ ॥ কালীয়র কণ্ঠ চেপে কৃষ্ণের সাঁড়াশি, দুটি হাত।

গোপবালী ৩ ॥ কালীয় বমন করে রক্তস্রাব, তাতে হিংস্র দাঁত।

রাধা ॥ জয় হোক, জয় হোক, এসো জয়, দ্রুত দ্রুত অতি,
হে কৃষ্ণ, তুমিই আজ আমার পরমতম পতি।

বৃদ্ধ ॥ মৃত্যু সে উত্তীর্ণ হল।
মৃত্যুর মাথায় চেপে ঐ দেখ নৃত্যছন্দ তার।
যুদ্ধাগ্নির রক্তরেখা মুছে
কালীদহে ফিরে আসে আবার হীরক-দ্যুতি জল।

এত মৃত্যু মানুষের, তবু জয়ী হল মানবতা।

সমবেত কোরাস ॥ সন্ত্রাসের মৃত্যু হল
জননীরা ফিরে যাও নিশ্চিন্ত নিদ্রায়
ফিরে এসো মুক্ত আলো
মুক্তির উল্লাস তোলে তমালতালীর বনরাজী
অগ্নিদাহ মুছে দাও প্রান্তরের পোড়া পাঁজরের
তৃণেরা তৎপর হও নিসর্গের ভূমিকা নির্মাণে
পাখি গাও পুনরায় গগনের গানগুলি গাও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মজীবনীর খসড়া

বাঁশী বাজানো শিখতে শুরু করেছিলুম উঠতি বয়েসে
সবাই বললে, ওরে, ও কর্ম করিস নি
গরিবের ছেলে দিন রাত বাঁশী ফুকলে নির্ঘাৎ টি বি
ত্রিপুরা থেকে কিনে আনা প্রিয় বাঁশীটি দান করে দিলুম এক বন্ধুকে
সে দু' চারদিন ফুঁ দিতে না দিতেই
মথুরার রাজা হয়ে চলে গেল
আমার টি বি পোকায় খায় নি, খেয়েছে পঙ্গপাল !

পকেটে যখন ট্রাম-বাস ভাড়ার বিষম টানাটানি
তখন এক শুভানুধ্যায়ী প্রস্তাব দিলে, একটি প্রাক্তন সুন্দরীর
আত্মজীবনী লিখে দিতে পারবি ?
সে নাকি এক সময় ছিল বাংলা সিনেমার বিবি, এখন কোনো এক
সাবান ব্যবসায়ীর ঘাঁড়
স্ত্রীলোকটির কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল, কিন্তু পারিশ্রমিক দেবে ভালোই
মন্দ নয়, বলে আমি পা বাড়াতেই মঞ্চ থেকে নেমে এলে
শিশির ভাদুড়ী আমার গালে কষালেন এক থাপ্পড়
আমি রাগের মাথায় ঝটিতি কিছু করে ফেলার আগেই
তিনি নিজেই ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে, এবং অজ্ঞা !
এরপর নির্জন রাতে নিজের পৌরুষটি হাতে ধরে বসে থাকা ছাড়া
আর উপায় কী ?

তারপর সেই এক ধাক্কা হাঙ্গামার সাড়া জাগানো বছরে
সামান্য কমু দাড়ি রেখেছিলুম ও লুঙ্গি পরে ঘুড়ি ওড়াতুম বলে
বেমক্কা আমাকে সন্দেহ করলো মুসলমান বলে হিন্দুপাড়ার বীরপুঙ্গবেরা।

তখন নিরীহ মুসলমান ভিসওয়ালা কিংবা শালকরদের
মাথা খেঁৎলে দেবার জন্য বেরিয়েছে অসংখ্য বাঁশ ও শাবল
ওদিকে অন্য কোনো পাড়ায় ছোটজাতের হিন্দুরাও
কচুকাটা হচ্ছে টপাটপ
তখন একজন আমাকে বললেন, পেণ্টুল খুলে দেখা তো
শুয়োরের বাচ্চা
আমি প্রকৃত শুয়োরের বাচ্চার মতন উদোম হতেই
তাবৎ পৃথিবী কেঁপে উঠলো জন্তু-জানোয়ারদের পুলক শীৎকারে
বস্তুত আমার ঐ ব্যাপারটির সঙ্গে খাঁড় না শুয়োরের বেশী মিল,
সে সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই !

বন্ধু বলে যাদের জড়িয়ে ধরতে গেছি, তারা পিঠ ফেরাতেই
ঢেলেছে বিষ
সেই বিষে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, নির্জনতা খুঁজতে গেছি রঙ্গালয়ে
এই তো দেখছি কয়েকটি বহুরূপী এখানে সেখানে লেখা ছাপাবার জন্য
গোপনে উমেদারি করে যায়, আবার
বাইরে গ্যালারি কাঁপাবার জন্য তুলে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জিগির
কেউ গায়ে জড়িয়েছে সুবিধেবাদী মার্ক্সবাদের নামাবলী, মাথায় টিকিতে
জবাকুসুমের মতন বেঁধে নিয়েছে লেনিনের নাম
তারপর দুরন্ত সত্তর দশকে চেয়ার ভেঙে সামান্য আহত
কমরেড মাও সে-তুঙ আমায় বললেন,
চলো, নদীতে গিয়ে ওসব অতি বিপ্লবীপনা ধুয়ে ফেলি
আমি জলের নামে ডরাই শুনে উনি হেসে বললেন, ভয় কী,
আমি তোমায় সাঁতার শেখাবো
এরকম কথা-না-রাখা যেন ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ভিগবাজি
তিনি নিজেই টুপ করে ডুবে গেলেন বিস্মৃতি গভীরে
আমি এখনও খাবি খাচ্ছি.....

কমল চক্রবর্তী

ভোরের পাঁউরুটী

ঘুটার চালাতে গিয়ে হেলমেট পরতে হয়েছে ।
শিরস্ত্রাণ ঢাকা কিছু রঙীন আপেল টের পাই
যে সব ফলের জ্যাম ভোরবেলায় পাঁউরুটীতে থাকে
গাছের দুধারে চাষ্ মাঠ, ঠিক টিলা নয়
পাহাড়ের মত আড় হয়ে পাথর রয়েছে বহুকাল
এখানে হেলমেট খুলে নির্জনতা টের পাই
তিন বাদলের রাতে ছিঁড়ে আনা দারুমগ্ন-ফল
যে ফলের জ্যাম তৈরী হলে রাঙা হয় ভোরের পাঁউরুটী ।

রাত

তাল্লুক, ভাবের গাড়ি রাত থাকতে এসেছে আবার ।
শহরের ফাঁকা রাস্তা
যে শহর জংগল, সমুদ্র থেকে বহদূর
কারখানা দুদিকে ছড়ানো
কিছুদূর হেঁটে গেলে টেলিফোন বুথ পাওয়া যায় ।

বাঁয়ে সরে গিয়ে হর্ন দাও—
পথে লোক নেই, জুতো পড়ে আছে
গাড়ি ভেঙে সাঁড়াশি চিবিয়ে কুকুরেরা
ফিরে গেছে পাণ্ডব শিবিরে ।

শুঁড়ীর মেয়ে

এই মেয়েটী আমার বৌ। এই মেয়েটী শুঁড়ীখানায় জন্মেছিল।
ওর বাবা শুঁড়ী। মা মাতাল। ওদের বাড়ির চালে
আঙুরলতা। ওদের রাখাল আপেল বনে ঘুমোয়।
ওদের ভাটির টানে মৌমাছি, ভ্রমর উড়ে আসে।

এই মেয়েটী সারাদিন আপেল সাজায়।
এই মেয়েটী সারাদিন মহুয়া ফোটায়।
সারাদিন আঙুর রসে কেংসি ভরে, ব্রাণ্ডার, বোতল পাচার করে।
এই মেয়েটী রাত থাকতেই ফলের গন্ধে উঠে পড়ে।
ফলের ছায়ায় স্নান করে।

ভীষণ লাজুক শুঁড়ীর মেয়ে, সমস্ত দিন মদ চেনে আর মদ ঢালে
ওর সারা গায় আঙুরলতা, আখের হাওয়া
ওর সারা গায় গুড়ের চোলাই
ওর হাসি গান চুনু কান্না স্মৃতি লজ্জা ব্রাক্ষারিষ্ট
ওর সঙ্গে আর এঁটে উঠছি না, যখনই রাগছি
হাজার বোতল ফেটে যাচ্ছে, ছিপির মুণ্ডু উড়ে যাচ্ছে।

এই মেয়েটী শুঁড়ীর কন্যা, এই মেয়েটী আমার বৌ।

শহর সংস্করণ

পাহাড়ী শিউলীর গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লেই আজও বোঝা যায়, জামশেদপুরে পুজো এসে গেছে। ধলমা পাহাড়ের চূড়োয় জমে থাকা কালো মেঘ কখন রং পাল্টে রুপোলি হয়ে গেছে। জুবিলী পার্কে গেলে বোঝা যাবে গাছ-পালা খুব ঘন সবুজ, বড় বড় বাঘা ঘাসে চারধার থৈ থৈ। বাগাকুদা লেকের জলও এখন কাকচক্ষু। আর আমাদের ছোটনদী সুটো এখন আর আঁকে-বাঁকে নেই, মোটা গাব্বুস।

□

পূরবীদির ছিল দারুণ ঋতু জ্ঞান। বলে দিতে পারতেন কোন্ কবিতা শীতে পড়া উচিত কোনটা গ্রীষ্মে বা শরতে। কোন্ কথা বর্ষায় বলা উচিত কোন্ কথা হেমন্তে। কখন রোদে পিঠ ছড়িয়ে বসে আড্ডা দেওয়া উচিত কখন আফ্রিকার বুশম্যানদের নিয়ে। এক একজন মানুষ পারেন। এক একজন মানুষ পূরবী মুখার্জী হন। কালে ভদ্রে এক একজন ঈশ্বরী পৃথিবীর ছোট ছোট তামাসার মধ্যে বেড়িয়ে যান—দূর থেকে দেখে বোঝা যায় না।

সত্যি কথা বলতে কি ওঁকে নিয়ে এখনও শহরের কেউ কেউ কবিতা লিখে চলেছেন। এখনও টিভি, বোনাস, স্ক্রীজে আকীর্ণ এই বৃক্ষহীন, ধুসর, তপ্ত, মরুদেশ, যেখানে যতদূর চোখ যায় একটা গম্ভীর অথচ আকাশ ছোঁয়া ন্যাগ পাহাড় বা মহাভারতে কোথাও নেই, সেখানে পূরবী ফিরে ফিরে আসেন। নানা প্রসঙ্গে নানা স্বপ্নে, নুনহীন শুকনো ভাতে, হেঁপোরুগীর বিছানার পাশে, বৃক্ষহীন, শালগাছহীন জামশেদপুরের রাস্তায় বারবার তাঁকে আবিষ্কার করি। এক আজন্ম ভিক্ষুক মুহূর্তে পাহাড়ী চন্দনার পালক নিয়ে, বনশিউলী নিয়ে তার আরাধনা করি। পূরবী, তুমি অবিনশ্বর, এক আশ্চর্য স্বপ্ন অধ্যায়ের নামান্তর। আজ সত্যি মনে হয় তাঁকে কখনও দেখিনি। পূরবী নামে একটা লোকগাথা এই প্রাচীন কালিমাটিতে প্রচলিত ছিল, আমরা সেই করুণ রসের কাব্য কখনও পড়েছি মাত্র। পূরবী আসলে কাহিনী।

□

যেমন শহরে পুজো, আড্ডা, উঠে যাওয়া ৫/৬টি বিখ্যাত লাইব্রেরী, অপূর্ব ঘরোয়া থিয়েটার, যাত্রাদল দুঃখে আপ্লুত করে, তেমনি পূরবীকে হারানো। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর অস্তিত্ব আজ অনিবার্য ছিল। যখন অমিতাভর মত ছেলেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, শহরে সিনেক্লাব করেও মানুষের সাধুবাদ পায় না তখন মনে হয় তাঁকে দরকার ছিল। তিনি অমিতাভকে নিশ্চয় একটা শিরোপা দিতেন। ভাবা যায় না মৃণাল সেনের ঐ অপূর্ব চিত্র প্রদর্শনী। রিলিজ হবার আগে জেনেসিসের প্রোজেকসন। কোন্ জাদু বলে ছেলেটি দিনে দিনে অমিত শক্তিধর হয়ে উঠছে জানিনা। তবে একথা এখানে লেখা থাক কৌরবের ঊনপঞ্চাশ মারুতের পর অমিতাভের মত জেদী, আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মক্ষম ছেলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা পাইনি।

□

আমাদের প্রণব দে, তপু, রুদ্র, টুকুনের কথা মনে আছে। ওদের পাহাড় পরিক্রমা এবং শহরে এই খেলাটিকে জনপ্রিয় করা সত্যি শ্লাঘার। বিশেষ করে প্রণব যেভাবে দল্লার জন্য কাজ করে চলেছে তা, মাত্র কিছুদিন আগেও আমরা ভাবতে পারতুম না। আজ দল্লা মানেই প্রণব, একথার অন্য মানে হয় না। তপু একটি জাপানী এক্সপিডিসন টিমের লিয়াজঁ অফিসার হয়ে গত ১৩ আগষ্ট শহর ছেড়েছে এই খবর শহরের শত শত ছেলেকে উজ্জীবিত করুক।

বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী মীরা গুপ্ত এবং মহাশ্বেতময় বাদল গুপ্তর এ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া সত্যি আমাদের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। শ্রীমতী গুপ্ত শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্যই স্মরণীয় নন, তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল সুন্দর একটি সংস্কৃতি সংস্থা, ব্রতী, যারা নাটক, গান, নাচ ইত্যাদির মাধ্যমে এই পোড়া মফস্বলে অন্য আবহাওয়া তৈরী করেছিল। এই সংস্কৃতি রসিক দম্পতির ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভালবাসা বহুদিন মনে থাকবে।

সুজিত চ্যাটার্জীর বসার ঘরটিই হয়ত আমাদের শেষ আশ্রয়। নাটক, কবিতা, সিনেমা, পাহাড় ভ্রমণ, লোকশিক্ষা, বালবিবাহ থেকে আরম্ভ করে বেঙ্গল ক্লাব, মিলনী, কেবল্ অফিসার্স ক্লাব সমস্ত মরা ধমনীতে সুজিত চ্যাটার্জী, রঞ্জিত

চ্যাটার্জী এবং নীলিমা চ্যাটার্জী রক্ত, সেলাইন দিয়ে চলেছেন। কিন্তু একাহাতে কদিন পারবেন জানি না।

□

ধীরাজ জানা তার হাবিকেন ট্রায় অব্যাহত রেখেছেন। আজ দিল্লী, কাল কোলকাতা, পরশু তার বেনেগল কিম্বা কাকদ্বীপে গৌতম সান্নিধ্যে, তার চংক্রমণ চলছে। এর ফাঁকে ফাঁকে ছেপে চলেছেন সিনেট, নাট্য সমাচার। একক চেষ্টায় দাদাঠাকুরের পর এমন দৃষ্টান্ত বিরল। যখনই বিশেষ কোন ব্যাপার শহরে হয়, ঠিক ধীরাজ জানার বুলেটিন প্রকাশিত। সেদিন সেলুলয়েড চ্যাপটারের পরিবেশনায় 'নাজারিন' দেখতে গিয়ে দেখি বুলেটিন। কিন্তু অবাক লাগে, দর্শকরা উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, দ্রব্যমূল্য হিসেবে সামান্ত অনুদানেও যখন মুখ বিকৃত করেন। তরুণ বিশু পাগল ধীরাজ জানা লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে প্রত্যেকটি সংস্থা, ক্লাব, অনুষ্ঠানে যথারীতি উপস্থিত হয়ে চলেছেন। জয় হোক!

□

এক বছর বন্ধ থাকার পর বেঙ্গল ক্লাবের বইমেলা ফের শহরে আড্ডার মেজাজ নিয়ে এসেছিল। বেঙ্গল ক্লাব না হলে কিছু কি জমে! ৭—১৬ সেপ্টেম্বর। রাশিয়ার ভারত উৎসবে শহরের বেশ কয়েকজন আলোক চিত্রীর ছবি মনোনীত হয়েছে। কয়েকটি নাম মনে পড়ছে, চন্দ্রদেব ভকত [১০ বছরের কিশোর] ভূদেব ভকত, তড়িৎ ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি মুখার্জী। এই আনন্দের খবর শহরের মরা গাঙে জোয়ার এনেছে।

পরপর দুটি সফল অনুষ্ঠানের পর বেঙ্গল ক্লাবে রবীন্দ্রমেলা উত্তীর্ণ না হওয়ায় ফের চিন্তিত বোধ করছি। ফের সাধারণ মানুষেরা বলা শুরু করেছেন এখানে আজকাল কিচ্ছু জমে না। অথচ কৌরবের কবিতার অনুষ্ঠানে পাঁচ/দশ টাকার টিকিট কেটে ৬০০ শ্রোতা ছিলেন। বেঙ্গল ক্লাবের মানবেন্দ্র এবং ললিতার গানের জলসাতেও ৬/৭ শ' শ্রোতা। সরাসরি উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছি। যেমন গত বছরে বিহার বাঙ্গালী সমিতির সবুজ সঙ্ঘে মেলা, একটি হাস্যকর ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়। অথচ উপস্থিত ছিলেন সবিতাব্রত দত্ত,

সুশীল মল্লিক, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি নামী দামী শিল্পীরা। খানাপিনার ব্যবস্থা ছিল। তবে হৃদয় ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, মনন ছিল না, পঠন পাঠন ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল না, আদর্শ ছিল না, সমস্ত না সম্বল করে একটা মেলা করার দুঃস্বপ্ন যা স্বাভাবিক ভাবেই ভুবন মেলাকে ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টা হাস্যকর হয়ত মফস্বলের মানুষ দেখে না, যেন যারা শিল্পমনস্ক হয় স্বয়ংভু, বিচ্ছিন্ন। পূরবীদি যে বলতেন, তরোয়াল দিয়ে ঘাস কেটো না, তা সত্যি। ভাগ্যক্রমে ঐ অস্ত্রটি আমাদের করায়ত্ত। সাধারণত এই লোহা সভ্যতাকে কিছু বলা হয় না তবু কখনও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে একটু লিখে ফেলতেই হয়, সেই অনাগত তরুণের জন্য যে সাহিত্য শিল্পের প্রকৃত মর্মে সাঁতার কাটবে, কেবল লৌহ ক্রীতদাস হবে না। টাটাবাবার ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে যাবার বুকের পাটা রাখবে। কারণ একথা আমরা বারবার বলেছি টাটাবাবার ফাঁস ভীষণ শক্ত। অনেক তরুণ, তাজা প্রাণ দেখেছি, অনেক উৎসাহ নিয়ে এখানে এসেছে বছর ঘুরতে না ঘুরতে কার্নেসে, লেদে, কম্পিউটারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। শেষ অবধি টিঁকে থাকা যুবক আমরা খুব বেশি দেখিনি।

বরং আরও একটু সৎ হওয়া গেলে বলা যায়, এই অসম্ভব আবহাওয়ায় সাহিত্য শিল্প একটি অবাস্তব শব্দ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কৌরবের আগেও এ শহরে সিরিয়াস সাহিত্য ছিল না, কৌরবের পরেও থাকবে না। এ এক ক্লিক অব্ নেচার। পূরবীদি বলতেন, তোমাদের এ শহরের ছেলেরা বোনাসের পয়সায় টেরীকটের ড্রেসই শুধু পরবে আর স্কুটার চালাবে। পৃথিবীর কোনও প্রান্তের কোনও খবর এরা রাখে না। সেদিন পূরবীদির সঙ্গে গলা তুলে ঝগড়া করেছি। আজ দেখছি, সত্যি। এমন কি দুর্গা পুজো করার মত উৎসাহী ছেলের অভাব চরম। কিন্তু পূরবীদি যে কথাটা জানতেন না সেটা হোল, এই আবহাওয়া। এ কল-কারখানা রক্ত থেকে 'বিপন্ন বিস্ময়' শুষে নেয়। মানুষের জন্মগত সৃষ্টির প্রেরণা নিভিয়ে দেয়। একটা ভোমও বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করে। কিন্তু একজন জামশেদপুরের যুবক!

□

তবু আকাশ নীলে লালে রঙ্গীন। ভগবানের নীলের সঙ্গে টাটা বাবার লালে যুক্ত। ধুলায় অনাদিকালের হাতছানি। এখনও অনেক বাড়ির উঠোন গোবর

লেপা হয়। আর ঠিক তার পাশে পুরনো একটা শিউলী গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ে। শিশির ঝরে পড়ে। পাহাড়ী হিমে সেপ্টেম্বরের শেষ হতে না হতে হাওয়া উতলা। বেড়ানোর ডানাগুলি কোথা থেকে এসে যেন পিঠে জুড়ে যায়। তারপর যতদূরে যাই, যত বড় স্বর্গে যাই মনে হয়, জামসেদপুর তোমাকে ভালবাসি তোমার নীল, লাল, সবুজে রঙীন মুখশ্রী আমার এ জন্মের শেষ আশ্রয়।

এই ইশটিসানের নাম : কবিতা

ফের গত এপ্রিলে বেঙ্গল ক্লাবে কবিতা পাঠের আসর বসল। কবিতা ঘিরে গত ১৭/১৮ বছর ধরে আমাদের অভিযানগুলি কি পরিমাণ সর্বগ্রাসী হয়েছে পরবর্তী ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। গত দুবছর পর পর দুটি সফল অনুষ্ঠানের পর আমরা ঠিকই করে নিয়েছিলুম আর অনুষ্ঠান নয়, কেবল কাব্য রচনা কিন্তু নানা জায়গা থেকে ফের চাপ আসতে লাগল। বিশেষ করে দুর্মুখরা বলল, এ শহরে কোন অনুষ্ঠানই জমে না, বড় জোর এক দেড় শ'।

জামশেদপুরে মানুষকে প্রতিষ্ঠানের ভোয়াক্কা তাদের স্বাভাবিক খুদে চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আমরা ফের একবার ক্ষেপে গেলুম। বললুম, মানুষ ঠিক আছে তোমরা বামন বেঁটে।

আমাদের প্রতিষ্ঠান বলতে, কয়েকটি ছাপা পৃষ্ঠা ঘিরে দুচারজন। কিন্তু সঙ্গে পেলুম পার্থ চন্দ, সুজিত চ্যাটার্জী, সুব্রত ভট্টাচার্য, দীপক চ্যাটার্জী, অমিতাভ ঘোষ, আশিষ চৌধুরী, প্রণব দে, প্রতীক দে, নেপাল দেবনাথ, বীরাজ জানা অনেক মানুষ। কিন্তু এরা করবেন কি ? অনুষ্ঠান হচ্ছে পদ্য পাঠ ! আসরে উপস্থিত থাকবেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিয় চট্টোপাধ্যায়। রণজিৎ রায় সুকুমার রায়ের গান গাইবেন।

দিন যায় টিকিট ৫।১০।২৫ টাকা ফের হয়ে। শেষ ৬/৭ দিন। টিকিট ফেরত আসছে। কি করব জানিনা। আমাদের যে কোনও অনুষ্ঠানের মধ্যমণি রবি মুখার্জী, যিনি খাদ্য, আশ্রয়, অর্থ, যানবাহন সমস্ত দিয়ে সাহায্য করেন, বললেন, হয়ে যাবে, ভেবনা। মায়া বৌদি [মুখার্জী] বললেন, লড়ে যাচ্ছি, দেখা

থাক শেষ অবধি কি হয়। তবে গত বারের মত হবে না। হাজার তিনেক খরচ। বেঙ্গল ক্লাব আমাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধু ওদের সঙ্গে যৌথ অনুষ্ঠান, তবু বিক্রি মাত্র শ' দুয়েক। খরচ উঠছে না।

ঠিক সেই সময় দেবদূত বাবলা [অরিন্দম গুপ্ত] কলকাতা থেকে হাজির। একেবারে হিন্দি সিনেমার হীরোর মত। বলল কাল থেকে কাজে নামছি দেখি কি হয়। সঙ্গে বাজা [প্রতীক দে]। আট বছর পর এ অঙ্ক আমশেদপুর, বাবলা, এ শহর তুমি চেন না। বাবলা বলল চিনি। অনুষ্ঠানের আগের দিন এক হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেল। আর হোল না।

কবিতা সভার জন্য দুটি যুবক যা করল, এ নজীর আর আছে কিনা জানিনা। এবং একথাও সত্য এরা কবিতা লেখে না। যৌবন, ভালবাসা, নিষ্ঠা আজও কবিতাকে ছেড়ে যায় নি যেখানে কলকাতার নাটক এলে ২/৩ শ'র বেশি জনতা হয় না সেখানে কাব্যসভা! ব্রাভো!

নীরেন্দ্রনাথ, অমিতাভের অসাধারণ কাব্য পাঠ যা শোনা একটা অভিজ্ঞতা। সঙ্গে দুর্জয় সুপ্রিয় এবং সমরেশের গল্প পাঠ। এবং অমিয়, দেবদুলালের ঐ অনুকরণীয় বাচন ভঙ্গিতে আবৃত্তি। শেষ মেষ রণজিতের দুধর্ষ গান। সেদিন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, কৌরবের নববর্ষের অনুষ্ঠান, ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭, আত্মায় খোদাই করে ফিরে গেছেন। আর আমাদের কাছে চরিত্র হয়ে রইলেন, মৃণাল দত্ত, অভী সেনগুপ্ত এবং প্রদীপ পাল। যারা শুধু কৌরব অনুষ্ঠান সার্থক করতে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করে এসেছিলেন।

দুপুরে রবি মুখার্জীর বাড়িতে ছিল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। হাসি ঠাট্টা গল্পে দুপুর গড়িয়ে গেছে স্মরণীয় তীর্থের দিকে। আর রাতে, বিলেত ফেরত ডাক্তার সুধা দত্তের বাড়ির ছাদে মধ্যরাত অবধি সেই ভাসমান জাহাজে আমরা কি খুব বেশি ইতিপূর্বে চড়েছি! দিন যায়। মানুষের পৃথিবী আকৃতিতে বদলে যায়, প্রকৃতিতে থেকে যায় কবিতা হাসিগান আড্ডা চাঁদের নীচে স্বপ্নবিভোর কিছু মুহূর্ত। আর নীরেন্দ্রনাথের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে ঠুকে কিন্নর কণ্ঠে গান, সঙ্গে শতশত কণ্ঠে কোরাস—'এক রূপসী অল্প বয়সী চলসে গাঙের ঘাটে'—কোন দিন আমশেদপুর ভুলতে পারবে কি?

কল্পনা নেই। চারমাস আগে সে আমাদের ব্যর্থ শোকগ্রস্ত রেখে চলে গেছে। মাত্র কিছুদিন হল আমরা হারিয়েছি পূরবীকে, এবার কল্পনা। হঠাৎ মনে হোল রবীন্দ্র কাব্যের নামে নাম আর আমাদের কেউ নেই তো!

কল্পনা, টেলকোর সবাই চেনে, কারণ তার অদ্ভুত কুকুর প্রীতি। কুকুর প্রীতি মানে ল্যাপ ডগ কোলে নিয়ে নেকামি নয়, রাস্তার কুকুর। মনে আছে প্রায় ২০/২৫ টা পথের কুকুরের জন্য ওর পাউরুটী, বিস্কুট, দুধের বরাদ্দ। একদিন লম্বা সাঁড়াশী নিয়ে কুকুর ধরা গাড়ি এল। কল্পনা প্রথমবার তো ঘুস দিয়ে বিপদমুক্ত হোল। কিন্তু সে জানতো এভাবে চলবে না। ফলে ঐ ২০/২৫টা কুকুরের জন্য লাইসেন্স করিয়ে ফেলল। এবং আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের জন্য ভাত, পাউরুটীর ব্যবস্থা করতে লাগল।

আমাদের সাহিত্য যখন সবে আকার পাচ্ছে তখন সে একদিন দিল্লি থেকে বারীন ঘোষালের স্ত্রী হয়ে এ শহরে এসেছিল। আমাদের অনেক ব্যর্থতা, না পারা, হয়ে ওঠার প্রথম জীবনের বান্ধবী, সে আজ নেই। এখনও কি ভোলা যাবে চাঁদীপুর বা বেতলার সেসব দিন। কল্পনার উচ্ছল, প্রাণ চঞ্চলতা। আমাদের না হওয়া সাহিত্যের মিউজ।

কিভাবে ক্রমশ ব্যর্থতার সঙ্গে মৃত্যু বাসা বাঁধছে। আগে ছিল কেবল সাহিত্য না হওয়ার অন্ধকার। এখন কালো ডানার ঝাপট লাগছে। আর কোনদিন কল্পনার সঙ্গে দেখা হবে না। মাত্র ১৪ বছর আগে এক বর্ষায় ওকে ফুলের সাজে নিয়ে এসেছিলাম। ফের ফুলের সাজে সুবর্ণরেখা ঘাটে নিয়ে গেলাম। এখন সুবর্ণরেখা ঘাটে কাঠের বদলে বিদ্যুৎ হয়েছে। সুবর্ণরেখা অনেক দূরে সরে গেছে। বালিয়াড়ি দীর্ঘতর। কালো পাথরে অনবরত জেগে থাকা জীর্ণ নদী। চিতার শিখা নেই। আমাদের সাজিয়ে দেওয়া রজনীগন্ধা মাটিতে পড়ে। সঙ্গে গেছে কেবল চন্দনের কৌটা, পা রাঙানো আলতা।

কল্পনা নেই। ঘর অন্ধকার হলে শুনতে পাই তিন বছরের শিশু বলছে, 'আমার মাকে ফুলে সাজিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!' দুপাড়ে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, মাঝে খুব সরু অপোর সুতো না জল। সেই জল ধরে হাঁটছি আমরা ক'জন তখন, কল্পনা, বারীন, সুভাষ, অমেশ সেন। একটা কালো মরচে পড়া সাঁড়াশী

মাঝে মাঝে দেখতে পাই, কে আমাদের বাঁচাবে কল্পনা নেই, পূরবীদি নেই।

মে মাসে যখন সিংভূমের পলাশ লাল দুর্গ তৈরী করবে, যখন শেষ শালফুল ঝরে পড়বে টিলায়, শুরু হবে কাঞ্চনে কুচিতে যুদ্ধ তখন ঐ ছোটখাট হাসি হাসি বন্ধুর জন্য প্রতিবছর চোখের জল পড়বে। আমাদের পূরবী আছে কল্পনাও।

কৌরব : ৫০

আগামী সংখ্যা কৌরব ৫০। কখনও ভাবছি কলকাতায় গিয়ে তথ্যকেন্দ্র ভাড়া করে তিন দিনের অনুষ্ঠান করা হবে। কখনও ভাবা হচ্ছে ফের আমবাগান ইস্কুলে ভুবনমেলা করে ৫০ হবে। ডাঃ সুধাদা ভীষণভাবে চাইছেন যাতে মেলা ফের বসে। কেউ বলছেন, না বেঙ্গল ক্লাবে তিনদিন উৎসব হোক। একদিন পদ্য, একদিন কবিতা, একদিন নাটক এবং গান। আবার একদল বলছেন, না আর কিছু নয়, কয়েকজন মনের মত সাহিত্যিককে নিয়ে দমদার মউকলি বাংলোতে তিন চারটে দিন, নির্জনে, কৌরব ৫০ প্রকাশ করা যাবে।

এ শহরের মানুষ কি জানেন, একটি লিটল ম্যাগাজিনের ৫০ পূর্তির অর্থ কি? তারা কি কখনও দেখেছেন কোনও লি. ম্যা. ৫০ হয়েছে? তাদের কি কিছু করণীয় আছে? কোনও অহংকার। কোনও আত্মমর্যাদা!

□

পুজোয় তুতানের একটা গল্প থাকতো। যেমন পূরবীদির এবারও আছে। কিন্তু কোথায় যেন কিছু কিছু চ্যুতি বিচ্যুতি হয়েছে। ওর সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। মণ্ডপের আলোয় খুঁজি। এবারও খুঁজব। খুঁজে পেলে বলব, তুতান পুজোয় জামশেদপুর সব থেকে সুন্দরী। কতদিন হয়ে গেল কত চিমনী বেড়ে গেছে, তবু মনে হয় আজও জামশেদপুর ঘোড়শী। আজও চাকের বাদ্যি দু পাহাড়ের প্রতিধ্বনি হয়ে শুনতে পাই, 'ভালবাসি', 'ভালবাসি।'

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক সমাজের দর্পণ নাকি প্রতিরূপ

[বর্তমান প্রবন্ধটি এক সুদূরপ্রসারী গবেষণার সূচনা স্বরূপ। শীর্ষনামে লেখক উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসায় এখানে চিনতে চাওয়া হয়েছে ভারতীয় নাট্যধারার উৎসমুখ, জানতে চাওয়া হয়েছে তার রহস্য। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর বহুদূর।
—কৌরব]

প্রখ্যাত সমালোচক রেমণ্ড উইলিয়ামস "নাট্যভংগীর সামাজিক ইতিহাস" (১৯৬১) প্রসংগে যা বলেন, তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে থিয়েটার একই সংগে সমাজের দর্পণ ও প্রতিরূপ দুই-ই হতে পারে।

"—আমরা নাটককে শুধুমাত্র সামাজিক শিল্প হিসেবেই বিচার করি না, বরং তা পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টির এক মুখ্য ও ব্যবহারিক সূচীপত্র হিসাবে গণ্য।" (পৃ ২৭৩) নাট্যকার তাঁর নাটকের প্লট বা ঘটনা ঠিক করেন কোন ক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তিনি তাঁর নাটকে যে সমস্যাকে তুলে ধরতে চান এবং যে ধরনের চরিত্রদের সাহায্যে তিনি তা করতে চান—এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ এঁকে দেন। বাছাই করার এই কাজটিতে তিনি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের সংগে মানুষের সম্পর্কের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন। বিশেষ শ্রেণীগুলির সুযোগ সুবিধা, দায়দায়িত্ব, কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব, প্রেম, বন্ধুত্ব, ধর্ম, প্রকৃতি, শিল্প সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী সবই ফুটে ওঠে। নাট্যকারের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তির সংগে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্কের সুস্পষ্ট ছবি। নাট্যকার বা সাহিত্যিক ছবহু লিপিবদ্ধ করার সোচ্চার যন্ত্র নন কিংবা নিষ্প্রাণ রহস্যময় অস্তিত্বও নন, বরং তিনি একজন বিশেষ চিন্তাবিদ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ সম্পন্ন হবার পরই সমাজ তার ফলাফল সম্বন্ধে অবহিতি লাভ করে।

নাট্যকার শুধু সামাজিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তির আচরণের বিবরণ দেন না তিনি সংগে সংগে সামাজিক ও চিন্তাগত শক্তি সমূহের পরিবর্তনশীল চেহারার তুলনামূলক উদাহরণও তুলে ধরেন। সংক্ষেপে, মানবচরিত্র সম্বন্ধে সবচেয়ে সাধারণ উক্তি ও ধ্যানধারণাও, গভীর অনুসন্ধানের বীক্ষণে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হিসেবে দেখা দেয়।

মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবন সর্বতোভাবে বিধিবদ্ধ বা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। প্রথা বা নিয়ম ব্যতীত অন্য কোনভাবে মানুষের ক্রিয়া বা কথা প্রকাশ করা যায় না। নাট্যকার থিয়েটারে নাটকের মাধ্যমে যে জগত সৃষ্টি করেন, তা থিয়েটারে অংশগ্রহণকারী মানুষরা যে বাস্তব জগতে বসবাস করেন তা থেকে ভিন্ন; ফলে থিয়েটারে জগত সম্পর্কিত নতুন প্রথা বা নিয়মাবলী সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা নাটকের ভাষাকে এমন ব্যাপকত্ব প্রদান করবে, গুরুত্ব আরোপ করবে, ঐক্যবদ্ধ করবে যা দর্শকের কাছে নাটকে সৃষ্ট জগত, তার তাবৎ কর্মকাণ্ড সমেত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নাটকের কাল্পনিক চরিত্ররা কাল্পনিক জগতের কাল্পনিক ঘটনায় অংশগ্রহণ করে। একটি স্তরে দর্শক ও অভিনেতা পরস্পরকে দেখে— তারা আসলে কী এবং নাটকের এক বিশেষ ঘটনার প্রয়োজনে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

থিয়েটার এইভাবে দুটি নির্দিষ্ট কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত —অভিনেতা ও দর্শকের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নাটকে সৃষ্ট চরিত্রদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রথা ও নিয়মাবলীর দ্বারা আবদ্ধ। অভিনেতৃবৃন্দ ও দর্শকের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত চুক্তি আছে যে অভিনেতৃবৃন্দ নাটকে তাঁদের ক্রিয়া ও উক্তির সাহায্যে এক কাল্পনিক জগত গড়ে তুলবেন এবং এই ক্রিয়া ও উক্তি অথবহ হবে বিশেষ স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও চরিত্রের গণ্ডীর মধ্যে। এগুলির সাহায্যে দর্শককে একথা মেনে নিতে বলা হয় যে চরিত্র ও ঘটনাগুলির প্রাসংগিকতাও যথার্থ থিয়েটারের সীমানায় আবদ্ধ। দ্বিতীয় প্রথা বা নীতি হল নাটকে অভিনেতাদের নাটকের চরিত্র হিসেবে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত। এগুলি হল চরিত্রদের কথোপকথনের রীতি, আচরণ, ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে কারণ, থিয়েটার বাস্তব জগতের অংশ। অতএব দর্শক ও অভিনেতৃবর্গের মধ্যে প্রচলিত নীতি এবং অভিনীত নাটকে

চরিত্রের যে পারস্পরিক নীতিবদ্ধ রূপ তা থিয়েটারে স্পষ্টতঃই পরস্পরের পরিপূরক। অভিনেতৃবর্গ দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন নাটকের বিশেষ কাল্পনিক জগত এবং একই সংগে তাদের বোঝাতে হয় সেই বিশেষ কাল্পনিক জগতের বিশেষ ঘটনায় আচরণ সামাজিক ভাবে বিশ্বাসযোগ্য। এই দুটি পদ্ধতি বাস্তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য।

এ-দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা খুবই দুরূহ যেমন দুরূহ সাহিত্যে আংগিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমারেখা টানা কিংবা শিল্পমাধ্যম ও তার আইডিয়ার মধ্যে সীমারেখা টানা।

নাটক হল দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের যে বিশ্লেষণ তার উপস্থাপনা। সেগুলি সময়োপযোগী বা সময়ের সংগে তাল রেখেই রচিত হয়। উপরন্তু যেহেতু দর্শক হিসেবে জনগণের কাছে থিয়েটারের মাধ্যমে বাস্তব জগতের সামাজিক গতি-প্রকৃতি, কারণসমূহ, সামাজিক ক্রিয়ার ফলাফল অনেক বেশী তুলে ধরা যায়, সেহেতু থিয়েটার হল সামাজিক আচরণের এক ব্যবহারিক কাঠামো বা উদাহরণ।

ভারতীয় নাটকে ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ঃ ভিন্‌টারনিৎসের কথায় নাটকের অন্ততঃ একটি মূল রয়েছে ঋগ্বেদের কথোপকথনমূলক সামগানে, অধ্যাপক ওল্ডেন্‌বের্গ যাকে 'আখ্যান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমরা এ ধরনের আখ্যানের পরিচয় পাই পুরাণগুলিতে, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে। অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, হার্টেল, শ্রোয়েডার দেখাবার চেষ্টা করেছেন উক্ত ঋগ্বেদীয় সামগানগুলির কথোপকথন নাটকের ভংগীতেই লেখা। এই প্রাচীনতম 'আখ্যান' বা 'ব্যালাড'-এর বিষয়বস্তু ছিল দেবতা বা অংশত দেবসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর কাহিনী বর্ণনা। এই আখ্যান বিবৃত হত কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে বা উৎসব উপলক্ষ্যে। কংসবধ আখ্যানে কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যুর মধ্যে আমরা ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত জাদুবিশ্বাসগত অনুষ্ঠানের রূপের পরিচয় পাই। পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাট্যকারদের পুরোধা ভাস, তাঁর 'উরুভঙ্গ' নাটকে উক্ত কংসবধ উপাখ্যানের নীতিকেই সরাসরি অনুসরণ করেছেন, যেখানে নিহত হবে দেবতার শত্রু। কৃষ্ণের যে শত্রু তার শোচনীয় ভাগ্যের কথাই এ নাটকের মূল বিষয়।

প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নাট্যকারদের নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনেক ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে সাহায্য করে ; উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মচারী ও অসতীর কথপো-কথন, যা পাওয়া যায় 'মহাব্রত' যজ্ঞানুষ্ঠানে, যা অশ্বঘোষকে তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ ও গণিকার ঘটনা উপস্থাপনে সহায়তা করে। ভারতবর্ষে ধর্ম এক বিরাট শক্তি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতিরূপ নাট্যভংগীতে অনুসৃত হওয়ার ঘটনা যদি অনিশ্চিতও হয় তবু ধর্ম ও ধর্মীয় পৌরাণিক উপাখ্যান নাটক ও নাট্যভংগীর গঠন ও বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। তাই নাটকের দৈহিক উৎস সম্বন্ধে ভরতের বিবরণী অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে এই ব্যাখ্যায় উপনীত হতে বাধ্য করে যে ধর্ম ও পৌরাণিক কথা বিশেষ নাট্যভংগীতে অনুসরণেই ভারতীয় প্রাচীন নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটে।

প্রাচীনতম দেবতাবিষয়ক নাটকগুলি সম্ভবতঃ ভরতমুনি কর্তৃক প্রযোজিত ও পরিচালিত হয় এবং ভরতের পুত্রগণ ও অপ্সরাবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে দর্শক ছিল স্বর্গের অধিবাসী। এ তথ্য কেবল ভরত নয়, কালিদাসও লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকে উল্লেখ করেন যে নাটকে উর্বশী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ভরত তা পরিচালনা করেন। ভরতের বিবরণ অনুযায়ী দেবতাবিষয়ক নাট্যানুষ্ঠানের প্রথম সূচনা হয় পৃথিবীর দর্শকের কাছে ইন্দ্র মহা উৎসব উপলক্ষ্যে। এই উৎসব পালিত হয় বর্ষার শেষে এবং শীত ঋতুর আগে। সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে স্থানীয় দেবতাদের উৎসব সংক্রান্ত অনুষ্ঠান শরৎ ও বসন্তকালেই অনুষ্ঠিত হত।

অতএব নাটকে বিষয়বস্তুই শুধু নয় অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যও ছিল ধর্মীয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে রাজা নহুষ তাঁর ধর্মীয় কীর্তির বলে দেবতাদের রাজ্যে প্রবেশা-ধিকার এবং দেবতাদের জন্য অনুষ্ঠিত এক নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ঐ নাট্যশিল্প পৃথিবীতে প্রবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা সেই ইচ্ছাপূরণ করেন এবং ভরতের পুত্রগণকে পৃথিবীতে গিয়ে এই কাজ করার নির্দেশ দেন। সর্বোপরি সেই নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্যের ওপরই অভিশপ্ত ভরতের পুত্রদের নীচ পতিত অভিশাপ মোচনের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রহ্মার এই নির্দেশের কথা 'নাট্যশাস্ত্রে' পাওয়া যায়।

এই বিবরণ কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সামাজিক ইতিহাসের চেহারা অগ্রাহ্য করা যায় না। ভরত নামে যদি আদৌ কেউ থেকে থাকেন এবং তিনি যদি মুনি বলে অভিহিত হন, তাহলে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এই ব্রাহ্মণত্ব

তাঁর পুত্রদের ক্ষেত্রেও বর্তায়। কিন্তু নাটকে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে কটূক্তি করার জন্যই তাঁরা নীচ বলে গণ্য হন ঋষিদের অভিশাপের ফলে।

উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল মূলতঃ শুভফলের আকাঙ্ক্ষা বা অশুভ ফললাভ থেকে বিভিন্ন ক্রিয়া ও মন্ত্র উচ্চারণ মারফত অব্যাহতির পথ পাওয়া। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবশ্য এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফলদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অবশ্য অংশগ্রহণকারীদের ওপর এই অনুষ্ঠানের মানসিক প্রভাব থাকতে পারে। এই অনুষ্ঠানের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে যদি বিশ্বাস বজায় রাখতে হয় তাহলে এক অতি জটিল বিশ্বাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বিশ্বাসই যোগায় পৌরাণিক কথা যা অতীতের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যোগাযোগ ঘটায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকেই চিহ্নিত করে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দৃষ্টি থেকে, যার এক অতীত অস্তিত্ব আছে এবং তা সম্পূর্ণতই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীমূলক। অতীতে কখনও কখনও অতিমানবিক ব্যক্তিরা স্বয়ং এই ক্রিয়া কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। পৌরাণিক কথা (myth) বিবিধভাবে কাজ করে—প্রথমতঃ তা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে পবিত্রতা অর্পণ করে দ্বিতীয়তঃ তা ঐ অনুষ্ঠানকে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। অবশ্য এই নিয়মতন্ত্র যতদিন না সমাজে লিখিত ব্যবস্থা রূপে প্রচলিত হয় ততদিন তা মৌখিক পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলতঃ সম্পূর্ণতা পায় না। লিখিত ব্যবস্থা প্রচলনের পর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হিসেবে তা ধর্মগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য মিথগুলি লৌকিক উপকথা হিসেবে সমাজে প্রচলিত থাকে।

দক্ষিণ ভারতের দৃষ্টিগ্রাহ্যমূলক নৃত্যনাট্যগুলির উৎস হল প্রাচীন দ্রাবিড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেখানে দানবের পূজা প্রচলিত ছিল। মুদালাপায়া নামক এক ধরনের নৃত্যনাট্য আছে যার বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যময় রামায়ণের কাহিনী এবং অনেক গবেষকের মতে এটি প্রাকৃত ভাষায় নাট্যানুষ্ঠানের বিশিষ্ট উদাহরণ যা পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটকে প্রভাব বিস্তার করে। 'কৃষ্ণআত্তম' একধরনের নাট্যভঙ্গী যা প্রাচীন রাজদরবারের চারণ, নর্তক ও অভিনেতার সংমিশ্রিত উত্তরসূরী। ১৭শ শতাব্দীতে "কৃষ্ণআত্তম" ভঙ্গী যে বিকাশলাভ করে তা—"স্পষ্টতঃই অনাচার কোপ থেকে মুক্তিসংক্রান্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা দানব বিষয়ক এবং কালী বিষয়ক ধর্মীয় আচারের উত্তরাধিকারী।" [সিংহ ও ম্যালে/পৃ ৫৬]

রঙ্গনাথ তাঁর "দি কর্ণাটক থিয়েটার" গ্রন্থে বলতে চান ভারতীয় নাট্য তার

মৌলিক রূপ পরিগ্রহ করে "ভূত ও প্রেতযোনি" সংক্রান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে যেখানে একাধিক ব্যক্তি "প্রচলিত বিশাল পোষাকে সজ্জিত হয়ে তলোয়ার নিয়ে এক বিশেষ প্রেতমাধ্যমের পোষাকে সজ্জিত ব্যক্তিদের প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করে।" তিনি বলেন "কুশীলবদের শিরস্ত্রাণ ও রূপসজ্জার সঙ্গে 'যক্ষগান' নাটকের চরিত্রদের অসাধারণ সাদৃশ্য"। তিনি বলেন আনুমানিক ৫০টি বিভিন্ন প্রেতের পূজা হয় কর্ণাটকের বিভিন্ন মন্দিরে। বিভিন্ন ধরনের প্রেতবিষয়ক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কিন্তু 'কালিয়াত্তম' নাটকের পূর্বরঙ্গ হিসেবে দারিকা নামক দানব ও কালীর যুদ্ধের নৃত্যকে বিশেষভাবে পরবর্তীকালে ভারতীয় নাটকের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করা যায়। কালী ও দারিকার বিশাল পোষাক উন্মত্ত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক কাঠের পাটাতনে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। "দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বীর চীৎকার, নাটকীয় কথোপকথন, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভঙ্গী এবং তাঁর দানব শত্রু—জনতার উত্তেজনা বৃদ্ধি করে যারা ঢাকী সমভিব্যাহারে বিশাল শোভাযাত্রা করে মন্দির অভিমুখে গমন করে।"

তারপর তারা দুজনে মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের অভিনয় করে। এই অভিনয় সারারাত ধরে চলতে থাকে এবং কালী অবশেষে দানব দারিকাকে হত্যা করে উষার প্রাক্কালে। "এই হত্যাকাণ্ডের মূল উপাদান হল যখন কালী অস্ত্রদ্বারা দারিকার উদরে আঘাত করে এবং তার রক্ত সর্বাঙ্গে মাখে ও পান করে এবং অবশেষে তার পাকস্থলী দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করে"। [Pisharoti/71]

এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাঠামো মূলতঃ দক্ষিণভারতীয় নৃত্যনাট্যের ভঙ্গীকে গঠিত করেছে। "প্রহ্লাদ চরিত্রম" নাটকে, যা ভগবত মেলায় অনুষ্ঠিত হয়, বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহ দানব হিরণ্যকশিপুকে এইভাবে হত্যা করে এবং যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁকে দেখে মনে হয় দেবতার জ্বর হয়েছে।" [বলবন্ত গার্গী/পৃ ১৩৮]

ভারতীয় নাটকের জন্মসূত্র : 'নাট্যশাস্ত্র'র মাধ্যমেই ভারতীয় নাটকের উৎসের প্রমাণসাপেক্ষ যুক্তি পাওয়া যায়। ভরত বলেছেন প্রথম নাটক যা "ইন্দ্রধ্বজা উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত করার পরিকল্পনা হয়; উক্ত নাটকে দৈত্যরা

দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয় (দৈবাসুরম) যা কখনও বাকবিতণ্ডা, হুলুস্থুল্ এবং (কখনও) পরস্পরের অঙ্গচ্ছেদ ঘটায়।" [পৃ ৫৫] উক্ত নাটকের অনেকাংশ 'কালিয়াস্তম' নাটকেরই অনুরূপ যেখানে দানব বাহিকার উদর বিদীর্ণ করেন দানবদলনী কালী। 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী উক্ত নাটকের প্রযোজনায় এক বিপত্তি দেখা দেয়। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে দানবগণ উপস্থিত ছিল, তারা নাটকে তাদের পরাজয়ের বর্ণনায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং অসুরের সাহায্যে বিঘ্ন ঘটায়—"অভিনেতাদের বাকশক্তি, গতিশীলতা এমন কি স্মৃতিশক্তি রুদ্ধ করে দেয় ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রয়োগে।" [১/১৬]। এর অর্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে তুরীয় অবস্থার অভ্যাস করা হয় তা অভিনয়। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করেই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নাট্যের পূর্বসূরী। ইন্দ্র এই সমস্যার সমাধান করেন—জর্জর দণ্ডের সাহায্যে "অসুর ও বিঘ্নশক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন যারা মঞ্চের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করছিল।" [১/১১-৩]। এই বিঘ্নশক্তিই অভিনেতাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে ফলে এক নাট্যগৃহ সৃষ্টি করা হয় যার চারদিকে চার দেবতার স্তম্ভ নির্মাণ করে নাট্যশালা প্রহরার ব্যবস্থা হয় এবং "জর্জরদণ্ডে বজ্র নিয়োজিত হয় যা দৈত্য বিনাশকারী"। অতএব প্রথম ভারতীয় নাটক প্রকৃতপক্ষে নাটক নয় বরং তা উপযুক্ত দানব বিষয়ক ইন্দ্রজাল। এ নাটকে জর্জর দণ্ডের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা অদ্যাবধি কুচিপুড়ি বা ছৌ নৃত্যে প্রয়োগ করা হয়। এই জর্জর দণ্ডের ধর্মীয় স্বরূপ হল, কুআচারী শক্তিসমূহ থেকে নিরাপত্তার লক্ষমান রক্ষাকবচ।

নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত প্রথম নাটক ছিল 'দৈবাসুরম'—কুআচারী দানবীয় শক্তিসমূহকে জর্জরদণ্ডের সাহায্যে বিতাড়িত করে, নাট্যানুষ্ঠানে 'বিঘ্ন' সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে মুক্ত করে অনুষ্ঠানের স্বার্থে এক শুভশক্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টির কথা। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রযোজিত নাটক এই মহাবিশ্বের প্রতিভূস্বরূপ ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'অমৃতমন্থন'। এর বিষয়বস্তু মোহময় অবস্থিতির পৌরাণিক আদিম মৌলিকরূপ যা মন্থনের দ্বারা প্রতিফলিত এবং ঐ মন্থনক্রিয়ার ফলে রূপকধর্মী নানা বস্তু ও ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। ক্ষীরোদ সমুদ্র, অচেতন মোহময়তার রূপকধর্মী রূপ যা মন্থনক্রিয়ার ফলে সচেতন হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য, মন্থনের চক্রাকার গতি মোহগ্রস্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক ঘূর্ণন (vertigo)-এর যে অনুভূতি হয় তার প্রতিনিধিত্বমূলক এবং একই সংগে তা মোহগ্রস্ত অবস্থার চক্রাকার নৃত্যাভংগিমার রূপও বটে। মন্থনের দণ্ড হিসেবে মন্দার নামক রহস্যময় পর্বত

ব্যবহৃত হয় ; মন্থনদণ্ডের ঘূর্ণন সম্পন্ন হয় সর্প বাসুকীকে রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে বাসুকী দানবদের উদ্দেশে যে বিষ বমন করেন তা কুশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করার ক্রিয়া, অর্থাৎ এই 'অমৃতমন্থন' দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে দানবদলন বিষয়ক এক নাটক। এই ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের ফলে উত্থিত হন দেবতাদের চিকিৎসক বা বৈদ্য : দেবদাসী নর্তকীদের আদিম মৌলিকরূপ অপ্সরাদের আবির্ভাবও হয় ঐ মন্থনের ফলে। উল্লেখযোগ্য, সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিধৃত করে আছেন বিষ্ণু তাঁর কূর্ম অবতাররূপে যেখানে মন্থনদণ্ডের ভিত্তি হিসেবে তিনি নিজেকে স্থাপন করেন।

চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মোহগ্রস্ত নৃত্যভংগী যা ঐ রূপকে বর্ণিত তা এক নাটক হিসেবে গঠিত হয়।

পরবর্তী স্তরে আমরা জানতে পারি নহুষ নামে জনৈক রাজা তাঁর ধর্মীয় কীর্তির বলে দেবতাদের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং এক নাট্যানুষ্ঠান দেখার সুযোগ ঘটে তাঁর। তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে ঐ নাট্যশিল্প পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রার্থনা করার ফলে ব্রহ্মা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন এবং ভরতের পুত্রদের পৃথিবীতে গিয়ে ঐ কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ করেন। পৃথিবীতে ঐ নাট্যাভিনয় যথাযথ সম্পন্ন করার সুবাদেই তিনি তাদের ওপর বর্ষিত অভিশাপ থেকে মুক্তি প্রদান ও ব্রাহ্মণ ও ঋষিদের কাছে তাদের নীচ পতিত পরিচয়ের কলংক মোচনের প্রতিশ্রুতি দান করেন—এ তথ্য পাওয়া যায় 'নাট্যশাস্ত্রে'। ব্রাহ্মণ ও ঋষিকুলের বর্ষিত অভিশাপ থেকে অভিনেতাদের শাপমোচন ও রাজা নহুষের সদিচ্ছার ফলেই নাট্যানুষ্ঠান পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।

এই বিবরণের মধ্যে যে সামাজিক ইতিহাসের চেহারা পাওয়া যায় তা অগ্রাহ্য করা অনুচিত। ভরত ছিলেন ঋষি ; স্বভাবতই তাঁর পুত্ররা ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু অভিশাপের ফলে তারা শূদ্রের সমতুল্য নীচ হিসেবে গণ্য হন ও শাপমোচনের আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ লাভ করেন। এর অর্থ স্পষ্টতই—নাটক ও নাট্যানুষ্ঠান ছিল সমাজের চোখে পতিত অভিনেতৃবর্গের আওতায় ; উপরন্তু মহাকাব্য, কবিদের উক্তি ও বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি 'শৈলূষ'—অর্থাৎ অভিনেতৃবর্গ সমাজের চোখে কি ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে পেশাদার অভিনেতাদের সংগে মেলামেশার ফলে নাগরিকরা সামাজিক বিধিনিষেধের শিকার হন এবং

কিভাবে রাজা হর্ষের কাছে তাঁকে তাঁর আচরণের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সর্বোপরি নাটকে মানুষকে নায়ক করে নাট্য সৃষ্টির পূর্বে নাটক নানা বিকাশের স্তর অতিক্রম করেছে, তবে দৈবিক থেকে পার্থিব স্তরে নাটকের আগমন অবশ্যই নাটকে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু ও মানব নায়কের ইংগিত বহন করে। এ'কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে নাটকের নায়ক যখন পুরাণ বা উপকথার কাহিনী থেকে গৃহীত হয় তখন দরবারী নাটকের বিষয়বস্তুতে সেই উপাদান তৎকালীন সামাজিক কাঠামোর আওতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে গণ্য হয়।

বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাটকীয় উপাদান : বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই নাটকের বীজ ছিল যেমন থাকে প্রায় সমস্ত আদিম অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে কেবলমাত্র গান বা মন্ত্রের আবৃত্তিই থাকে না, থাকে জটিল অনুষ্ঠান যার মধ্যে অবশ্যই নাটকের উপাদান ছিল, অর্থাৎ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণকারীরা সাময়িকভাবে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বর্জন করে বিশেষ ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করেন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায় সোম সেবন যজ্ঞ উপলক্ষ্যে সোমরস ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। অনুষ্ঠানের শেষ পাদে সোমরস বিক্রয়কারী তার মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাকে প্রহার করা হয় কিংবা মৃত্তিকাখণ্ড নিক্ষেপ করে আঘাত করা হয়। উক্ত ঘটনার মূল অর্থ হল, সোমরসের অধিকারী গন্ধর্বদের হাত থেকে সোমরস সংগ্রহের মূকাভিনয়। সর্বোপরি, যে নিগৃহীত শূদ্র ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সোমরস বিক্রেতার অভিনয় করেন তার সংগে, অধ্যাপক হিলেব্রান্ডট মধ্যযুগীয় মিষ্টি নাটকের শয়তানের যে তুলনা করেছেন তার মধ্যে কিছুটা যৌক্তিকতা রয়েছে। তবু এই অনুষ্ঠানে নাটকীয় উপাদানের উপস্থিতির ঘটনা নিয়ে অতিশয়োক্তি করা অনুচিত কারণ এর মধ্যে নাটকীয়ত্বের অনেক কিছুই নেই। সঠিক অর্থে নাটকীয়ত্ব বা নাটকীয় উপাদানের কথা তখনই বলা যেতে পারে যখন অভিনেতারা ঐ অনুষ্ঠানে সচেতনভাবে অভিনয়ের জন্যই অংশগ্রহণ করেন—নিজেদের বা উপস্থিত অন্যান্য দর্শকের আনন্দদানের জন্য। কিন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠানে যদি অভিনয়ের বা নাটকের বীজ থেকে থাকে তার উদ্দেশ্য অভিনয় বা বিনোদন নয় বরং তা হল প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় বা জাদু বিশ্বাসগত ফল লাভের প্রচেষ্টা।

মহাব্রত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমরা এমন উপাদানের হদিশ পাই যা থেকে নাটক ও থিয়েটারের বিকাশ সম্ভব বলে মনে হয়। সংক্ষেপে 'মহাব্রত' যজ্ঞের কার্যকারিতা হল শীতের আগমনে সূর্যের শক্তিবৃদ্ধির কামনা যার দ্বারা সূর্যদেবতা তাঁর শক্তি-বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীকে আরো ফলবতী করে তুলতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এক গোলাকৃতি শ্বেতবর্ণ ফল হস্তগত করার জন্য শ্বেতকায় এক বৈশ্য এবং কৃষ্ণকায় এক শূদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং অবশেষে জয় বৈশ্যের করায়ত্ত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় এই যজ্ঞের প্রকৃতি হল সূর্যের ওপর শূদ্রের বৈপরীত্যে বৈশ্যের আধিপত্যের মূকাভিনয়—আলোর শক্তি, অর্থাৎ শ্বেতকায় আর্য, অন্ধকারের প্রতিনিধি কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের বিরুদ্ধে জয়ী হচ্ছে। এর মধ্যে এক আদিম প্রাক্‌বিভক্ত সমাজের জাদুবিশ্বাসগত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দেখতে পাই। সামাজিক জীবনে বৈদিক যুগে এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে গণ্য হত।

এখানে অবশ্যই থিয়েটারের বীজ রয়েছে কিন্তু থিয়েটার বলতে যা বোঝায় তা এসেছে আরো পরে। যজুর্বেদে আমরা সম্ভাব্য সকল প্রকার পেশার তালিকা পাই, কিন্তু 'নট' সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ যজুর্বেদে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে নৃত্য খুবই ঘনিষ্ঠভাবে নাটকের সংগে যুক্ত। সর্বোপরি, শিব, বিষ্ণু ও কৃষ্ণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নৃত্য—বিশেষভাবে ছন্দোবদ্ধ নৃত্য ও মূকভংগী ও গান, যা পরবর্তীকালে কথোপকথনের সংযোজনে আরো সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়—এটিই ভারতীয় নাটকের উৎপত্তির রূপ। উপরন্তু আমরা যদি 'মহাব্রত' যজ্ঞের ক্ষেত্রে গদ্যে রচিত চরিত্রাবলীর পারস্পরিক কটূক্তিগুলি লক্ষ্য করি তাহলে ঐসব বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা ভবিষ্যত পরিপূর্ণ নাটকের সব উপাদানগুলির সন্ধান পাই। এই অর্থে অবশ্য আমরা ঐ কথা বলতে পারি যে বৈদিক যুগেই নাটকের উৎপত্তি ঘটেছিল। কিন্তু মহাকাব্যিক আবৃত্তির দ্বারাই যে নাটকের সুপ্ত সম্ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল এবং নাটকের সাহিত্যগত ভংগীর উৎপত্তি হয়েছিল এ' কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

ধর্ম ও নাটক : পতঞ্জলি রচিত 'মহাভাষ্য' (খ্রীঃ পূঃ ১৪০) গ্রন্থে থিয়েটারের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় যেখানে নাটকের সব ক'টি উপাদান

বর্তমান। আমরা পাই অভিনয়ের, অর্থাৎ মূকাভিনয়ের উল্লেখ ; আমরা পাই দুইপক্ষের মধ্যে আবৃত্তিমূলক উপাদানের প্রমাণ যা পরবর্তীকালে নাটকে কথোপকথন রচনার ইংগিতবাহী। সর্বোপরি আমরা পাই 'নট' শব্দের উল্লেখ যিনি শুধু আবৃত্তিকারই নন, গায়কও বটে। সেই 'মহাভাষ্যে'র যুগে নটের 'ক্ষুধা'-র একটি অতি প্রচলিত প্রবাদ ; 'ভ্রূকুঞ্চন' কথার প্রচলন হয় নটের নাম কেন্দ্র করে ; এই 'নট' নামক ব্যক্তিটি স্ত্রী চরিত্রেও যথাযথ রূপসজ্জাসহ অভিনয় করতেন ; 'মহাভাষ্য' স্ত্রীলোককে নর্তকী বা গায়িকা ব্যতীত অন্য কোনো ভূমিকায় স্বীকৃতি দেয়নি। এ থেকে বোঝা যায় ভারতীয় থিয়েটারের বাল্যাবস্থায় স্ত্রী চরিত্রে পুরুষই অভিনয় করতেন, যদিও ক্ল্যাসিক্যাল যুগে এমন ঘটনা ছিল না। যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও একথা সঠিকভাবে মেনে নেওয়া যায় যে সে সময়ে থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল এক আদিম অবস্থায়।

নাটকীয় বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভংগী থেকে এই ভংগী আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে উক্ত নাটকগুলি ছিল ধর্মমূলক। কংস বধের মধ্যে কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু নিশ্চয়ই কোনো প্রাচীন শস্য উৎপাদন সম্বন্ধীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংস্কৃতরূপ যেখানে শস্য সম্বন্ধীয় ক্ষয়িষ্ণু আত্মার প্রতিনিধি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখা হয়েছে, এবং 'মহাব্রত' যজ্ঞেও সম্ভবতঃ এই প্রতিযোগিতারই আদিম রূপ।

ট্র্যাজেডির উৎসের সংগে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এখানে কংসবধ আখ্যানে জয়ী হয় কৃষ্ণ—জয়ী হয় বৈশ্য। জয় এখানে অন্ধকারের প্রতিভূ কংসের নয় ; তাই এখানে মৃত্যু ঘটলেও দুঃখের স্থান নেই, এবং সংস্কৃত নাটক যে মিলনাত্মক পরিসমাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে ভারতীয় নাটকের উৎস এক "প্যাশন" নাট্যরীতি—যার সমাপ্তি মৃত্যুর মাধ্যমে আনন্দের দ্বারা—মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখে নয়।

এই দৃষ্টিভংগীর উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়া যায় 'ভাস' রচিত নাটকগুলি আবিষ্কারের পর থেকে। ভাস নিশ্চিতই 'কংসবধ' নীতিরই পৃষ্ঠপোষক যেখানে হত্যাকাণ্ডে দেবতার শত্রুপক্ষ নিহত হবে। নাটকের ধর্মীয় উৎস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'বিদূষক' চরিত্র, যিনি রাজার বিশ্বস্ত এবং

নিত্য সহচর। বিদূষকের নাম থেকেই বোঝা যায় গালিগালাজ তার প্রাপ্য। বিদূষকের সংগে রাণীর অন্যতম পরিচারিকার তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত শ্লেষাত্মক বাদানুবাদ বহু পরিচিত ঘটনা যেখানে, বিদূষক প্রায়শঃই পরাজয় বরণ করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 'মহাব্রত' যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও গণিকার বাদানুবাদ, যেখানে তীব্র গালিগালাজ বিনিময় হয়। এই ঘটনার সংগে পরবর্তীকালের নাটকে পরিচারিকা ও বিদূষকের মিল অস্বীকার করা যায় না। যদিও উল্লিখিত যজ্ঞে তা ফসল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের অংগস্বরূপ তবু উত্তরকালের নাটকে তা সম্ভবতঃ বিদূষকের ও পরিচারিকার রূপ অবলম্বন করে। নাট্যকার ভবভূতি অবশ্য তাঁর প্রকরণ জাতীয় নাটকে বিদূষকের চরিত্র বাদ দিয়েছেন, বিকল্পে তিনি নায়কের পার্শ্বচর হিসেবে যুক্ত করেছেন পীঠমর্দের চরিত্র। সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চরিত্র সেই বিশেষ যুগের সামাজিক বক্তব্যকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে। বিদূষকের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার যে উপাদান সংগ্রহ করেন তা তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক জীবনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঋষি ও মুনি কিংবা ব্রাহ্মণ বা রাজাদের জীবনযাত্রায় ছিল বহু অসংগতি যা নাটকে হয়ে ওঠে বিদূষকের আক্রমণের লক্ষ্য। ভবভূতি তার উত্তর রামচরিত্রে বশিষ্ঠকে ব্যাঘ্র বা নেকড়ের সংগে তুলনা (৪র্থ অংক) করতে দ্বিধা করেন না; 'অভিষারক' নাটকে বিদূষক, মুনি ঋষিদের স্বল্পবাস ও নগ্নতাকে ধর্মের অবদান হিসেবে ব্যংগ করে। ভবভূতি নিজে উচ্চবর্ণের বৈদিক ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও 'উত্তর রামচরিত' নাটকে (৫/৩২) বলেছেন, ব্রাহ্মণশ্রেণীর যত বীরত্ব তা জিহ্বার আস্ফালনে।

নাটকে ধর্মীয় গুরুত্ব খুবই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় বৌদ্ধদের দৃষ্টিভংগী থেকে। 'ললিতবিস্তার' গ্রন্থে বুদ্ধের গুণাবলীর মধ্যে নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের কথা উল্লেখিত। তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি মহান নীতির নাট্য অবলোকন করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাট্যের অস্তিত্ব ছিল।

উপরিলিখিত বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নাট্যসৃষ্টির প্রেরণা দেয়। পতঞ্জলির রচনা থেকে এ কথা বোঝা যায়, মহাকাব্যিক আবৃত্তিমূলক ভংগী ও কৃষ্ণ বিষয়ক উপাখ্যানের নাটকীয় উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত সংস্কৃত নাটক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর অব্যবহিত পরেই এসে হাজির

হয়। এই সময়ে যে নাটকের উদ্ভব হয় সেখানে ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের মতই চরিত্রদের মুখে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়েরই ব্যবহার ছিল।

উর্বশী ও পুরুরবা : অধ্যাপক কোশাম্বী উর্বশী ও পুরুরবার উপকথা সম্পর্কিত কাহিনীর গভীর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন : পুরুরবা উর্বশীর গর্ভে তার এক উত্তরাধিকারী ও পুত্র লাভের পর এক যজ্ঞানুষ্ঠানে তাকে হনন করা হয়, পুরুরবা উর্বশীর কাছে তার প্রাণ রক্ষার আবেদন করে ব্যর্থ হন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫-সূক্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক কোশাম্বীর ব্যাখ্যা স্পষ্টই মৃত্যুপথিক দেবতার বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে। অধ্যাপক টমসন এ বিষয়ে লেখেন :—

> "পৃথিবীকে উর্বরা করার জন্যই রাণীদের অন্তঃস্বত্বা হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের যৌন-জীবন ছিল একপ্রকার যাদুবিশ্বাসগত ধর্মীয় প্রক্রিয়া মাত্র। এর ফলে সন্তানের জন্মদান কল্পনা করা হত প্রথমত দেবতার জন্ম হিসেবে ; অবশ্যই চন্দ্রের দেবতা, যা আদিম চিন্তা অনুযায়ী নারীর গর্ভসৃষ্টির এবং ভূমির উর্বরতার কারণ। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার পর যে ব্যক্তির মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত হতেন, তাঁকে হত্যা করা হত। তাঁদের পক্ষে মৃত্যুবরণ আবশ্যিক ছিল ফসল ও শস্যের প্রয়োজনে।"

উর্বশীকে পুরুরবা 'ঘোর' হিসেবে অভিহিত করেন, যার অর্থ রুক্ষ, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভীতিপ্রদ ; স্বাভাবিক ভাবেই এই উক্তি প্রেমিকার নয়। উর্বশী তাঁর প্রেমিককে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন "পুনর অষ্টম পরেহী।" এই উক্তিটি প্রকৃতই মৃত্যুসংক্রান্ত বিষয়ের সংগে যুক্ত যেমন আমরা দেখি শ্রাদ্ধসংক্রান্ত স্তোত্রে (X. 14. 18.)। এই স্তোত্রে মৃত ব্যক্তিকে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে প্রত্যাবর্তনের কথা বলা হয়। X. 95. 14. স্তোত্রে মৃত্যুর স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে যেখানে দূরান্তে গমন, নিয়তি ও সোমের কোলে শয়ন ইত্যাদি হল মৃত্যুসংক্রান্ত প্রচলিত উক্তি। পরবর্তী পংক্তিতে উর্বশী তাঁকে সহানুভূতিসূচক উক্তি করে এই আশ্বাস দিচ্ছেন—তিনি অমর। "মৃত্যু তোমার নিশ্চিত নয়" এই উক্তি প্রায় ঋগ্বেদের (I. 162. 21.) সূক্তে যজ্ঞে সমর্পিত অশ্বের প্রতি উক্তির সমতুল্য, ন তভ তু এতান ম্রিয়সে। পুরুরবা অবশ্য এক সাধারণ মানুষের মত অপবিত্র

মৃত্যু বরণ করবেন না কিংবা কোনো বেওয়ারিশ মৃতদেহের মত বন্য পশুর খাদ্য হবেন না ; তাঁকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হবে বা দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করবেন ; এই হল তার নিয়তি ; অতএব তাঁকে 'মৃত্যুবন্ধু' (X/95. 18.) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে—যিনি এক সাধারণ নশ্বর নয়, বরং তিনি যজ্ঞের সংগে মৃত্যুর দ্বারা আবদ্ধ। এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় কেন উর্বশীর হৃদয় হারনা সুলভ, কেন পুরুরবার পুত্র জানবে না কে তার জন্মদাতা বরং নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা প্রদান করবে তার মাতা এক পবিত্র কর্তব্যে আবদ্ধ (X/95/ 12-13)। কথোপকথনের শেষ পাদে উর্বশী বলেন—হে ইলার পুত্র, দেবতাদের আশীর্বাদে আপনি অতএব মৃত্যুবরণ করবেন, আপনার সন্তান দেবতাদের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন এবং আপনি স্বর্গীয় জীবনের আনন্দলাভ করবেন।"

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে পুরুরবা নিজেকে অশ্বত্থ কাষ্ঠের উর্ধ ও নিম্ন অরণী হিসেবে গঠিত করার পর গন্ধর্বে পরিণত হন অগ্নি উৎপন্ন করে। ঐ একই উক্তিতে লিখিত আছে অগ্নি উৎপন্নকারী বা অগ্নি লাঙলের দুই অংশ মানবজন্মের রূপক হিসেবে উর্বশী ও পুরুরবার যৌন মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন সংগমের সংগে অগ্নি উৎপাদক drill-এর যোগ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ বলে পুরুরবা নিজেকে অশ্বত্থ অরণীতে পরিণত করার পরই গন্ধর্বে পরিবর্তিত হন। তাঁর নশ্বর দেহের মৃত্যুর পরই গন্ধর্ব হওয়া সম্ভব। যদিও গন্ধর্বদের নিজস্ব স্বর্গ আছে, মানবের পক্ষে আত্মারূপেই সেই স্বর্গে আরোহণ সম্ভব। বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রন্থে এর প্রমাণ মেলে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (XIII-6) পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে অধ্যাপক এগেলিং-এর উক্তি হল :—আসলে সাংখ্যায়ন এই পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে যা বলেছেন এটি তার অধিক কিছু নয়, অর্থাৎ এই যজ্ঞানুষ্ঠানের আধুনিক ও পুনর্গঠিত রূপ হল অশ্বমেধ। [Sacred Books of the East Vol XLIV, pXLIV]

যদিও ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে যে ভংগীতে এই যজ্ঞের পরিচয় মেলে তা ততটা আদিম না হলেও এমন কথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে অশ্বমেধ প্রাথমিক ভাবে ছিল 'পুরুষমেধ' যজ্ঞ যেখানে রাণীর সংগে আনুষ্ঠানিক যৌন সংগমের পর অশ্বের পরিবর্তে এক মানুষকে যজ্ঞে উৎসর্গ করা হত। অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পুরুষমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পৃক্ত ছিল এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে গোড়ায় এ দুটিই একই অনুষ্ঠানের অংগীভূত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা দুই ভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়। প্রথমটি স্বভাবতই রাজসম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়। পুরুষমেধ যে

কোনো ধনী ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসর্গ করা হত তার তালিকা পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে উক্ত ব্যক্তিরা হয় ক্রীত হত নতুবা বিজিত বা শোষিত শ্রেণীভুক্ত মানুষদের থেকেই সংগৃহীত হত।

অতীতের সব মহৎ সাহিত্যই কাব্যে রচিত হত তার কারণ এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল এক বিশাল শ্রোতৃবর্গের সামনে আবৃত্তি করা বা গীত হওয়া। সেখানে ব্যক্তিবিশেষ লেখক বা পাঠকের সংগে সাহিত্যের সম্পর্ক নয় বরং তা ছিল এক যৌথ সম্পর্ক যেখানে কথক ও শ্রোতৃবর্গ বা দর্শক একই আবেগ অনুভব করতেন। আজও সেই ঐতিহ্য পরিপূর্ণভাবে অবলুপ্ত নয়, অন্ততঃ সেই সব ক্ষেত্রে নয় যেখানে সাহিত্য এখনও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উন্নাসিক ও শহুরে হয়ে ওঠে নি। কাব্য, সংগীত ও নৃত্য মূলতঃ অবিচ্ছেদ্য ছিল এবং তৎকালীন যুগে তা অবসর বিনোদনের সামগ্রী ছিল না বরং তা ছিল বিশেষ ক্রিয়ার পথপ্রদর্শক যা বহির্জগতে পরিবর্তন সূচিত করবে বাস্তবের ওপর কল্পনা আরোপ করবে। সামবেদের সুর ও মূর্ছনায় যাদুশক্তি আছে এমন বিশ্বাস ব্রাহ্মণ্যবাদের যুগেও করা হত।

অতএব প্রাচীনতম সাহিত্য ছিল আকাংক্ষিত ক্রিয়ার পথপ্রদর্শক। ঋগ্বেদে আমরা পাই কথোপকথন জাতীয় স্তোত্র যা অবশ্যই অভিনীত হওয়ার ভংগীতে উপস্থিত করা হত। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগস্ত্য. ইন্দ্র ও মারুতের (RV. 7. 165) কিংবা অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার যৌন সম্পর্কিত কথোপকথন (III-33) বিশ্বামিত্র ও নদীসমূহের কথোপকথন (IV-18) এবং উর্বশী ও পুরুরবার কথোপকথন (X. 95)

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেরই উদ্দেশ্য ছিল এক বা একাধিক পুরোহিত দ্বারা আবৃত্তি করার ; কিন্তু এই কথোপকথন জাতীয় স্তোত্রগুলির গুরুত্ব আরও অধিক কারণ এগুলির উদ্দেশ্য ছিল অভিনীত হওয়ার—বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত দর্শক-গোষ্ঠীর সামনে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি : ভারতীয় থিয়েটার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি তার ক্রমবিকাশে, ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে থিয়েটারের

রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্র ধরিয়ে দেয়। ভাস, কালিদাস বা ভবভূতির সৃষ্টিশীল কাজের বৈজ্ঞানিক বোধ কখনই সঠিক হতে পারে না যদি না আমরা তাদের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত হই। উপরন্তু সেই বিশেষ বিশেষ যুগে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশের স্তর ও শিল্পীর সেই বিজ্ঞান বা শিল্প সম্বন্ধে চেতনার কথা সঠিক না জানলে আমরা উক্ত শিল্পীদের সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হব না। মার্কস বলেছেন : "...যে কোনো শিল্পীর কাজ নির্দিষ্ট হয় শিল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠনের রূপ, শ্রমবিভাগ ও তার সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্কের ভিত্তিতে।" নাট্যকার তাঁর নাটকে ঘটনাকে কল্পনা করেন, নাট্যিক ক্রিয়ার বিবরণ দেন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ও কিছু কিছু মূল্যবোধকে গুরুত্ব আরোপ করতে; শিল্পী কল্পনার সাহায্যে বাছাই করে নাটকে উপস্থাপিত সমস্যা ও চরিত্রগুলির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব শিল্পী বৈশিষ্ট্যের ছাপ এঁকে নেন। এই সমস্যা নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বিশদভাবে বা আভাসে মানুষের সঙ্গে সেই বিশেষ সমাজের সম্পর্ক, শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা বা শ্রেণীগত দায়দায়িত্ব, সামাজিক কাজ সম্বন্ধে শিল্পীর ধ্যানধারণা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ধর্ম, প্রকৃতি, শিল্পচেতনা, সবই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলেন। লেখকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক, পরিবার ও সামাজিক, প্রাকৃতিক সব কিছুর হদিশ মেলে। ভাস, কালিদাস বা ভবভূতিকে চিন্তাবিদ্ হিসেবে অগ্রাহ্য করলে, তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অগ্রাহ্য করলে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির সম্যক বোধ অসম্ভব।

উত্তর মৌর্যযুগ এবং বিশেষভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগ থেকেই কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং শাসনকার্য সম্বন্ধীয় পরিবর্তন রাষ্ট্রযন্ত্রের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো গঠন করার কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে ভূমিদান প্রথা যা ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যের শিক্ষণীয় অংশ এবং পুরাণের মাধ্যমে পবিত্রকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ; মহাভারতের অনুশাসন পর্বে সমগ্র একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভূমিদান প্রশস্তি হিসেবে। প্রাক্ মৌর্য যুগের প্রাচীন পালি ভাষায় রচিত রচনাসমূহে কোশল ও মগধের রাজাদের ব্রাহ্মণশ্রেণীর হাতে গ্রামদান সম্পর্কিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সেখানে দাতা কর্তৃক গ্রামগুলির শাসনকার্য পরিচালনা ব্রাহ্মণকে হস্তান্তরের কোনো নজীর মেলে না। উল্লেখযোগ্য, এই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ২য় খ্রীষ্টাব্দে সাতবাহন শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি কর্তৃক বৌদ্ধ শ্রমণদের

হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে। এইসব হস্তান্তরিত ভূখণ্ডে রাজার সৈন্য, সরকারী বা আরক্ষা বাহিনীর প্রবেশাধিকার ছিল না। ৫ম খ্রীষ্টাব্দে এই সব ভূমির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হল সরকারী রাজস্ব এবং আরক্ষা ও শাসনকার্য সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্র কর্তৃক হস্তান্তর। গুপ্ত সাম্রাটদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদের কমপক্ষে ছটি এধরনের গ্রামাঞ্চল দানের উদাহরণ পাওয়া যায়। এইসব ভূমিদান সাধারণত বৃহৎ সামন্ত প্রভুরা করতেন মধ্য ভারতে যেখানে কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য অধিবাসীদের বিশেষভাবে বলা হত শুধুমাত্র কর রাজস্ব ইত্যাদি প্রদানই নয়, উক্ত ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করতে। ভাওনের চেহারা তার চরম পর্যায়ে পৌছয় যখন সম্রাটের নির্দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তি অপরাধীর ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাও উক্ত ব্রাহ্মণদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সাম্রাজ্যে ব্যাপক ভূমিদানের দৌলতে শুধু ব্রাহ্মণ সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের পথই প্রশস্ত হয়নি তাঁরা রাজ্যশাসনের কাজও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতেন। এই ভূমিদানের উদ্দেশ্য দাতাদের যাই থাকুক না কেন, এই দানের ফলে এক শক্তিশালী মধ্যবর্তী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ জমিদারদের সংখ্যা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ক্রমশঃ তাদের পৌরোহিত্যের পেশা ত্যাগ করে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেন ভূমির রক্ষণাবেক্ষণে ও বন্দোবস্তে। তাদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ কর্ম ধর্মীয় কাজকর্মের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ফলে মৌর্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সামগ্রিক ও পূর্ণ ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে, তা ক্রমশঃ উত্তর-মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজস্ব আদায়ের কাজ, বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, খনি নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ, কৃষি ইত্যাদি ছাড়াও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব যা এতাবৎ রাষ্ট্রের কর্মচারীরাই সম্পন্ন করত তা ধাপে ধাপে হস্তান্তরিত হয়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণশ্রেণীর হাতে এবং পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হাতে।

ভূমি বা রাজ্য যার হস্তগত কিংবা যে শাসন করে তারই সে জমি বা রাজ্য ভোগদখলের অধিকার। এই বিশেষ সামন্ততান্ত্রিক আইডিয়ার মানসিকতা গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগেই প্রথম সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য, গুপ্তসাম্রাজ্যের যুগে গ্রামের অধিপতি বা মোড়ল যারা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতো তারা ধীরে ধীরে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অধ্যক্ষে পর্যবসিত হয় এবং মূলতঃ তাদের লক্ষ্যই ছিল

ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে। মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে যে কাজ কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষরা রাষ্ট্রের স্বার্থে সম্পন্ন করতেন সে কাজ এখন উক্ত মোড়ল বা গ্রাম আধিপতি আমুক্তক কর্তৃক সম্পন্ন হত নিজেদের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করার স্বার্থে। এদের উপজীব্য ছিল গ্রামের অধিবাসীদের উৎপন্ন শস্যের এক অংশ ; সম্ভবতঃ শস্যের সিংহভাগ পাঠানো হত সম্রাটের শস্যভাণ্ডারে। এই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ বিশেষ বৃদ্ধি পায় সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে। 'সামন্ত' কথাটি অধিকারকারী ভূস্বামিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সম্রাটের কাছে উপঢৌকন পাঠানোর নজীরের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের দ্বিতীয় আবশ্যিক কর্তব্য ছিল ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত থেকে উপঢৌকন দেওয়ার। বাণভট্টের হর্ষচরিতে তার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিশাল সাম্রাজ্যকে রাষ্ট্রক্ষমতার আয়ত্তে রাখতে গেলে—যেমন গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকরা প্রায় দু শতাব্দী ব্যাপী করতে সক্ষম হয়েছিলেন—প্রয়োজন উৎপাদনী ভিত্তির বিস্তার। এর অর্থ এতাবৎ বন্য অঞ্চলগুলিতে নতুন নতুন গ্রামীণ বসতি স্থাপন করে প্রাথমিক স্তরে আকর্ষণীয় ব্যবসায়িক মুনাফার প্রচেষ্টায় ব্যবসায়িক বিকাশ। মৌর্য সাম্রাজ্যে নতুন বসতির পদ্ধতি ছিল, শূদ্রদের বসতির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ, ধাতুদ্রব্যের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং এমন অর্থনীতি যার প্রয়োজন ব্যাপক মুদ্রার প্রচলন। গুপ্ত সাম্রাজ্যে এই বসতির ক্ষেত্রে দূরত্ব বিশাল হওয়ার জন্য বলপ্রয়োগের কোনো অবকাশ ছিল না ; এবং ছিল অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত পরিমাণে অরণ্য অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে এইসব নতুন বসতি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অভিযানের যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে বর্ণ বা জাতির ছদ্মবেশে অতীতের উপজাতি অঞ্চলে এক নতুন শ্রেণীগত কাঠামো গড়ে তোলে।

এই নতুন অর্থনীতি একই সঙ্গে দুটি বিরোধী ঝোঁক গড়ে তোলে ; গ্রামাঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি এবং কিছু মুখ্য রাজধানী ও বন্দরে যাবতীয় সম্পদের কেন্দ্রীভবন। সাধারণভাবে বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজদরবারগুলি বিলাসিতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন অজন্তা গুহাচিত্র এই বিশেষ যুগের স্মৃতিবাহক। সামন্ততন্ত্রের প্রথম সাফল্যে নতুন সমাজ কেবলমাত্র অধিক শান্তিপূর্ণই নয়, অধিকতম সংস্কৃতি সম্পন্নও

হয়ে ওঠে। কালিদাস যে শতাব্দীর মানুষ সে সম্পর্কে অনেক কিছু অজ্ঞাত হলেও তাঁকে ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার (৩৮০—৪১০ খ্রীঃ) সঙ্গে যুক্ত হিসেবে সঙ্গতভাবে গণ্য করা হয়।

গুপ্তযুগে গ্রামাঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি কেবলমাত্র শহরগুলিকে ধ্বংস করে তাই নয় উপরন্তু সমাজের চিন্তাসৌধে তার নিশ্চিত ছাপ এঁকে দেয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন সব বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান স্থানীয় পালপার্বণ এবং তীর্থস্থান যা পুরাণসমূহে সম্পৃক্ত হয় তা এই যুগেই ঘটে। কেবলমাত্র নতুন নতুন সঙ্কীর্ণ বর্ণের উৎপত্তি হয় তাই নয়, সভ্যতার পশ্চাদপসরণ ঘটে। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আদিম ক্ষত্রিয় সতীদাহের প্রথা নতুনভাবে প্রবর্তিত হয়। 'সতী' কথার আক্ষরিক অর্থ পবিত্র বিশ্বাসী স্ত্রী। ক্ষত্রিয় প্রধানের মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রীর স্বেচ্ছায় চিতারোহণে প্রীকরা চরম বিস্মিত হয়। এই সামাজিক প্রথা মৌর্যদের কাছে পরিচিত নয়। গুপ্তযুগের অব্যবহিতপূর্বে মহাভারতের আপাদমস্তক পুনর্লিখন থেকেই বর্বরোচিত সতীদাহ প্রথার সমর্থনের কারণ মেলে।

সর্বশেষে 'অর্থশাস্ত্র' মানুষ কেনাবেচার ব্যাপারে চরমতম শাস্তি—মৃত্যুদণ্ডের নিদান দেয়। সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগরে (২৫/১৮৩/১৮৭ ইত্যাদি) এই মানুষ ক্রয় বিক্রয়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকসমূহে গুপ্তসাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের নবজাগরণ সূচিত করে একথা লেখা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদই গুপ্ত সাম্রাজ্যের নবজাগরণ সূচিত করে।

কালিদাসের জীবন ও যুগ : মহাকবি কালিদাসের জীবন ও যুগ সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না—অন্ততঃ নিশ্চিতভাবে কিছু জানি না। শোনা যায় কালিদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান যিনি অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃহীন হন এবং কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাখালবালক হিসেবে জীবন ধারণ করেন। সে সময়ে বেনারসের এক রাজা এক বৈয়াকরণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করেন, যিনি বররুচি নামে পরিচিত। কিন্তু যুবরাণী উক্ত পাত্রের কাছে নিজেকে অনেক বেশী বিদুষী হিসেবে গণ্য করায় সে বিবাহ ঘটে না। বররুচি, এইভাবে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধের জন্য যখন উন্মুখ তখন তাঁর সঙ্গে উক্ত সুপুরুষ

রাখাল বালকের দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয় এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে। তিনি দেখেন উক্ত রাখাল যুবকটি একটি গাছের শাখায় বসে সেই শাখাটিকেই কাটছে; তিনি এই নির্বোধ, সুপুরুষকে রাজি করিয়ে এবং তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাক থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাকে রাজসমীপে হাজির করেন। যুবরাণীর কোনো প্রশ্নেরই যুবক রাখাল উত্তর দেয় না এবং বরুচি ব্যাখ্যা করে বলেন, এক সামান্য যুবতীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঐ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ যুবকের কাছে অসম্মানজনক। এই কথা শুনে রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে রাখাল যুবকের বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং যুবরাণী অচিরেই এই ছলনা আবিষ্কার করেন। এইভাবে দিন অতিবাহিত হয় এবং যুবকটি দেবী কালীকে নিয়মিত পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন, যিনি সন্তুষ্ট হয়ে যুবককে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ও কাব্যজ্ঞানের তিনটি শাখা আয়ত্ত করার আশীর্বাদ করেন। অতএব যুবক কালিদাস নাম গ্রহণ করেন দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ; অর্থাৎ সেইদিন থেকে তিনি কালীর দাস।

৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবির নাম সম্ভবতঃ সুবিদিত হয়ে ওঠে, কারণ সে সময়ে মান্দাসোর এলাকায় (কালিদাসের বাসস্থানের সন্নিকটে) জনৈক কবির রচনা সূর্য মন্দিরে উৎকীর্ণ হয় যার কিছু কাব্য কালিদাসের কাব্যের আদর্শে লিখিত। অন্যান্য ভারতবিদ্‌রা মনে করেন কবি কালিদাস সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলেই এবং (অথবা) ২য় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৫-৪১২ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে বাস করতেন এবং তিনি সভাকবি হিসেবে উক্ত সম্রাটদের গুণকীর্তন করেন তাঁর কাব্যে। উপরন্তু উল্লিখিত দুই সম্রাটই বিক্রম নাম গ্রহণ করেন যাঁদের রাজসভায় কবি কালিদাস ঐতিহ্য অনুসারে সভাকবি হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে মহাকবি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন।

সাধারণভাবে স্বীকৃত কবির কর্মস্থল ছিল উজ্জয়িনী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকেই উজ্জয়িনী ছিল শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী। লোককথায় বিক্রম উজ্জয়িনীতে এবং মান্দাসোরে রাজত্ব করেন যাঁর কথা মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। তৎকালীন যুগের ন্যায় উজ্জয়িনী বর্তমান কালেও আরবসাগর ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বাণিজ্যপথের অন্যতম বৃহৎ নগরী হিসাবে সুবিদিত। এই নগরীর মধ্য দিয়ে দিল্লী-মথুরা থেকে দক্ষিণ ভারতগামী আরেকটি বাণিজ্যপথ প্রথমোক্ত পথকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

উপরিলিখিত ধারণাগুলি যদি সঠিক হয় তাহলে বলা যায় মহাকবি বিখ্যাত

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বসবাস করতেন (৩২০-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) যা ভারতের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত। ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এবং সম্ভবতঃ কবি কালিদাসের সমসাময়িক কালে—জনৈক বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক, ফা হিয়েন দীর্ঘ দশবছর গুপ্তসাম্রাজ্যে অবস্থান করেন এবং তৎকালীন যুগের এক প্রাণবন্ত বিবরণ রেখে গেছেন। উল্লেখযোগ্য, উক্ত বিবরণীতে সেই সমাজে অস্পৃশ্য শ্রেণীর চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন যা থেকে এবং তাঁর অন্যান্য লিপিবদ্ধ বিবরণী থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কীর্তি ও যশ মূলত সেই সমাজের অনেক মানুষের শোষণ ও নিপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতব্যতীত ফা হিয়েন বিদ্রোহীদের চরম শাস্তির যে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে তারা অমিত পরাক্রমশালী গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আমাদের দায়িত্ব সেই বিশেষ যুগটিকে যথাসম্ভব সঠিকভাবে উপস্থিত করা এবং কবি কালিদাস ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা।

গুপ্ত বংশের রাজারা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য শাসন করতেন যা প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে, বিস্তৃত গাঙ্গেয় উপত্যকায়, হিমালয় এবং দাক্ষিণাত্যের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরো দক্ষিণে পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে বসবাস করত বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় যারা পশুশিকার, খাদ্যসংগ্রহ এবং আদিম প্রথায় সামান্য চাষবাস করত।

উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার আদিম অরণ্যের অধিকাংশ এলাকা কালিদাসের যুগে কেটে ফেলে চাষবাস করা হত। গুপ্ত যুগের প্রারম্ভে বিদেহ উপজাতির কথা উল্লেখিত হয় যারা আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে অবস্থিত ছিল। ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ যুগে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অব্যবহিত পরে এখানে গুপ্তসাম্রাজ্যের মতই এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য (মৌর্য সাম্রাজ্য) ছিল, যা মাত্র চারপুরুষ ব্যাপী টিকে ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল ভারতে দাস যুগের কাল এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালেই ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূত্রপাত। কিন্তু এ থেকে এমন কথা চিন্তা করা ভ্রান্ত যে সামাজিক বিকাশে প্রাচীন থেকে নবীনে পরিবর্তন এরকম নাটকীয়-ভাবে ঘটে। দাস সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ এত শ্লথগতিতে অগ্রসর হয় যা চোখে পড়ে না, কেবলমাত্র সবচেয়ে প্রাগ্রসর ভারতবিদদের চোখেই তা সম্প্রতি প্রতিভাত হয়েছে। বলা যায় ৫ম শতাব্দী থেকে ভূমির ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক

ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু পাশাপাশি প্রাচীন দাস সমাজেরও বহু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। তাই কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে রাজসভার দৃশ্যে অসংখ্য পুরুষ ও নারী দাস চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে ; এই নাটকে উক্ত দাসসমাজের চিত্র সবচেয়ে প্রকট।

ইতিহাস কি ? ইতিহাস হল উৎপাদনী ব্যবস্থা ও সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ক্রমানুবর্তী ধারা। অন্য যে কোনো ইতিহাস বিশ্লেষণ কেবলমাত্র চিন্তাসৌধ ভিত্তিক। প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় ইতিহাসের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িককালের ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে করা সম্ভব। আর্যজাতি প্রথম অগ্রসর হয় হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে যেখানে উপ-জাতিদের মধ্যে দুটি প্রধান শ্রেণীকাঠামো সৃষ্টি হয়—আর্য ও দাস যা অতি দ্রুত চারটি বর্ণে বিকাশ লাভ করে। গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে বসবাস স্থাপনের জন্য বন অরণ্য অঞ্চল সাফ করা হয়—যার ফলে সুলভে লৌহ ধাতু ইত্যাদি পাওয়া যায়। এর ফলে মগধের অভ্যুত্থান ঘটে, বাণিজ্যিক পথ বিস্তৃত হয় ধলভূম ও সিংভূম খনি অঞ্চল পর্যন্ত। অবশেষে তা বিস্তৃতি লাভ করে বিশাল যাতায়াতের পথ—গঙ্গানদী পর্যন্ত। মৌর্য ও তার অব্যবহিত পূর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ মূলতঃ কেন্দ্রীভূত হয় উর্বর ভূমিতে (অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ অনুযায়ী) শূদ্র বসতি স্থাপনে। ব্রাহ্মণশ্রেণী তাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে বৈদিক যুগের ব্যয়সাপেক্ষ পুরোহিতের পেশা থেকে এই সব অরণ্যাঞ্চলে স্বেচ্ছায় অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। সমাজে অসংখ্য বর্ণের মানুষ এবং ব্রাহ্মণশ্রেণী কর্তৃক পুনর্লিখিত শাস্ত্র অনুযায়ী অসংখ্য স্থানীয় কুসংস্কার সম্বন্ধীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এই উপজাতি গোষ্ঠী জীবন ও সামন্ততান্ত্রিক কৃষি প্রধান সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণশ্রেণীই ইক্ষ্বাকু, পাণ্ডু, নল ইত্যাদি মহাকাব্যের কাল্পনিক কুল বা বংশ সম্বন্ধে নানা উপকথার মাধ্যমে কাহিনী ও বিবরণ সৃষ্টি করেন তাদের উর্বর কল্পনা দ্বারা যেসব আদিবাসী সম্প্রদায় ক্ষমতায় উন্নত তাদের কাছে। আর্যকরণ ও আর্য সভ্যতার জয়ের মূল তাৎপর্য হল অতীতে যেসব অঞ্চলে অত্যন্ত ক্ষীণ বসতি ছিল সেইসব এলাকায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র কৃষিনির্ভর গ্রামাঞ্চল গড়ে উঠতে থাকা। উপজাতি বা গোষ্ঠীজীবন থেকে বর্ণবিভাগীয় সমাজে পরিবর্তনের অর্থ মূলতঃ ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত গোষ্ঠী বা উপজাতিবর্গকে সাধারণ সমাজের নির্দিষ্ট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি। অসম্পূর্ণ, জটিল, আপাতবিরোধী নতুন বর্ণতত্ত্ব লিখে অতীতের

চাতুর্বর্ণের সঙ্গে গোষ্ঠিসমাজ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিক্রিয়া। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতের পাশাপাশি সাতবাহন প্রাকৃত ও অশোকযুগের পালি ভাষা প্রচলন ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের জন্য নয়। ক্ল্যাসিকাল ভাষা এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় অনুষ্ঠান এক বিশেষ শাসক শ্রেণীর কথা নির্দিষ্ট করে দেয় যার মূল জাতিগত ও উপজাতিগত উৎস শূদ্র কৃষক শ্রেণীর উৎসের সঙ্গে এক হতেও পারে। এই শূদ্রদের ওপরই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও সংস্কৃতভাষার সাহায্যে প্রভুত্ব করেছে উক্ত শাসকবর্গ যদিও প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রভুত্বের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার।

এক্ষেত্রে আমরা দেখি একই সঙ্গে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করছে ; প্রথমতঃ রাজারা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং গ্রাম্য বসতিকে ব্যবহার করে নিজেদের উপজাতিগত আচার আচরণ ও অর্থনীতি থেকে মুক্ত করছেন এবং তাদের এলাকায় জাতিপ্রথাই নিয়মিত শ্রেণীকাঠামো হিসেবে প্রবর্তন করেন ; দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণরা স্বয়ং সর্বপ্রকার স্থানীয় কুসংস্কার স্বীকার করে নিয়ে দুই ভিন্ন মেরুর মধ্যে সুদৃঢ় সেতু হিসেবে সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেন যা হয়তো বৈপরীত্যে এক দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে পরিণত হতে পারত। এই সামাজিক স্বীকৃতি এইভাবে বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে প্রচলিত করা হল ন্যূনতম বলপ্রয়োগের সাহায্যে, ফলে আদিম বিশ্বাস ও আচার আচরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়ে রইল শ্রেণী ভিত্তিক কাঠামো।

এই বর্ণাশ্রম ধর্মী সামাজিক স্তরভেদের কারণই নতুন উৎপাদনী ভিত্তি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদনী সম্পর্ক গড়ে তোলে ; এই সম্পর্ক ট্রাইবাল উৎপাদনী সম্পর্কের তুলনায় উন্নত কিন্তু উৎপাদনী মাধ্যম এখনও আদিম যন্ত্রপাতি। অতএব রাষ্ট্রীয় নীতির জন্য আমরা পাই ব্রাহ্মণ্যবাদী নীতি ও বিশ্বাস যা হল—প্রতিটি বর্ণ, জাতি, জনপদ, এমন কি বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠী তাদের বিশেষ নীতি অনুযায়ী বিবেচ্য হবে ; কারণ এগুলিই তখন উৎপাদনের এক একটি একক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক যুগ থেকেই ব্রাহ্মণদের হাতে কিছু কিছু গবাদি পশু ছিল যা ছিল তাদের সম্পদের মানদণ্ড। অতএব গোড়া থেকেই তার হাতে চাষবাসের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদান বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা কেন ? উপজাতি অঞ্চল সমূহ থেকে নতুন যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান উপজাতি বসতির মাধ্যমে সেখানে ব্রাহ্মণরা ছিলেন শাসকশ্রেণীর মূল্যবান এক সমর্থক। রাষ্ট্র ও পুরোহিত

বর্ণ যৌথভাবে প্রাথমিক উৎপাদকদের কর্মমুখী করে রাখেন, যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত উভয় শ্রেণীই উদ্বৃত্তের অংশ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এইভাবে যখন প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেল এবং যুদ্ধবিগ্রহের শেষে শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল তখন অবসরের প্রচুর সুযোগ এল। এমতাবস্থায় রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা পুরোহিতদের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে গর্বিত হতেন এবং পুরোহিত শ্রেণীও ক্রমশঃ সরল যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিগুলিকে জটিল থেকে জটিলতম করে গড়ে তোলেন। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রচুর পানভোজন সংগীতাদি ও অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠান যা অনেক সময় দীর্ঘদিন বা মাসাধিককাল চলত। বশিষ্ঠ রাজা সুদাসের প্রশস্তি সংগীত করেন এবং পারিতোষিক হিসেবে পান ২০০টি গাভী, দুটি রথ এবং স্বর্ণসাজ সমেত ৪টি অশ্ব। একদা রাজা জনক সম্মিলিত বিদ্বদ্‌জনের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিকে ১০০০ গাভীর প্রত্যেক জোড়া শিং-এ দশ পদ স্বর্ণমোড়ক সমেত পারিতোষিক প্রদান করেন এবং এই পারিতোষিক লাভ করেন রাজার সভাপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য। বিশাল পরিবারের যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কমপক্ষে পনেরো থেকে ষোলোজন পুরোহিতের প্রয়োজন হত। এরকম প্রত্যেকটি যজ্ঞ ও উৎসবের অনুষঙ্গ ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নানাবিধ সামগ্রী দান। এইভাবে পৌরোহিত্য সেকালে খুবই আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে গণ্য হতে থাকে যার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পুরোহিতবর্গ নিজেদের এক বিশিষ্ট শ্রেণী হিসেবে গণ্য করতে থাকে। ক্রমশঃ পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক পেশায় সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করে; অন্তপক্ষে পুরোহিত শ্রেণীও ক্রমশঃ এই যজ্ঞানুষ্ঠান ও উৎসবগুলিকে অধিকতর দ্রষ্টব্য, জটিল ও রহস্যজনক করে গড়ে তোলেন। যেহেতু স্বয়ং রাজা ও অভিজাতশ্রেণী এঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন সেহেতু তাদের লালসা ও শ্রেষ্ঠত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। "সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞকর্তার পুণ্য নির্ভরশীল পুরোহিতের ওপর।" [ঐঃ ব্রা/II-32]

"পুরোহিত যিনি অগ্নি বৈশ্বানর নামে দৈবগুণের অধীশ্বর তিনি পাঁচটি বিধ্বংসী অগ্নির অধিকারী; একটি তাঁর কথায়, একটি পদদ্বয়ে, একটি তাঁর বুকে, একটি হৃদয়ে এবং একটি যৌনাংগে···যদি তাঁর দেহের ক্ষমতাধীন সবগুলি বিধ্বংসী অগ্নি শান্ত করা যায় এবং তিনি যজ্ঞ সম্বন্ধে রাজ আকাংক্ষায় সন্তুষ্ট হন, তিনি রাজার স্বর্গরাজ্যের পথ প্রশস্ত করেন এবং তাকে রাজকীয় সম্মান, সাহস, রাজ্য ও প্রজাবর্গ প্রদান করেন যাদের ওপর তাঁর সুশাসন বজায় থাকবে। কিন্তু যদি রাজা তা না

করেন তাহলে তিনি এবম্বিধ সব ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হবেন।" [ঐ/ব্রা/VIII/24]

আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজারা যে বিচিত্র পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণের দৈবিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ওকালতি করতে থাকেন তার প্রমাণ রয়েছে 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে—"ব্রাহ্মণ অজ্ঞ বা শিক্ষিত যাই হোন তিনি এক মহান দেবতা। ব্রাহ্মণই ত্রিভুবন ও দেবতাদের জন্মদাতা।"

যদিও সে যুগে রাজ সিংহাসনের ক্ষেত্রে বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবু তাঁরা একথা চিন্তাও করতে পারেন নি, অতি দ্রুত ব্রাহ্মণশ্রেণী এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা দেবে। এবং তাদের নানা কলাকৌশল ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসান ঘটাবে। জনগণের চোখেও তৎকালীন পুরোহিতদের নানা রীতিনীতি তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন সন্দেহ জাগ্রত হয় নি। পুরোহিত শ্রেণীও তাদের অর্জিত সুযোগ সুবিধার দৌলতে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলেন। উপরন্তু সর্ববিধ জ্ঞান ও শিক্ষা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে রাখাই ছিল সব বর্ণ বৈষম্য ভিত্তিক শাসনের মূল কথা। এ যুগের অসংখ্য ব্রাহ্মণ সাহিত্য সূত্র এবং সর্বশেষে মনুস্মৃতি যা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর চরম নীতিশাস্ত্র—এগুলির মূল তাৎপর্যই হল সমাজে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রক্ষা করা।

শ্রেণী হিসেবে ব্রাহ্মণরা অতি শীঘ্র অনুভব করেন তাঁদের দাবী ও অধিকার রক্ষার পথ সুরক্ষিত করা তখনই সম্ভব যদি তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে সক্ষম হন। তাঁদের প্রচুর সম্পদ ছিল, জনগণের ওপর তাঁদের সূক্ষ্ম প্রভাব রাজার অপেক্ষা অধিক, সর্বোপরি ছিল অখণ্ড অবসর; এবং সব শিক্ষা ও জ্ঞান তাঁরা একচেটিয়া ভাবে দখল করে রেখেছিলেন। ফলে রাজার অধিকারে তাঁরা ভাগ বসাতে বদ্ধপরিকর হলেন, রাজার পুরোহিত থেকে, ধর্মীয় উপদেষ্টার পদ হয়ে মন্ত্রীত্বের দাবী খুবই সহজ। অতি শীঘ্র ব্রাহ্মণরা রাজ পরিষদের প্রধান সদস্য হয়ে উঠলেন।

"ব্রাহ্মণ অভিজাততন্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের সূচনা করে। তাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে শুধু ধর্মীয় গুরুর শ্রদ্ধা অর্জন করেন তাই নয়, তাঁরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। আর্য দর্শনের মৌলিক নীতি অনুযায়ী মানসিক ও দৈহিক চরম শৃঙ্খলার প্রয়োজন যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক একথা উচ্চারিত হতে থাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের কণ্ঠে।

এই শৃঙ্খলা যারা আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা বৈদিক সত্যের সন্ধানে লিপ্ত তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্রগুলি হয়ে ওঠে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র, সামরিক কূটনীতি রাজনৈতিক বিজ্ঞানের শিক্ষণ কেন্দ্র। মহাভারতে দ্রোণাচার্য যেমন পাণ্ডবদের অস্ত্র চালনার শিক্ষাগুরু ছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ কূটনীতিজ্ঞ ও ও রাজনীতিজ্ঞরা হয়ে ওঠেন রাজসভার প্রধান মন্ত্রণাদাতা।" [হাজেল, ই. বি/ ভারতে আর্য শাসনের ইতিহাস/পৃ ৩৯]

এই বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় সজ্জিত হয়ে ব্রাহ্মণশ্রেণী রাজা ও রাজ্যের নামে একের পর এক বর্ণগত ও ধর্মীয় নির্দেশ জারী করতে থাকেন, যা একই সংগে রাজা ও জনগণকে পুরোহিত শ্রেণীর সেবক হিসেবে নিযুক্ত করতে বদ্ধ-পরিকর হয়ে ওঠে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে দেখা যায় ব্রাহ্মণশ্রেণী তাদের বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করতে সম্মত যেহেতু অধিকাংশ মানুষের চোখে তা অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন কি এই ব্রাহ্মণ শ্রেণী ক্ষত্রিয়দের ঔপনিষদীয় দর্শন গ্রহণ এবং রাম ও কৃষ্ণকে নব্য ধর্মীয় চিন্তার নায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই নব্য বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে মহাকাব্য ও পুরাণসমূহ ; ক্ষত্রিয় দর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে ভাগবত গীতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মহাভারতে।

গুপ্ত যুগে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা অধিকতর জাতীয় নবজাগরণ বা আর্য চিন্তা ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের আন্দোলন—ধর্মীয় মতবাদ সেখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। গুপ্ত যুগকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা হিন্দুধর্মের প্রতিক্রিয়া বলাটা ভ্রান্ত, বলা উচিত এ যুগ ছিল আর্য সভ্যতার নবজাগরণ কারণ এ ছিল আর্য ক্ষত্রিয় ও আর্য ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায় আর্যাবর্তে Indo-Aryan রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ জাগরণ ছিল আর্য জাতির বংশোদ্ভূত শাক্যমুনির অনুপ্রেরণা দ্বারা ধর্মীয় মতবাদের সমতুল্য যা কাব্য, নাটক শিল্পে আর্যজাতির অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়। সে সময়ে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সমগ্র অঞ্চল আর্যাবর্ত নামে অভিহিত হত—যা ছিল রামচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র।

৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত করেন ; তাঁর দক্ষিণমুখী অভিযান ছিল ঐতিহ্যবাহী ক্ষত্রিয় সামরিক তীর্থযাত্রা—ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অশ্বমেধ ছিল সে

অভিধানের উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। অশ্বমেধ যজ্ঞের বৈদিক ধর্মীয় আচার অশ্বের মাধ্যমে সাড়ম্বরে সম্পন্ন করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের স্মারক হিসেবে যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয় (অশ্ব ও যজ্ঞবেদী উৎকীর্ণ মুদ্রা) তা বৃটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ছিল সংস্কৃত যা স্বাভাবিকভাবেই ছিল গুপ্ত রাজসভার রাজভাষা। কালিদাসের যুগে ইতিমধ্যেই বহু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দুই কি তিন শতাব্দী ব্যাপী জনগণের ভাষা ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিরিক কবিতা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এরই সংগে সমতা রক্ষা করে নাট্যকারেরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, রাজা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিত্রের মুখে মঞ্চে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত করেন এবং অন্যান্য চরিত্রেরা এমন কি নারীরাও বিভিন্ন কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন।

কালিদাস স্বয়ং ছিলেন সক্রিয় শৈববাদী ও কালীভক্ত এবং শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম হল সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের দুটি শাখা যার সূত্রপাত সেই দাসযুগের শেষ পাদে। উল্লেখযোগ্য, এই গুপ্তযুগে মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুযায়ী সংস্কার করা হয়। তাই কালিদাস যখন তাঁর কাব্যে রাম ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের ব্যবহার করেন, সেখানে তিনি রামায়ণের অনুসরণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন না, তাঁর মালমশলা তিনি গ্রহণ করেন মূলতঃ পুরাণ থেকে।

বৈষ্ণববাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুত্থান ছিল বহু শতাব্দী ব্যাপী প্রচলিত হিন্দু জীবনযাত্রায় আশ্রম বিভাগই যে জীবনে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপায় তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। গুপ্তযুগ ছিল ইন্দো-আর্য নবজাগরণের সূত্রপাত।

ভারতে ট্র্যাজেডি বলতে একমাত্র মহাকাব্যদ্বয়। যুগ পরম্পরায় ট্র্যাজেডির বহিরংগের পরিবর্তন ঘটলেও তার মূল উদ্দেশ্য আজও মোটামুটি অপরিবর্তিত। এই উদ্দেশ্য হল নিষ্করুণ সমাজ বাস্তবতার উন্মোচন। তাই আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের কাল্পনিক জয় ঘটেছে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি; ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নতুবা রামচন্দ্র কেন আত্মবিসর্জন দেন; কৃষ্ণই বা নিহত হন কেন? সব কিছুরই পরিণতি কেন ব্যর্থতা ও বিষাদে?

কিন্তু সংস্কৃত নাটক নিছক রাজসভার নাটক। সেগুলি সুদক্ষ কারিগরের

হাতের সৃষ্টি সত্ত্বেও তা আপাদমস্তক কৃত্রিমতায় ভরপুর। এ নাটকে বর্ণনার বাহুল্য। ছন্দের বৈচিত্র্য উপমার প্রয়োগ অলংকারের ঝকমকি—এসবই রাজা-রাজড়া ও অভিজাতদের প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবন সেখানে অনুপস্থিত।

কালিদাসের সমসাময়িক হিন্দুসমাজ চারটি ঐতিহ্যবাহী বর্ণ বা জাতিতে বিভক্ত ছিল; একটি পঞ্চম বর্ণের কথাও উল্লেখিত হয়, যারা মৎস্য শিকার করে জীবন ধারণ করে—জালোপজীবী চণ্ডাল ও অন্যান্য সমগোত্রীয় ব্যক্তিবর্গ ঐ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত শ্রেণীভুক্তরা, অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতি অনুযায়ী নগর সীমানার বাইরে বসবাস করত। একথা চীনা পরিব্রাজক কর্তৃক সমর্থিত; তিনি বলেছেন উক্ত চণ্ডাল শ্রেণীর লোক নগরে যখন প্রবেশ করত তখন কাঠের যষ্টির দ্বারা শব্দসহ অগ্রসর হত যেন কোনো উচ্চবর্ণের মানুষের সংগে তারা মুখোমুখি না হয়। তিনটি উচ্চবর্ণের মানুষ দ্বিজ (রঘুবংশম্/৫/১৩) হিসেবে অভিহিত যাঁরা উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করতেন। বলা বাহুল্য এই উপনয়ন সংস্কারই তাদের সামাজিক উচ্চ অবস্থিতি প্রদান করত—বিশেষতঃ শূদ্র শ্রেণীর বৈপরীত্যে। এ ক্ষেত্রেই রাজার ভূমিকা ছিল রথী বা নিয়ন্তার মত যিনি সুদক্ষ রথীর মত সমাজকে ন্যায়ের পথে চালনা করবেন এবং তাঁর প্রজাবর্গকে এই পথে চালনা করতে বাধ্য থাকবেন এমনকি নিজের প্রাণের বিনিময়ে (রঘুবংশম্/১/১৭)।

বর্ণবৈষম্য আকীর্ণ কালিদাসের এই সমাজে অবশ্য এ বিষয়ে ঔদার্যমূলক বা শৈথিল্যের উদাহরণ অবিদিত নয়। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচয় মেলে যিনি বর্ণসংকর নীচ বংশোদ্ভূতা নারীর গর্ভজাত; ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে কিংবা শূদ্রানীর গর্ভে তাঁর জন্ম, তবু কঠোর বর্ণবৈষম্য মূলক নীতিই ছিল সাধারণ নিয়ম যা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজার সজাগ দৃষ্টি ছিল। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁদের বংশে ধমনীতে প্রবাহিত রক্তধারার পবিত্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন (রঘুবংশম/১/১৬৯) এবং এই নীতিভংগ-কারীকে কঠোর শাস্তিলাভ করতে হত। কালিদাস, যিনি ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক, উচ্ছ্বাসভরে রাম কর্তৃক এক অ-দ্বিজশ্রেণীর তপস্বীর প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাকে সমর্থন জানান এবং এইভাবে তিনি প্রকাশ করেন যে শূদ্রের ধর্ম পালনের অধিকার নেই (রঘু/৫/৫০) কারণ তিন উচ্চবর্ণের মানুষের সেবা করাই তার

একমাত্র এবং প্রধান কর্তব্য। কালিদাসের দৃষ্টিভংগী ব্রাহ্মণ্যবাদী কারণ তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে রামায়ণের শূদ্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেন, যে শূদ্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে উদ্যোগী (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস/এ. বি. কীথ/পৃ ৯৯)।

বাহ্মণবর্ণের মানুষরা শ্রেষ্ঠতম গুণের (সত্ব) অধিকারী এবং তার পরবর্তী (রজঃ) গুণের অধিকারী পরবর্তী নিম্নবর্ণের মানুষ ক্ষত্রিয়বর্ণ। এ'কথা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরশুরামের উক্তি থেকে :—"তুমি আমার পরাজয়ের অপযশকেও আমার প্রতি সহানুভূতিসূচক পক্ষপাতিত্বে পর্যবসিত করেছ, মাতৃগর্ভে প্রাপ্ত আমার চারিত্রিক আবেগ প্রবণতা অপসরণ করে তুমি আমাকে শান্তিপ্রিয় আখ্যায় ভূষিত করেছ ; যা হল আমার পিতৃদত্ত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।" [রঘুবংশ/১১/৯০]

উল্লিখিত চারটি বর্ণের মধ্যে সবচেয়ে অধিক উক্তি মেলে দুটি উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে। আমরা জানতে পারি উপবীত ধারণ প্রায় এক সুবিধাবাদী অবস্থিতি হিসেবে প্রচলিত হয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষদের মূল কাজ ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ। খাঁটি ও মিশ্র ক্ষত্রিয় সন্তানদের মধ্যে প্রভেদ টানা হয়। খাঁটি ক্ষত্রিয় সন্তান দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাল্য অতিক্রম করতেন (বিক্রমোর্ব্বশী/পৃঃ ১২৮)। ক্ষত্রিয় সন্তান ধনুবিদ্যা গ্রহণের পূর্বে ধনুকটি দুহাতে ধরে জ্যেষ্ঠদের কাছে করজোড়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে শিক্ষা শুরু করতো (বিক্রমোর্ব্বশী/পৃঃ ১১৭)। বৈশ্য বর্ণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয় শ্রেষ্ঠী, বণিজ এবং সার্থবাহ যারা স্থল ও জলপথে ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত থাকতো।

ব্রাহ্মণ্যবাদী নবজাগরণের সাক্ষ্যসমূহ : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—কবি যাঁকে মগধের সম্রাট হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি সংখ্যাতীত যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করায় জন্য কৃতী হিসেবে গণ্য। কবি তাঁর 'রঘুবংশ' কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর দৃশ্যে ইন্দুমতীর পরিচারিকা সুনন্দার মুখে সম্রাটের এক অতুলনীয় বিবরণ দিয়েছেন যিনি সম্ভবত ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

"পরন্তপ নাম এই মগধ ঈশ্বর
অরিন্দম মহাবীর প্রকৃতি গম্ভীর

প্রজার রঞ্জন কার্যে রত নিরন্তর।
দীনের শরণ রাজা পরম সুধীর।
যদিও সহস্র রাজা আছেন ধরায়
এই রাজা হৈতে ধরা হৈল রাজবন্ত।

পবিত্র তীর্থস্থানে যাত্রা ব্রাহ্মণ্যধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা কালিদাসের মেঘদূতম্ কাব্যে মেঘের রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত যাত্রাপথে উল্লেখিত।

কালিদাসের কাব্যে ঋগ্বেদের সূর্যদেবতা বিষ্ণু, পুনর্জন্ম নেন পৌরাণিক মহাজাগতিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী এবং সীমাহীন গৌরব ও অমিতশক্তির অধিকারী হিসেবে চিত্রিত হন। তাঁকে নানা নতুন নামে নামাঙ্কিত করা হয়— হরি, ত্রিবিক্রম, চতুর্মূর্তি, কবি, পুরুষ, সারংগী, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, মহাবরাহ, বলনীসূদন ভগবন, কৃষ্ণ ইত্যাদি। কালিদাসের বিষ্ণু দেবতা অবশ্যই পৌরাণিক চিন্তা অনুসরণ করেন। তিনি মানবের চিন্তা ও বর্ণনার অতীত (রঘু/১০/১৫) তাঁর ত্রিবিধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই আমরা—প্রথমে এই জগতের স্রষ্টা হিসেবে, পরবর্তীকালে সেই জগতের ধারক হিসেবে এবং সর্বশেষে সেই জগতের ধ্বংসকারী হিসেবে (রঘু/১০/১৬)। বর্ষণধারার যেমন সৃষ্টিতে একই আস্বাদ ; কিন্তু বিভিন্ন দেশে তা বৈচিত্র্যময় স্বাদ ও গন্ধ অর্জন করে, সেইরকম বিষ্ণুদেবতাও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংস্পর্শে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরত্ত করেন (রঘু/১০/১৭)। স্বয়ং অসীমের প্রতিভূ হলেও তিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব জগতকেই সীমিত করতে সক্ষম হয়েছেন, স্বয়ং সব আকাংক্ষার অতীত হয়েও তিনি সকলের আকাংক্ষা পূর্ণ করেন, স্বয়ং অজেয় হয়েও তিনি সকলকে জয় করেছেন। তাঁর চারটি মুখ থেকে নিঃসৃত যে জ্ঞান উৎসারিত তা জীবনের চারটি সীমা নির্দিষ্ট করে, সময়কে চারটি চক্রে সীমিত করে এবং মানুষকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করে (রঘু/১০/২২)। তাঁর রহস্যময় প্রকৃতি সব প্রশংসার অতীত (রঘু/১০/৩০)।

ব্রাহ্মণ্যবাদ পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করল ॥

বিনয় মজুমদার

হাসপাতাল থেকে

কবিতাগুচ্ছ ১—৪

দুটি গল্প ৫—৮

একাঙ্ক নাটিকা ৯—১৬

বিশেষ্যের বিশেষ্যের

বিশেষ্যের বিশেষ্যের ভিতরে আমার বিশেষ্যটি
ঢুকিয়ে আমার দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিশেষ্যের বিশেষ্যের পরে
চেপে ধরি চাপ দিই আর বলি 'ও বিশেষ্য অক্ষর বিশেষ্যপদ
তোমার বিশেষ্যপদে ঢোকানো তা চাপ দিয়ে বেশ বোঝা যায়।'
'তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করো, হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা যায় সর্বনাম
ক্রিয়া করো।' আমি ক্রিয়াপদ দিতে থাকি ঘন ঘন।
বলি যে 'তোমার বাবা তোমার বিশেষ্যকেও ঠিক এইভাবে
ক্রিয়া করত ও ফলে তোমার বাবার বিশেষ্যের
থেকেই বিশেষ্য বার হয়ে ক্রিয়া তোমার মায়ের
বিশেষ্যের মধ্যে পড়ে ফলে সর্বনাম জন্মেছ ও
আমার বিশেষ্যপদ থেকেই বিশেষ্যপদ বেরিয়ে তোমার
বিশেষ্যের মধ্যে পড়ে জন্মেছে বিশেষ্যপদ তোমার আমার।'
এমন সময়ে ঠিক আমার বিশেষ্যপদ বেরিয়েই বিশেষ্যের বিশেষ্যে পড়ল।
তারপরে কিছুক্ষণ বিশেষ্যকে দুই হাতে জড়িয়ে ক্রিয়াই সর্বনাম থাকি শেষে
ধীরে ধীরে সর্বনাম বিশেষ্যকে বার করি
বিশেষ্যের বিশেষ্যের ভিতর থেকেই।

বিশেষ্য যখন

বিশেষ্য যখন ক্রিয়াপদ করে আমার সহিত
মাঝে মাঝে দুই পায়ে সর্বনাম কোমর জড়িয়ে
ধরে সে। এবং আমি ক্রিয়াপদ করি নানা পদ্ধতিতে যথা
সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি বিশেষ্যের উপরে এবং
সর্বনাম দুই হাতে বিশেষ্যের দুই কাঁধ ধরে ক্রিয়াপদ করি।
তারপরে ঘনঘন ছোট ছোট ক্রিয়া করি এইভাবে শুয়ে
লম্বা লম্বা ক্রিয়াপদ করি মাঝে মাঝে।
অন্যভাবে দুই হাত বিশেষ্যের বিশেষ্যের দুই পাশে মেঝের উপরে

রেখে আমি সব চেয়ে লম্বা ক্রিয়াপদ করি এবং আমার
বিশেষ্যের দিকে আমি চেয়ে থাকি আর দেখি সর্বনাম বিশেষ্যের মাথা
বিশেষ্যের বিশেষ্যের মধ্যে আর গোড়াটি বাইরে।

আমার বিশেষ্যপদ

আমার বিশেষ্যপদ আমার কাছে তো নেই আছে অল্প দূরে
আমার বিশেষ্যপদ অতিশয় বিশেষণ অব্যয় সেহেতু
আমি খুব ভালো যে কেউ জিজ্ঞাসা করে
'বিনয়দা কেমন আছেন?'
অমনি জবাব দিই 'অতিশয় ভালো আছি'
মনস্তত্ত্ববিদগণ গুণে ভাবে—ব্যাপার কী হল
যে কোনো অবস্থাতেই ভালো থাকা তাজ্জব ব্যাপার
আমার বিশেষ্যপদ, শোনো, আমি সূর্যের ভিতরে
থাকব করেছি স্থির কয়েক শতাব্দীব্যাপী
সূর্যদেব নামধেয় অগ্নির ভিতর।

এইভাবে বহুকাল

এইভাবে বহুকাল চলে গেছে অব্যয় বছর
চলে গেছে সুখে থেকে, চলে যাবে আরো বৎসর
আমার প্রধান চিন্তা বিশেষ্যকে নিয়ে সেও বিশেষণ হয়ে যাবে। আর
বিশেষণ হয়ে গেলে করব কী দুজনায় মিলে তাই ভাবি।
আমার বিশেষ্যে কটি বিশেষ্য পেকেছে দেখে আশ্বস্ত হয়েছি।
আর কটি বৎসর পরে স্তাখা যাবে ঠিক বিশেষ্য আমার
বিশেষণ হয়ে গেছে। আমি তাকে বহু আগে কথাও দিয়েছি
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে বিশেষ্য যখন বিশেষণ
হবে তখনো আমি তার শুধু তার হয়ে থাকবই।

আমার বিশেষ্য

আমার বিশেষ্য আর সর্বনাম বিশেষ্য হয়েছে।
বিশেষ্যের গোঁফ নেই ভাখা যেবে বিশেষ্যটি
বড় হবে তখন তো তার
চিন্তার কারণ আর থাকবে না। বিশেষ্যই
কাজ করে খাওয়াতে পারবে
তার মাকে। এই কথা ভেবে চলে গেল এত বৎসর।
আমার বিশেষ্যকেই একথা বলেছি আমি বহুবার
সর্বনাম বিশেষ্যের কথা।
লেখাপড়া খুব বেশি না করেও বাঁচা যায়, বেঁচে থাকা যায়
সর্বনাম বিশেষণ লেখাপড়া ক্রিয়া করবার ফলে এভাবে রয়েছি
ভালো কি খারাপ আছি যখন ভাবতে যাই তখনি বুঝি যে
যে কোনো অবস্থাতেই ভালো আছি বলা ছাড়া গতি নেই
ও বিশেষ্য, বিশেষ্য আমার।

সেই কথা

সেই কথা ফের লিখি : গত কুড়ি বৎসর সর্বনাম বিশেষ্যের বিশেষ্য রয়েছে
সারাক্ষণ বিশেষ্যের বিশেষ্যের ভিতরে তা আমি জানি
আর জানে বিশেষ্য—এ কথা
মোটে বিশেষণ নয় ভালোভাবে সকলকে জানিয়ে জানিয়ে
ক্রিয়াপদ করা ভালো, তাতে বেশি সুবিধাই হয়।
জনসমর্থন পাই সর্বনাম দুজনেই, তাই
আমি বহু আগে থেকে লিখে লিখে ছাপিয়েছি নানা পত্রিকায়।
এর ফলে তিনকাল, অতীত ও বর্তমান আর ভবিষ্যৎকাল
আমার এবং
সকলের কাছে অতি স্পষ্ট হয়ে গেছে—আমি বিশেষ্যপদকে
ক্রিয়া করবই সারা বিশেষ্য, সেহেতু খুব, আনন্দই পাই।

সর্বনাম বিশেষ্যটি

সর্বনাম বিশেষ্যটি বিশেষ্যের বিশেষ্যের মাঝে ঢোকাবার পরে
দুই হাত দিয়ে দেখি ফাঁক করে বিশেষ্যের বিশেষ্যে আমার
বিশেষ্য ঢোকানো আছে। আমার বিশেষ্যপদে কাঁধের নিকটে
তিল আছে তিনটি এবং ঘুরলে পিঠে তিল আরো তিনটিই।
আমার বিশেষ্যপদে কোথাও-কোথাও লোম নেই।
আমি লোম খুঁজে খুঁজে বিশেষ্যে বিশেষ্যে লোম
কোথাও অব্যয় নেই, তাই
দেখি আমি ভালো করে বুকে পিঠে বিশেষ্য, অব্যয়
বিশেষ্য ও বিশেষ্যই শুধু, আমি মুগ্ধ হয়ে বিশেষ্যকে দেখব আবার।

বিশেষ্য খুলেই

বিশেষ্য খুলেই আমি বিশেষণ হই আর সর্বনাম
বিশেষ্য বিশেষ্য তার বিশেষ্যসকল
খুলে ফেলে আমি বলি 'ও বিশেষ্য, ক্রিয়া করো আমার বিশেষ্যে, আমি
তোমার বিশেষ্য পদে কতবার ক্রিয়া
দিয়েছি আমার জিভ দিয়ে তুমি ক্রিয়া করো একবার শুধু একবার।'
ক্রিয়া সে করে না কিন্তু। অব্যয় সে সর্বনাম বিশেষ্য বাম হাতে
ধরে ক্রিয়াপদ করে, আমি জিজ্ঞাসাও করি, 'কেমন বিশেষ্য বলো,
ও বিশেষ্য বলো'
বিশেষ্য তখন বলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ্যটি ধরেছে বিশেষ্য বাম হাতে।
তখন বিশেষ্য শোয় বিছানায় বিশেষণ হয়ে আমি
বিশেষ্যের দুই বিশেষ্যের মাঝে বসি
বলে নীচু হয়ে ঢোকাই আমার জিভ বিশেষ্যের বিশেষ্যের ভিতরে তখনি।

আমার বাড়ি

প্রতিভা—আমার বাড়ি জামদানী গ্রামে, দাদা। আমি যে বেগে হাঁটি তাতে রেলস্টেশনে আসতে লাগে কুড়ি মিনিট।

আমি—আশীষ, তোমার কী ছুটি নাকি? একটা কথা তোমাদের বলি, বৈদ্যনাথ। প্রতিভা আর আশীষ তো ইঞ্জিনীয়ার তোমরাও শোনো। যখন কিছু একটা লিখছ। প্রবন্ধই হোক উপন্যাসই হোক যা খুশি লিখছ। প্রথমত তোমার লেখার শব্দগুলি অভিধান থেকে নেওয়া। তোমাদের লেখার সংগে অভিধানের সরাসরি যোগ আছে। কী বলো, প্রতিভা? যোগ আছে কিনা বলো।

প্রতিভা—অভিধান তো থাকে দূরে, যা লিখছি তার থেকে যোগ থাকে কী করে?

আমি—তুমি বসে আছো তোমার বাড়ির ছাদে। অথচ পৃথিবীর মাটির সংগে তোমার যোগ রয়েছে।

আশীষ—কী রকম?

আমি—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দেখা যায় না, অথচ আছে। তোমার মা বাবা এখানে নেই বৈদ্যনাথ। অথচ তোমার মা বাবার সংগে তোমার যোগ আছে। তোমার মা বাবার রক্ত তোমার গায়ে।

আশীষ—তা ঠিক। অভিধানের সংগে যে কোনো লেখার যোগ আছে—এটা মানা যায়।

আমি—তোমাদের যে কোনো লেখার সংগে আবার ব্যাকরণের যোগ আছে। ব্যাকরণের নিয়মাবলী অনুসরণ করেই লিখছ তো প্রত্যেকটি বাক্য। যেমন ধরো কারখানার জেনারেল ম্যানেজার, বসে থাকে তার নিজের ঘরে। অথচ তার নির্দেশ মতো কারখানার সব কাজ হয়। সেইরকম ব্যাকরণ তার আলমারীতে। কিন্তু ব্যাকরণের নির্দেশ মতো সমস্ত বাক্য লেখা হয়। তা হলে ভাখ ব্যাকরণের সংগে সমস্ত লেখার যোগ রয়েছে। আবার ধরো লিখছ 'পৃথিবীতে পাঁচটি মহাদেশ, তার একটি আমেরিকা মহাদেশ'। এই বাক্যটিতে আমেরিকা শব্দটি লিখছ তুমি। তার কারণ ভূগোলে পড়েছিলে আমেরিকার নাম। তা হলে ভূগোলের বই থেকে শব্দটি (আমেরিকা শব্দটি) এসে তোমার বাক্যে বসল। ভূগোলের বইয়ের সংগে তোমার বাক্য যুক্ত।

বৈদ্যনাথ—এটা মানা যায়।

আমি—এইভাবে দেখলে পৃথিবীর সব বই পরস্পরের সংগে যুক্ত। এবং সত্যিই পৃথিবীর সব বই মিলে আসলে একখানা বই। কাব্য, নাটক, ভূগোল, ইতিহাস, ইঞ্জিনীয়ারীং, ডাক্তারী, ব্যাকরণ···যত বই আছে সব মিলে আছে একখানি বই মাত্র পৃথিবীতে। এবং এই একখানা বই যা খুশি, যেভাবে খুশি আকারে বাড়ানো চলে না, কিছু নিয়ম পালন করে তবে বাড়ানো যায় এই একখানা বইয়ের আকার, যেমন ব্যাকরণ অনুসারে লিখতে হয় বাক্য, যা খুশি লেখা চলে না। আরে, আরে, অটলবাবু যে বহুদিন পরে আপনার দেখা পেলাম। তাই বৈদ্যনাথ, প্রতিভা, আশীষ, আমি যাই অটলবাবুর সংগে জরুরী কথা আছে। চলুন কোথাও গিয়ে বসি। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলা যায়।

আমি এবং অটলবিহারী সে হাঁটতে হাঁটতে আশুতোষ দর্জির দোকানে এসে উপস্থিত হলাম।

আমি—বাংলা অভিধানে আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শব্দ। তার ভিতরে অব্যয় আর সর্বনাম খুব অল্প কটি। আসলে বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়াপদই প্রায় সব।

অটলবাবু—তা ঠিক।

আমি—ফলে বিশেষ্যপদ আছে ধরুন পঞ্চাশ হাজার বাংলা ভাষায়। এই পঞ্চাশ হাজার শব্দ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মানুষের পঞ্চাশ হাজার নাম। মানুষ আছি আমরা পাঁচ কোটি নাম পঞ্চাশ হাজার। পাঁচ কোটিতে সাতটা শূন্য, পঞ্চাশ হাজারে চারটে শূন্য। তা হলে গড়ে এক হাজার লোকের এক নাম। অটল নামে এক হাজার লোক, বিনয় নামে এক হাজার লোক আশুতোষ নামে এক হাজার লোক। কী বলেন আশুবাবু?

আশুতোষ সেন—তা ঠিক।

আমি—মজা দেখুন অটলবাবু। আমি সাহিত্যিক বই লিখেছি এক হাজার পৃষ্ঠা, এক এক পৃষ্ঠায় ৩০০ শব্দ। এক হাজার পৃষ্ঠায় তিন লক্ষ শব্দ ব্যবহার করেছি। কবিতায় একটু ফাঁক ফাঁক করে লেখা ধরুন দু' লক্ষ শব্দই লিখেছি। অভিধানে যত বিশেষ্যপদ আছে তার সবই আমি লিখেছি—এটা ধরে নেওয়া যায়।

অটলবাবু—তা যায়।

আমি—আমাদের গ্রামে প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন লোক আসে, নতুন পরিবার আসে, যাদের নতুন নতুন সব নাম। ফলে আমার লেখা কবিতা গল্প প্রবন্ধে ব্যবহৃত সব নাম তাদের। হঠাৎ মনে হয় আমার বিরুদ্ধে কোনো দুরভি-সন্ধি নিয়ে এসে হাজির হচ্ছে আমাদের গ্রামে আমার বইয়ের নামের সংগে নাম মিলিয়ে। আসছে কোনো ফন্দী করে। ভেবে দেখুন এরকম সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক কিনা ?

অটলবাবু—তা হয়। স্বাভাবিকই।

আশুতোষ সেন—হওয়া খুবই সত্য। শুধু বই কেন, মুখের কথাও এরকম হয়।

তিনদিন

গ্রাম : আনন্দপাড়া, ডাকঘর : ঠাকুরনগর, জেলা—২৪ পরগণা নিবাসী মধুসূদন ঘটকের দোকানে বসেছিলাম মধুসূদনবাবু ও আমি।

আমি—আচ্ছা মধুসূদনবাবু, আপনার বেঞ্চিটা কত লম্বা ?

মধুসূদন—সাত ফুট মোটামুটি।

আমি—কিন্তু মেপে দেখা যাবে বেঞ্চির দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। এমনকি ভালো করে মাপলে দেখা যাবে বেঞ্চির দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৩·৫ ইঞ্চি।

মধুবাবু—তা খুবই সম্ভব।

আমি—আর যা দিয়ে মাপছেন সেই ফিতের যে ঠিক ফাগ কাটা আছে তারই বা নিশ্চয়তা কী ?

মধুসূদনবাবু—নিশ্চয়তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি—তা হলে মধুসূদনবাবু বেঞ্চির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত তা বলা অসম্ভব।

মধুসূদন—তা তো ঠিক কথা মশাই।

আমি—অর্থাৎ আমরা মুখ দিয়ে কখনোই ঠিক কথা বলতে পারি না। বলি না।

মধুসূদনবাবু—ধরেছেন তো ঠিক, বিনয়দা।

আমি—তা ছাড়া ওই যে বেচার জন্ত রেখেছেন যে ব্লাউজটি ওর রঙ কী ?

মধুবাবু—কেন সবুজ রঙের ।

আমি—আমি যদি বলি সবুজের সঙ্গে একটু হলুদ মেশানো আছে ।

মধুবাবু—তা সম্ভব, বিনয়দা ।

আমি—তা হলে দেখছেন মধুসূদনবাবু যে কোনো কথাই ঠিক মতো আমরা দেবতা স্রষ্টারা বলতে পারি না । বেকির দৈর্ঘ্য যা বলি তা ভুল, ব্লাউজের রঙ ভুল । যা বলি মুখ দিয়ে তাই ভুল ।

মধুসূদনবাবু—তা বটে । সত্য কথা আমরা বলি না জীবনে, বলবোও না ।

অন্তদিন আমার পিতামাতার দেওয়া দালানে আমার বারান্দায় বসে আছি ; আমার কাছে উত্তম মণ্ডল, অমলেন্দু বিশ্বাস, গৌরী মজুমদার এবং আরো অনেকে ।

আমি—এই যে আমার ডান হাতখানা এখানা এক মুহূর্তে এক জায়গায় থাকতে পারে একই মুহূর্তে দু জায়গায় থাকতে পারে না । আমি আমার ডান হাতখানা তুলে দেখাই এবং বলি—

আমি—তা হলে আমার হাতখানা তোমার নাকের পেছনে চোখের পেছনে ঘিলুর মধ্যে নেই । তোমার চোখের পেছনে আমার হাত যদি থাকে এবং এই যে হাত নাড়ছি তোমার ঘিলুর বাইরে—এ তো হওয়া অসম্ভব । আমার হাত তো দেখার ক্ষমতা কারোই নেই । কারণ আমার হাত যে কোনো মুহূর্তে এক জায়গায় থাকে ।

গৌরী—ঠিক বলেছেন দাদা ।

উত্তম—কিন্তু খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো দাদা ।

তৃতীয় দিন ক না খ-কে যেন বলেছিলাম—

আমি—খ, শোনো । আমাদের শরীরের নানাস্থান দিয়ে যা বেরোয় গুহ্য দ্বার দিয়ে বেরোয়, নাক দিয়ে সর্দি বেরোয় লিঙ্গ দিয়ে পেচ্ছাপ বেরোয় সবই নোংরা ত্যাজ্য পদার্থ, কান দিয়ে খইল বেরোয়, মুখ দিয়ে কফ বেরোয় অর্থাৎ শরীর থেকে যাই বেরোয় সবই নোংরা ত্যাজ্য পদার্থ ।

খ বলল—হ্যাঁ ।

আমি—তা হলে মুখ দিয়ে আমাদের কথা বেরোয় তাও নোংরা ত্যাজ্য পদার্থ ।

আপনারা হাসুন

মঞ্চের উপরে একখানা চেয়ারে প্রমটার বসে আছে তার হাতে একখানা বই নিয়ে। মঞ্চে আরো তিনজন পুরুষ। প্রথম পুরুষের পরণে পাজামা গায়ে একটি বুশ শার্ট, দ্বিতীয় পুরুষটির পরণে ধুতি ও গায়ে একটি গেঞ্জি, তৃতীয় পুরুষটির পরণে প্যান্ট গায়ে বুশ শার্ট। তিনজন নারীও মঞ্চের উপরে। তিনজনেরই পরণে শাড়ি ব্লাউজ। তিনজন নারীই ফর্সা এবং সুন্দরী। তিনজন পুরুষের একজন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আর বাকি দুজন ফর্সা। প্রমটারের পরণে পাজামা ও গায়ে পাঞ্জাবী। ঐ প্রমটারের চেয়ার ছাড়া আর মঞ্চে কোনো আসবাবপত্র নেই।

পিঙ্গুহয়া—পাজামা পরা অভিনেতার বাংলা নাম কাহালি

টিরিনচাগা—প্যান্ট পরা অভিনেতার বাংলা নাম বুদ্ধ

সাহেব—গেঞ্জি পরা অভিনেতার বাংলা নাম দীপক

প্রমটার—তাহলে শুরু করা যাক মহড়া, কী বলিস দীপক ?

সাহেব দীপক (গেঞ্জি পরা পুরুষটি)—আচ্ছা শুরু করুন।

প্রমটার (হাতের বই দেখে দেখে)—পিঙ্গুহয়া, তোমরা এই উত্তর মেরুতে আছ বরফের ঘরে।

গেঞ্জি পরা পুরুষ সাহেব দীপক—পিঙ্গুহয়া, তোমরা এই উত্তর মেরুতে আছো বরফের ঘরে।

প্রমটার— দেখে আমাদের মনে খুব দুঃখ হচ্ছে

গেঞ্জি পরা পুরুষ দীপক— দেখে আমাদের মনে খুব দুঃখ হচ্ছে

প্রমটার—বসন্ত গ্রীষ্ম কী জিনিষ তোমরা জানলেই না।

গেঞ্জি পরা পুরুষ দীপক—বসন্ত গ্রীষ্ম কী জিনিষ তোমরা জানলেই না।

প্রমটার—এইবার কাহালি বল। কিন্তু সাহেব এইখানে আমাদের বাপঠাকুর্দা থাকত

পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—কিন্তু সাহেব এইখানে আমাদের বাপঠাকুর্দা থাকত

প্রমটার—আমরা যদি বলি আমরা উন্নতি করেছি তাহলে বাপঠাকুর্দা খারাপ ছিল বলা হয়।

পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—আমরা যদি বলি আমরা উন্নতি করেছি তাহলে বাপঠাকুর্দা খারাপ ছিল বলা হয়।

প্রমটার—তাতে বাপঠাকুর্দাকে অপমান করা হয়।

পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—তাতে বাপঠাকুর্দাকে অপমান করা হয়।

প্রমটার—এবং আমরা নাস্তিরাই যদি তাদের অপমান করি

পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—এবং আমরা নাস্তিরাই যদি তাদের অপমান করি
প্রমটার—তাহলে তাদের আর সম্মান দেবে কে বা কারা ?
পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—তাহলে তাদের আর সম্মান দেবে কে বা কারা ?
প্রমটার—সেই জন্য কেউ উন্নতি করতে চায় শুনলেই
পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—সেই জন্য কেউ উন্নতি করতে চায় শুনলেই
প্রমটার—আমরা তাকে এক ঘরে করি ।
পাজামা পরা পুরুষ কাহালি—আমরা তাকে এক ঘরে করি ।
প্রমটার—সাহেব বল, দীপক বল। কিন্তু তারা তোমাদেরই ঠাকুর্দা, তোমরা আরো ভালো আছো জানলে
ধুতি পরা পুরুষ দীপক—কিন্তু তারা তোমাদেরই ঠাকুর্দা তোমরা আরো ভালো আছো জানলে
প্রমটার—তাদের আত্মা খুশি হবে, পিঙ্গুহয়া
দীপক—তাদের আত্মা খুশি হবে, পিঙ্গুহয়া ।
প্রমটার—তাছাড়া তাদের আত্মা আমাদের দেশ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পুনর্জন্ম পেয়েছে ধরো
দীপক (সাহেব)—তাছাড়া তাদের আত্মা আমাদের দেশ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পুনর্জন্ম পেয়েছে ধরো ।
প্রমটার—তাহলে তারা আধুনিক মানে আমাদের দেশের অবস্থায় আছে ।
দীপক (সাহেব)—তাহলে তারা আধুনিক মানে আমাদের দেশের অবস্থায় আছে ।
প্রমটার—পিঙ্গুহয়া বল, কাহালি বল। কিন্তু আমাদের বাপঠাকুর্দার মতো আমরাও না হয়
কাহালি—কিন্তু আমাদের বাপঠাকুর্দার মতো আমরাও না হয়
প্রমটার—পরজন্মে যাব ।
কাহালি—পরজন্মে যাব ।
প্রমটার—এইবার বৃদ্ধ বল। তাছাড়া আমরা যদি বলি আগের চেয়ে এখন সুখে আছি
প্যান্ট পরা পুরুষ (বৃদ্ধ)—তাছাড়া আমরা যদি বলি আগের চেয়ে এখন সুখে আছি
প্রমটার—তাহলে বুঝতে হবে আমরা আগে অতি খারাপ ছিলাম ।
প্যান্ট পরা বৃদ্ধ—তাহলে বুঝতে হবে আমরা আগে অতি খারাপ ছিলাম ।
প্রমটার—পিঙ্গুহয়া বলেছে আমাদের বাপঠাকুর্দার কথা ;
প্যান্ট পরা বৃদ্ধ—পিঙ্গুহয়া বলেছে আমাদের বাপঠাকুর্দার কথা ;
প্রমটার—আমি বলছি আমাদের নিজেদের কথা, নিজেরা কেমন ছিলাম ।
প্যান্ট পরা বৃদ্ধ—আমি বলছি আমাদের নিজেদের কথা, নিজেরা কেমন ছিলাম ।
প্রমটার—নিজেরা যদি কেবলি উন্নতি চাই, অবস্থার পরিবর্তন সর্বদাই চাই
প্যান্ট পরা বৃদ্ধ—নিজেরা যদি কেবলি উন্নতি চাই, অবস্থার পরিবর্তন সর্বদাই চাই

প্রমটার—তবে বুঝতে হবে আমরা সর্বদাই খারাপ আছি ;
প্যাণ্ট পরা বৃদ্ধ—তবে বুঝতে হবে আমরা সর্বদাই খারাপ আছি ;
প্রমটার—অতিশয় খারাপ অতীতেও ছিলাম, এখনও খারাপ আছি ভবিষ্যতেও খারাপ থাকব।
প্যাণ্ট পরা বৃদ্ধ—অতিশয় খারাপ অতীতেও ছিলাম, এখনও খারাপ আছি, ভবিষ্যতেও খারাপ থাকব।
প্রমটার—এইবার সাহেব বল, দীপক বল। টিরিনচাগা, তোমার মত আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।
সাহেব দীপক—টিরিনচাগা, তোমার মত আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।
প্রমটার—কিন্তু তা সত্ত্বেও কথা থেকে যায় যেখানে জন্মেছ এই পায়ের নীচে পৃথিবীতে
সাহেব দীপক—কিন্তু তা সত্ত্বেও কথা থেকে যায় যেখানে জন্মেছ এই পায়ের নীচে পৃথিবীতে
প্রমটার - সেই পৃথিবীটা কোথায় কেমন তা জানার ইচ্ছা হয়—ও পিঙ্গুহুয়া, ও টিরিনচাগা ?
সাহেব দীপক—সেই পৃথিবীটা কোথায় কেমন তা জানার ইচ্ছা হয়—ও পিঙ্গুহুয়া, ও টিরিনচাগা ?
প্রমটার—টিরিনচাগা বল। বৃদ্ধ বল। আমাদের এ জায়গা তো পৃথিবীরই অংশ, দেখতে আস তোমরা কয়জন ও সাহেব ?
বৃদ্ধ—আমাদের এ জায়গাও তো পৃথিবীরই অংশ, দেখতে আস তোমরা কয়জন ও সাহেব ?
প্রমটার—দীপক বল। অতি দুর্গম যে তোমাদের এ অঞ্চল উত্তর মেরু।
সাহেব দীপক—অতি দুর্গম যে তোমাদের এ অঞ্চল উত্তর মেরু।
প্রমটার—পায়ের নীচে বরফ, গায়ে উড়ে এসে পড়ছে বরফ, থাকো বরফের ঘরে।
সাহেব দীপক—পায়ের নীচে বরফ, গায়ে উড়ে এসে পড়ছে বরফ, থাকো বরফের ঘরে।

প্রমটার—পৃথিবীর সবাই তোমাদের এখানে এসে দেখতে চাই, পারিনাতো।
সাহেব দীপক—পৃথিবীর সবাই তোমাদের এখানে এসে দেখতে চাই, পারিনাতো।
প্রমটার—এইবার পিঙ্গুহুয়া বল। কাহালি বল। আমরাও পৃথিবীর সবাইকে দেখতে চাই।

কাহালি পিঙ্গুহুয়া—আমরাও পৃথিবীর সবাইকে দেখতে চাই।
প্রমটার—কিন্তু তোমাদের পৃথিবী অতি দুর্গম।
কাহালি পিঙ্গুহুয়া—কিন্তু তোমাদের পৃথিবী অতি দুর্গম।
প্রমটার—যদি ধর রওনা হই তোমাদের দেখতে সারা পৃথিবী দেখতে
কাহালি পিঙ্গুহুয়া—যদি ধর রওনা হই তোমাদের দেখতে সারা পৃথিবী দেখতে
প্রমটার—তা হলে প্রথমেই দেখি বরফের বদলে জল।

কাহালি পিঙ্গুছয়া—তা হলে প্রথমেই দেখি বরফের বদলে জল।
প্রমটার—আরো এগিয়ে গেলে বরফই নেই
কাহালি পিঙ্গুছয়া—আরো এগিয়ে গেলে বরফই নেই
প্রমটার—বরফের বদলে মাটি, তাতে আবার মাঝে মাঝে ঘাস, ও সাহেব ;
কাহালি পিঙ্গুছয়া—বরফের বদলে মাটি, তাতে আবার মাঝে মাঝে ঘাস, ও সাহেব ;
প্রমটার—এত দুর্গম তোমাদের অঞ্চল, সেখানে যাওয়া অসম্ভব।
কাহালি পিঙ্গুছয়া—এত দুর্গম তোমাদের অঞ্চল, সেখানে যাওয়া অসম্ভব।
প্রমটার—এবার দীপক সাহেব বল। আচ্ছা, তোমাদের যেমন যেমন হলে সুবিধাজনক
দীপক সাহেব—আচ্ছা, তোমাদের যেমন যেমন হলে সুবিধাজনক
প্রমটার—সাচ্ছল্য বোধ করো যা যা হলে
দীপক—সাচ্ছল্য বোধ করো যা যা হলে
প্রমটার—একেবারে ঠিক তাই বানিয়ে দেব, যেখানেই যাও সেখানেই।
দীপক সাহেব—একেবারে ঠিক তাই তাই বানিয়ে দেব যেখানেই যাও সেখানেই।
প্রমটার—ট্রাফালগার স্কোয়ারে বরফের ঘর বানিয়ে দেব সেই ঘরে থাকবে।
দীপক সাহেব—ট্রাফালগার স্কোয়ারে বরফের ঘর বানিয়ে দেব সেই ঘরে থাকবে।
প্রমটার—এবার কাহালি বল, পিঙ্গুছয়া। বেশি ফড়র ফড়র না করে সাহেব বাড়ি চলে যাও।
পিঙ্গুছয়া কাহালি—বেশি ফড়র ফড়র না করে সাহেব বাড়ি চলে যাও।
প্রমটার—তোমাদের দেশে গেলেই বলবে যে স্কুলে যাও
পিঙ্গুছয়া কাহালি—তোমাদের দেশে গেলেই বলবে যে স্কুলে যাও
প্রমটার—আমরা দেবতা, সাহেব
পিঙ্গুছয়া কাহালি—আমরা দেবতা, সাহেব
প্রমটার—মায়ের পেট থেকে বেরোবার সময়ে এত জ্ঞান নিয়ে বেরিয়েছি যে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রধান অধ্যাপক হতে পারি।
পিঙ্গুছয়া কাহালি—মায়ের পেট থেকে বেরোবার সময়ে এত জ্ঞান নিয়ে বেরিয়েছি যে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রধান অধ্যাপক হতে পারি।
প্রমটার—তারপরে বলবে যে ভোটার তালিকায় আপনার নাম ছাপব
পিঙ্গুছয়া কাহালি—তারপরে বলবে যে ভোটার তালিকায় আপনার নাম ছাপব
প্রমটার—বয়স কত একবার বলুন মশায়, বলবে এসে আমাদেরই ;
পিঙ্গুছয়া কাহালি—বয়স কত একবার বলুন মশায়, বলবে এসে আমাদেরই ;
প্রমটার—আমাদের প্রত্যেকের বয়স বহু কোটি বৎসর
পিঙ্গুছয়া কাহালি—আমাদের প্রত্যেকের বয়স বহু কোটি বৎসর
প্রমটার—তোমাদের দেশে গেলে অত কোটি বৎসর না ছেপে বয়স ছাপবে ৩৫ বছর কি ৬১ বছর।

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তোমাদের দেশে গেলে অত কোটি বৎসর না ছেপে বয়স ছাপবে ৩৫ বছর কি ৬১ বছর।

প্রমটার—তারপরে বাড়ির নারকেল চুরি করে খাবে দৈনিকই

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তারপরে বাড়ির নারকেল চুরি করে খাবে দৈনিকই

প্রমটার—বছর দশেক চুরি করবার পর বলবে যে বিশ্বের নিয়ম অনুসারে নারকেল বাগানের মালিক সেই চোর

পিঙ্গুছয়া কাহালি—বছর দশেক চুরি করবার পর বলবে যে বিশ্বের নিয়ম অনুসারে নারকেল বাগানের মালিক সেই চোর

প্রমটার—কারণ সেই চোরকেই তো বিনা পয়সায় নারকেল খেতে দিচ্ছে সারা বিশ্ব।

পিঙ্গুছয়া কাহালি—কারণ সেই চোরকেই তো বিনা পয়সায় নারকেল খেতে দিচ্ছে সারা বিশ্ব।

প্রমটার—টাকা পয়সা বলে এক উদ্ভট জিনিষ চালু করেছ তোমরা

পিঙ্গুছয়া কাহালি—টাকা পয়সা বলে এক উদ্ভট জিনিষ চালু করেছ তোমরা

প্রমটার—টাকা বাড়িতে রাখলে বম মেরে দরজা ভেঙে কেড়ে নেবে টাকা

পিঙ্গুছয়া কাহালি—টাকা বাড়িতে রাখলে বম মেরে দরজা ভেঙে কেড়ে নেবে টাকা।

প্রমটার—আর বলবে যে ডাকঘরে রাখ টাকা নিরাপদে সরকারের কাছে থাকবে

পিঙ্গুছয়া কাহালি—আর বলবে যে ডাকঘরে রাখ টাকা নিরাপদে সরকারের কাছে থাকবে

প্রমটার—তারপরে সরকার এবং ডাকঘর হঠাৎ একদিন বলল যে আপনি তো টাকা জমা দেননি কোনোদিন ডাকঘরে মশায়।

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তারপরে সরকার এবং ডাকঘর হঠাৎ একদিন বলল যে আপনি তো টাকা জমা দেননি কোনোদিন ডাকঘরে মশায়।

প্রমটার—তারপরে তোমাদের শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় অন্তত এক বাড়িতে দরজায় লেখা যে সে মনস্তত্ত্ববিদ

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তারপরে তোমাদের শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় অন্তত এক বাড়িতে দরজায় লেখা যে সে মনস্তত্ত্ববিদ

প্রমটার—তার কাজ গ্রামের লোক কেউ সেই রাস্তায় গেলে যন্ত্র দিয়ে তার মাথা আক্রমণ করে তার টাকা পয়সা চুরি করা।

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তার কাজ গ্রামের লোক কেউ সেই রাস্তায় গেলে যন্ত্র দিয়ে তার মাথা আক্রমণ করে তার টাকা পয়সা চুরি করা।

প্রমটার—তোমাদের চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে চায়ের সঙ্গে একটু ওষুধ মিশিয়ে লোকটিকে খাইয়ে আধ অজ্ঞান করে তার পকেটের দশ পনেরো হাজার টাকা চুরি করো।

পিঙ্গুছয়া কাহালি—তোমাদের চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে চায়ের সঙ্গে একটু

ওষুধ মিশিয়ে লোকটিকে খাইয়ে আধ অজ্ঞান করে তার পকেটের দশ পনেরো হাজার টাকা চুরি করো।

প্রমটার—তোমাদের যে কোনো একটি জিনিষ দেখলেই বোঝা যায় যে তোমরা চোর জোচ্চোর ডাকাত।

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের যে কোনো একটি জিনিষ দেখলেই বোঝা যায় যে তোমরা চোর জোচ্চোর ডাকাত।

প্রমটার—বাড়ির জানালাই ধরো।

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—বাড়ির জানালাই ধরো।

প্রমটার—জানলায় শিক লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—জানলায় শিক লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

প্রমটার—তোমাদের সাইকেল। সাইকেলে তালা লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের সাইকেল। সাইকেলে তালা লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

প্রমটার—তোমাদের গায়ের জামা। ভিতরে পকেট লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের গায়ের জামা। ভিতরে পকেট লাগিয়েছ চোর ঠেকাতে

প্রমটার—তোমাদের যে কোনো জিনিষ দেখার সংগে সংগে বোঝা যায় তোমাদের শতকরা নিরানব্বই জন চোর জোচ্চোর ডাকাত

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের যে কোনো জিনিষ দেখার সংগে সংগে বোঝা যায় তোমাদের শতকরা নিরানব্বই জন চোর জোচ্চোর ডাকাত

প্রমটার—তোমাদের মাগীদের কানের দুল এমনভাবে তৈরী যাতে চুরি করতে না পারে সহজে

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের মাগীদের কানের দুল এমনভাবে তৈরী যাতে চুরি করতে না পারে সহজে।

প্রমটার—তোমাদের প্যাণ্ট এমনভাবে তৈরী যাতে কোমরে পকেট থাকে চুরি ঠেকাবার জন্ত।

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের প্যাণ্ট এমনভাবে তৈরী যাতে কোমরে পকেট থাকে চুরি ঠেকাবার জন্য।

প্রমটার—ছাখ আমাদের মেরু অঞ্চল ছাখ

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—ছাখ আমাদের মেরু অঞ্চল ছাখ

প্রমটার—পুলিশ নেই ডাক্তার নেই

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—পুলিশ নেই ডাক্তার নেই

প্রমটার—ডাক্তার নেই, তার কারণ আমরা জানি আমরা দেবতা, আমাদের অসুখ হয় না

পিঙ্গুহুয়া কাহালি—ডাক্তার নেই, তার কারণ আমরা জানি আমরা দেবতা, আমাদের অসুখ হয় না

প্রমটার—আমাদের আদালত নেই
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—আমাদের আদালত নেই
প্রমটার—আমাদের এ সব দরকার হয় না।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—আমাদের এসব দরকার হয় না।
প্রমটার—আমাদের মন্দির নেই মসজিদ নেই চার্চ নেই
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—আমাদের মন্দির নেই মসজিদ নেই চার্চ নেই
প্রমটার—আমাদের দরকার হয় না এসব কারণ আমরা পাপ কেউ করি না।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—আমাদের দরকার হয় না এসব কারণ আমরা পাপ কেউ করি না।
প্রমটার—সারা জীবন পাপ করে বুড়ো বয়সে গঙ্গাসাগরে একবার ডুব দিয়ে বলি না যে সব পাপ ধুয়ে গেল।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—সারা জীবন পাপ করে বুড়ো বয়সে গঙ্গাসাগরে একবার ডুব দিয়ে বলি না যে সব পাপ ধুয়ে গেল
প্রমটার—তোমাদের পক্ষে আমাদের এ অঞ্চলে এসে হাজির হওয়া কষ্টকর।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমাদের পক্ষে আমাদের এ অঞ্চলে এসে হাজির হওয়া কষ্টকর।
প্রমটার—কিন্তু আমাদের পক্ষে তো তোমাদের দেশে যাওয়া অতি সোজা। আমরা থাকিই বরফের মধ্যে। গ্যাট গ্যাট করে হেঁটে রাশিয়ায় চলে যেতে পারি সহজেই। যাই না তো।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—কিন্তু আমাদের পক্ষে তো তোমাদের দেশে যাওয়া অতি সোজা। আমরা থাকিই বরফের মধ্যে। গ্যাট গ্যাট করে হেঁটে রাশিয়ায় চলে যেতে পারি সহজেই। যাই না তো।
প্রমটার—একভাবে দেখলে ঘৃণায় যাই না, আরেকভাবে দেখলে লজ্জায় যাই না।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—একভাবে দেখলে ঘৃণায় যাই না, আরেকভাবে দেখলে লজ্জায় যাই না।
প্রমটার—তোমরা চোর জোচ্চোর ডাকাত মিথ্যুক এ জেনে আমাদেরই লজ্জা হয়। মুখ দেখাব কী করে বিশ্বজগতের কাছে?
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তোমরা চোর জোচ্চোর ডাকাত মিথ্যুক—এ জেনে আমাদেরই লজ্জা হয়। মুখ দেখাব কী করে বিশ্বজগতের কাছে?
প্রমটার—তুমি সাহেব বাড়ি ফিরে যাও।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—তুমি সাহেব বাড়ি ফিরে যাও।
প্রমটার—আমরা তোমাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না যে গোলাপফুল অতি সুন্দর।
পিঙ্গুহুয়া কাহালি—আমরা তোমাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না যে গোলাপফুল অতি সুন্দর।

প্রমটার—পৃথিবীর সমস্ত ফুলের চেয়ে বেশি সুন্দর আমার ছেলের পায়ের নখগুলি।

পিজুহয়া কাহালি—পৃথিবীর সমস্ত ফুলের চেয়ে বেশি সুন্দর আমার ছেলের পায়ের নখগুলি।

প্রমটার—তুমি সাহেব আগে একদিন বলেছিলে যে এয়ারকণ্ডিশন করা কাচের বাড়ি আমাদের থাকার জন্য বানিয়ে দেবে।

পিজুহয়া কাহালি—তুমি সাহেব আগে একদিন বলেছিলে যে এয়ারকণ্ডিশন করা কাচের বাড়ি আমাদের থাকার জন্য বানিয়ে দেবে।

প্রমটার—ওসব বাড়ি আমাদের দরকার নেই।

পিজুহয়া কাহালি—ওসব বাড়ি আমাদের দরকার নেই।

প্রমটার—এই আমরা ভালো আছি।

পিজুহয়া কাহালি—এই আমরা ভালো আছি।

প্রমটার—আমরা সম্পূর্ণ সৎ, সত্যবাদী, পবিত্র সুতরাং এই সততায় আমরা সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সমান। শুধু সততায় সমান, তবু তো একটু খানিতে সমান। অতি অল্পে হলেও সমান তো। সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্নের সমান। মনে রেখো॥